রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা

| মহর্ষি ভবন

RABINDRA BHARATI PATRIKA
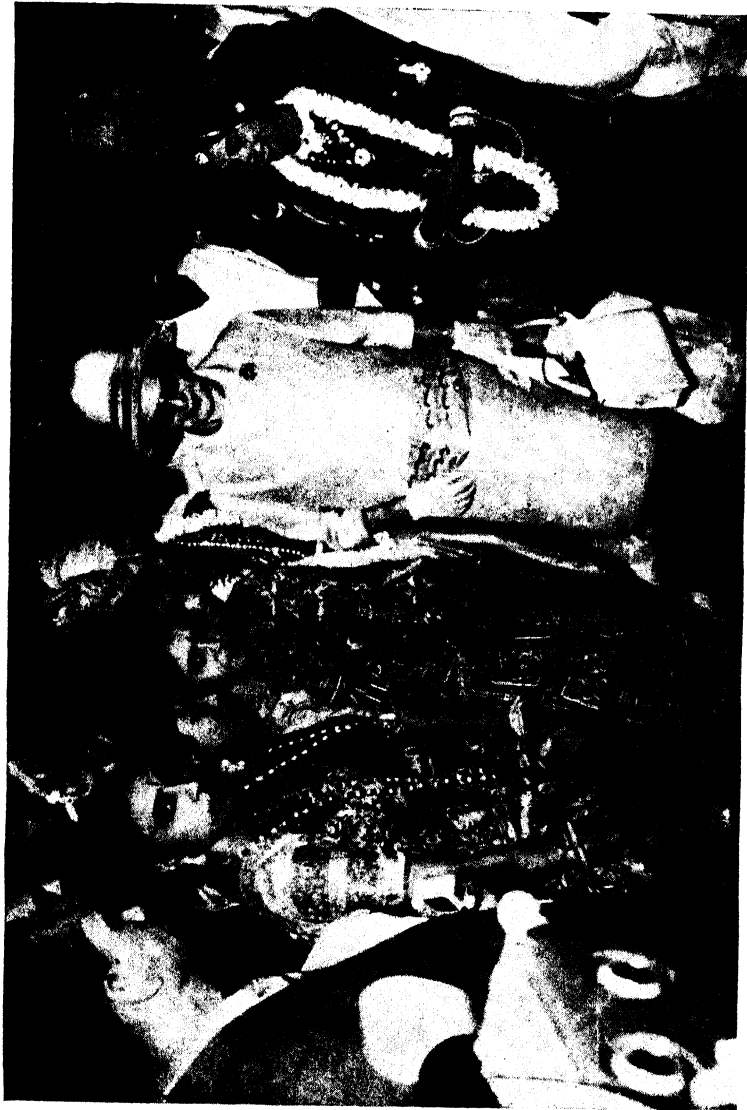
রবীন্দ্র ভারতীর ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের সহিত পশ্চিম জার্মানার প্রেসিডেন্ট সস্ত্রীক হাইনেরিখ্ লুব্‌কে

রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা

প্রথম বর্ষ : : জানুয়ারী
প্রথম সংখ্যা : : উনিশ শ' তেষট্টি

১

সম্পাদক : ধীরেন্দ্র দেবনাথ

রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা

পত্রিকা পর্ষদ্

ভবরঞ্জন দে কর্তৃক সাধনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৭৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট : কলিকাতা ১২ হইতে মুদ্রিত ও ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন : কলিকাতা ৭ হইতে প্রকাশিত।

॥ রবীন্দ্র ভারতী প্রদর্শশালা ॥

॥ রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ তথা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করিবার জন্য একটি প্রদর্শশালার উদ্বোধন করিয়াছেন। বাংলাদেশের গৌরবময় যুগের এই স্মৃতি রক্ষা করিতে রবীন্দ্র ভারতীর উপাচার্য মহাশয় সমস্ত প্রকাশক প্রতিষ্ঠান ও দেশবাসীর কাছে এই মর্মে আবেদন জানাইতেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ী সংক্রান্ত যে কোন তথ্য, চিত্র, অথবা পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্র ভারতী প্রদর্শশালায় (৬।৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিঃ ৭) প্রেরণ করিলে সাদরে গৃহীত হইবে। ইহা ভিন্ন রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী বৎসরে প্রভূত পত্র-পত্রিকা সংকলিত হইয়াছে। এই সমস্ত পত্রিকাদি এবং ঐ শতকের মূল্যবান তথ্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দানস্বরূপ অথবা মূল্য বিনিময়ে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। আশা করা যায়, দেশবাসী এই জাতীয় সম্পদটিকে উপযুক্তভাবে গড়িয়া তুলিতে রবীন্দ্র ভারতী কর্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতা করিবেন ॥

সূচীপত্র

ENGLISH SECTION

Copy of the resolution of the meeting of the Rabindra Bharati held on 6. 7. 62.

The Rabindra Bharati meets to-day to mourn the death of its greatest friend, Dr. B. C. Roy. Only a few months back, he attended the first meeting of this University to narrate the story of its birth and advise on the lines in which it should develop to be worthy of being named after the great poet. To-day to our great misfortune he is no more available to help and guide us. In him the country has lost one of its greatest leaders, but the University has lost its greatest benefactor who looked upon it as his dream-child.

This meeting places on record its deep sense of sorrow and grievous loss and pays its respectful homage to his departed soul.
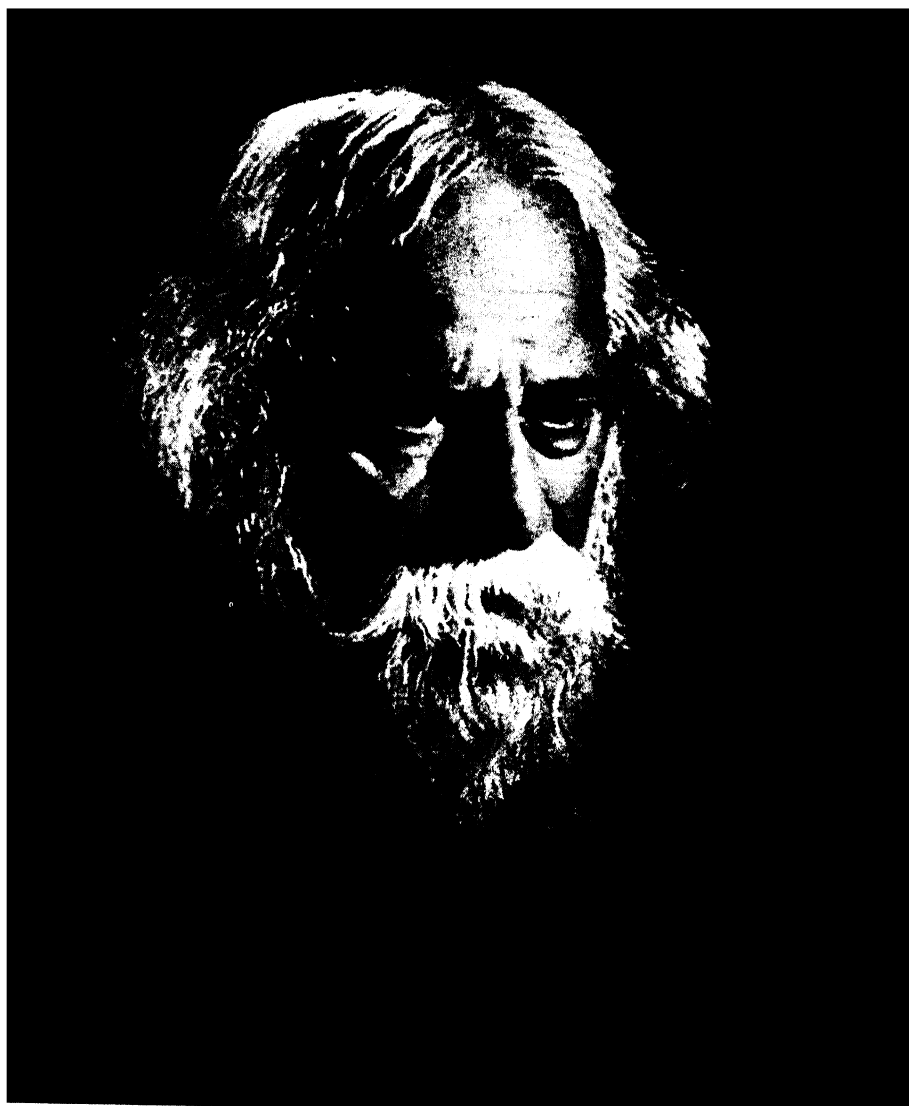
সম্পাদকীয়

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্রের প্রথম সংখ্যার আত্মপ্রকাশ ঘটল দেশের এক দুর্যোগময় মুহূর্তে। এ দুর্যোগ কোনো বিশেষ একটি দেশ বা জাতির জীবনেই কেবলমাত্র সীমিত নয়। মানবসভ্যতার ক্রমবিবর্তনের পথে এ সংকটের আকস্মিকতা সকল কাজের মাঝে আমাদের সচকিত করে তুলেছে। ঠিক এই সময়েই রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকার প্রকাশ তাকে বিশেষ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত করেছে।

আজকের জীবন-সাধক রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন-কল্পনা, আদর্শ-আকাঙ্ক্ষাকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরুন, এই অভিপ্রায়ে রবীন্দ্র ভারতীর প্রতিষ্ঠা। যিনি তাঁর জীবনব্যাপী সাহিত্যকৃতির মধ্য দিয়ে শান্তি ও মানবপ্রেমকে বন্দনা জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত জীবনাচরণের প্রত্যক্ষতায় সর্ব মানবের বাসভূমিকে যিনি মহামিলনের যজ্ঞভূমিতে পরিণত করতে চেয়েছেন, যাঁর আদর্শ ও বিশ্বাস সমগ্র ভারতবর্ষের আদর্শ ও বিশ্বাসকে অভিব্যক্ত করে, তাঁর জন্মভূমি আজ বহিঃশত্রুর লুব্ধ দৃষ্টির আহার্য। চীনের সাথে অতীতে ভারতের আত্মিক যোগ স্থাপিত হয়েছিল একদিন। চীনের সভ্যতা ও সংস্কৃতির আকর্ষণে কবিগুরু শান্তিনিকেতনে 'চীনাভবন' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সেদিনও তাদের সাথে হাত মিলিয়ে পঞ্চশীলের আদর্শ ঘোষণা করেছি আমরা বিশ্বের সামনে। পরিতাপের বিষয়, চীনের সেই নেতৃবৃন্দেরই অঙ্গুলিহেলনে আজ এই যুদ্ধের সংকেত। যে যুদ্ধ আমরা চাইনি, যে যুদ্ধ আমরা চাইনা, শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর কোথায়ও নয়,—সেই যুদ্ধে প্রতিপক্ষ হ'তে হো'ল আমাদের!

তবু বাস্তবকে স্বীকার করে নিতে হবে। ভারতবর্ষের নির্বিরোধ স্বভাবের মধ্যেও যে দৃঢ় প্রতিরোধের শক্তি জন্ম নিতে পারে, এ ধারণা হয়ত বলদর্পী মূঢ়ের বোধের অগোচরে ছিল। যে মেঘের বারিসিঞ্চনে উষর মরু শ্যামল হয়, সেই মেঘেরই বুকে আছে বজ্র, আছে প্রলয়-বিদ্যুৎ। যে আবেগ ও করুণায় প্রেম ও মৈত্রীর আশ্রয়, সেই আবেগই আবার নিষ্ঠুর আঘাতে শ্মশানের প্রেতনৃত্যকে আবাহন জানাতে পারে অবহেলে। ভারতবর্ষের সকল আবেগ আজ সংহত হয়ে রুদ্রের লেলিহান বহ্নিশিখায় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মধ্যযুগের ভারতেতিহাসের পুনরাবৃত্তির সূচনাকে আমরা এ আঘাতে চিনে নিতে পেরেছি। দীর্ঘকালের মোহাচ্ছন্ন জড়তা ও আত্মবিধ্বংসী

নিশ্চিন্ততার মায়াঘুম ভেঙেছে এবার। আজকের এ দুর্যোগ তাই শুধুমাত্র অশুভেরই ইঙ্গিতবাহী নয়।

পৃথিবীর সকল শুভবুদ্ধি আজ আমাদের পক্ষে, ন্যায়ের সপক্ষে। এ যুদ্ধ স্বল্পকালীন হোক্, দীর্ঘস্থায়ী হোক্, জয় আমাদের হবেই। বিপদের দিনে, দুঃখের মুহূর্তে যদি অভিভূত হয়ে না থাকি, তবে জয়ের দিনে, উল্লাসের মুহূর্তেও যেন আত্মসন্তুষ্টির অহংকার ও মহতের প্রতি বিদ্বেষে আমাদের চিত্ত না আবিল হয়।

* * * * * *

বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রৈমাসিক মুখপত্ররূপে রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা প্রকাশিত হবে। সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, চারুকলা, নাট্যশিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ক মননশীল রচনা এবং কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি সৃষ্টিধর্মী রচনা এ পত্রিকার স্বকীয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অর্জনে সক্ষম হবে বলে আশা পোষণ করি। বাংলা ভাষার সাথে স্বল্পপরিচিত বা পরিচয়বিহীন রবীন্দ্র-অনুরাগীদের সংখ্যা ক্রমবৃদ্ধির পথে। রবীন্দ্র ভারতীর অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও অবাঙালী আছেন অনেকে। তাঁদের সুবিধার জন্য পত্রিকাটি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হবে—যদিও স্বল্পপরিসরে আয়োজনটি তেমন সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে না। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে ৮ই মে, ১৯৬২। দু'টি পৃথক পত্রিকা প্রকাশ এত অল্পসময়ের মধ্যে সম্ভবপর নয়। আপাততঃ তাই এই ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়েছে।

পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের সকলের মন আজ আনন্দে ভরে ওঠাই স্বাভাবিক। কিন্তু আনন্দের মাঝে ক্ষণে ক্ষণে ছেদ পড়ছে। একটি সুগভীর বেদনায় সমগ্র হৃদয় উন্মথিত হয়ে উঠছে। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন যিনি দীর্ঘদিন ধরে লালন করে এসেছেন, অবশেষে সেই স্বপ্নকে যিনি অবিচল আস্থা ও দৃঢ় সংকল্পে রূপ দিয়েছেন, সেই আদর্শ কর্মবীরকে আমরা হারিয়েছি। বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতিকে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বোধ হয় এই সর্বশেষ ও সর্বোত্তম দান। আর সেই উপহারের মধ্য দিয়ে তাঁর শিল্পি-মানসের অপরূপ উদ্‌ঘাটন আমাদের বিস্মিত করেছে, মুগ্ধ করেছে। মৃত্যুর ওপারের নেপথ্যলোক থেকে তাঁর বিদেহী আত্মা জীবনের এই সর্বশেষ সৃষ্টির সার্থকতার দিকে অনিমিষে তাকিয়ে আছে হয়ত। তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা আমাদের আজকের প্রচেষ্টায় একীভূত হোক্।

রবীন্দ্র ভারতী *

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিক উৎসব সমাপ্তির সঙ্গেই রবীন্দ্র ভারতী জন্মলাভ করেছে গত ২৫শে বৈশাখ। যে মহামনীষীর নামের সঙ্গে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি সংযুক্ত সেই দিনটি তাঁর জন্মদ্বারা চিহ্নিত। এমন পবিত্র দিনে জন্মলাভ করেও তা জন্মমুহূর্তে দেশের সকল মানুষের অকুণ্ঠ আশীর্বাদ লাভে সমর্থ হয় নি। বড় বোনের পিঠে মায়ের কোলে আবার বোন এলে যেমন মৃদু প্রতিবাদ ওঠে, তেমন তার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ উঠেছিল। কেউ বলেছিলেন যে বিশ্বের কোথাও এমন দৃষ্টান্ত নেই যেখানে একজন সাহিত্যিকের নামে একটি সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। কেউ বলেছেন কবির নিজের হাতে গড়া যখন বিশ্বভারতী রয়েছে তখন এটার কি দরকার ছিল।

সুতরাং প্রথমেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে রবীন্দ্র ভারতীর পক্ষে জবাবদিহি করবার, কেন সে ভূমিষ্ঠ হল। এই সম্পর্কে প্রথম আপত্তিটিকে বিশেষ আমল দেবার প্রয়োজন বোধহয় নেই। অন্য কোথাও হয়নি বলেই যে আমরা প্রথম একটা কাজ করব না, এর পেছনে যদি কোনো যুক্তি থাকে, তা দুর্বল। তাকে আমরা অবহেলা করতে পারি। দ্বিতীয় আপত্তির কারণটি কিন্তু সঙ্গত। কবির স্বহস্তে গড়া একটি বিশ্ববিদ্যালয় যখন আছে, তখন তাঁর নামে আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে, প্রথমটির স্বার্থহানি ঘটার সম্ভাবনা; কবিকে যাঁরা শ্রদ্ধা করেন, তাঁদের মনে আশঙ্কা জাগতে পারে বৈকি! সেই কারণেই, কি উদ্দেশ্যে রবীন্দ্র ভারতী স্থাপিত হল তা জানা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের পৈত্রিক বাসভবনটি কলিকাতার যোড়াসাঁকো অঞ্চলে অবস্থিত। সেখানে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, শৈশবে মানুষ হয়েছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে তা ছিল তাঁর কলিকাতার আবাস। তা তাঁর পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত। শুধু তাই নয়, বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে তাঁর পরিবার ঊনবিংশ শতাব্দীতে এক স্মরণীয় অংশ গ্রহণ করেছিল। ফলে বাংলার নব-জাগরণের যুগে এই ঠাকুরবাড়ী ছিল বাঙালীর

প্রাণকেন্দ্র। তাকে হস্তান্তরিত হতে না দেওয়া এবং সংরক্ষিত করা যে জাতির একান্ত কর্তব্য, তা কেউ অস্বীকার করবেন না। তাকে সংরক্ষিত করতে গেলে তার ত একটা ব্যবহারের প্রয়োজন। সেখানে আপিস বসান বা আবাসগৃহ স্থাপনের কথা ভাবা যায় না। যাঁর পবিত্র স্পর্শে তা তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, তাঁর স্মৃতিরক্ষণের কাজেই তাকে উৎসর্গীকৃত করা থেকে উৎকৃষ্টতর পরিকল্পনা কি হতে পারে? দিগ্বিজয়ী সাহিত্যিক হয়েও রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন নি যে সাহিত্যই মানুষের ভাব প্রকাশের একচ্ছত্র বাহন। তিনি বলতেন ভাবের অভিব্যক্তি দেবার উপায় বহু ও বিচিত্র। ভাষায় যা বলা যায় তা চিত্রে, ভাস্কর্যে, নৃত্যে, সংগীতে এবং অভিনয়েও প্রকাশ করা যায়। এই শক্তিগুলি অবহেলার বস্তু নয়। তাদেরও বিকাশের প্রয়োজন আছে। 'আপনি আচরি ধর্ম' অন্যেরে তা তিনি শিখিয়েছেন। সুতরাং তাঁর নাম দ্বারা যে বিশ্ববিদ্যালয় চিহ্নিত হবে তার বিশেষ কাজ হবে ভাব প্রকাশের বিভিন্ন বৃত্তিগুলির পরিস্ফুরণ। রবীন্দ্র ভারতী সেই আদর্শই গ্রহণ করেছে। অভিনয়, নৃত্য, গীত, সাহিত্য এবং দর্শন শিক্ষণ ও তা সম্পর্কে গবেষণা তার লক্ষ্য।

যোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, তা বাংলার নব জাগরণের যুগের প্রাণকেন্দ্র। দ্বারকানাথ, মহর্ষি, দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। সে ছিল বাঙালীর এক গৌরবময় যুগ। তখন বাঙালী দৃষ্টান্ত স্থাপন করত এবং অন্যে তার অনুসরণ করত। এই গৌরবময় যুগের ত একটি স্থায়ী প্রদর্শনী-কেন্দ্র থাকা প্রয়োজন। তাঁর পৈত্রিক গৃহই সেই স্থায়ী প্রদর্শনীর উপযুক্ত স্থান। তাই রবীন্দ্র ভারতীর দ্বিতীয় কাজ হল সেখানে এই প্রদর্শনী স্থাপন করা।

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান। তার স্বার্থ সর্ববিষয়ে সংরক্ষিত হ'ক সকল ভারতবাসী তা চায়। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ব-ভারতীর অনুজা ভগিনীর মত। তা ও এ বিষয় অত্যন্ত অবহিত যে জ্যেষ্ঠার স্বার্থ সর্বদা সংরক্ষিত করতে হবে। সম্পর্কটি ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার নয়, শ্রদ্ধার। বিশ্বভারতীর কর্তব্য রবীন্দ্রনাথ নিজেই নির্দিষ্ট করে দিয়ে গেছেন। তিনি চেয়েছিলেন প্রকৃতির বুকে, গ্রামের পরিবেশে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও প্রাচ্য সংস্কৃতি একত্র অবস্থান করুক, অবস্থান করে পরস্পর ভাবের আদান প্রদান করুক। তাই ত তার নাম দিয়েছিলেন বিশ্বভারতী। সেখানে বিশ্ব একনীড় হ'ক, এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। রবীন্দ্র ভারতী সে পথে যাবে না। তার পথ বিভিন্ন। তার প্রধান লক্ষ্য হবে রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার বাহক ও প্রচারক হওয়া। তাদের সম্বন্ধ প্রতিদ্বন্দ্বিতার নয়, প্রীতির; তাদের কর্তব্য বিভিন্ন পথে রবীন্দ্রনাথের প্রচার।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র ভারতী যাঁর মানসকন্যা, আমাদের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী, পরলোকগত ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের কথা মনে পড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের জন্য তিনি মনে মনে কতখানি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, তা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যিনি না মিশেছেন, তাঁর বোঝা শক্ত। তিনি ছিলেন কর্মবীর, দেশের বাস্তব উন্নয়নে নিজের সকল শক্তি ও সামর্থ্য তিনি উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তাই বলে দেশের অবাস্তব কীর্তির প্রতি তিনি উদাসীন ছিলেন না। কি উৎসাহভরে তিনি রবীন্দ্র ভারতী স্থাপন করেছিলেন, তা বর্ণনা করা যায় না। রবীন্দ্র ভারতী প্রতিষ্ঠার তিন দিন পরে দার্জিলিং-এ তার প্রথম সভা বসে, আচার্য শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর সভাপতিত্বে। সেই সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং আচার্যমহোদয়ার অনুরোধক্রমে রবীন্দ্র ভারতীর জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। কেমন করে ধীরে ধীরে তাঁর মনে রবীন্দ্রনাথের পৈত্রিক বাসভবনে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সংকল্প গড়ে উঠেছিল, সেদিন তিনি তা বর্ণনা করেছিলেন। গভীর আবেগের সঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে এমন বস্তু আছে, যা বিশ্বজনীন কল্যাণসাধনে প্রেরণা দিতে পারে, যা আনন্দলোকের সন্ধান দিতে পারে। তিনি তাই বিশেষ আগ্রহ সহকারে বলেছিলেন যে রবীন্দ্র ভারতীর অন্যতম প্রধান কাজ হবে রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা করা। রবীন্দ্র ভারতী এটিকেও বিশেষ পবিত্র কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করেছে।

রবীন্দ্র ভারতীর কাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথের পৈত্রিক বাসভূমির দখল নেবার কাজও খানিক এগিয়েছে। যে অংশ বাহিরের মানুষের হাতে গিয়েছিল তা সম্প্রতি দখল নেওয়া হয়েছে। সংলগ্ন অন্য কয়েকটি গৃহও হুকুম দখল করবার ব্যবস্থা হয়েছে। তাদের মধ্যে চারটি গৃহের দখল ইতিমধ্যে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। সবগুলি দখল হয়ে গেলে ঠাকুরবাড়ীর সংলগ্ন এক বিস্তৃত অংশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। তার কিছু অংশে বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন গৃহ নির্মিত হবে, কিছু অংশ উদ্যানে পরিণত করা হবে, যাতে শিক্ষাক্ষেত্রের উপযুক্ত একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রণয়নের কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেছে। তার অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিও গড়ে উঠছে। তার কার্যনির্বাহক সমিতি, যা হল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সমস্থানীয়, স্থাপিত হয়ে গেছে। শিক্ষাসংক্রান্ত সমিতিও স্থাপিত হয়েছে।

নূতন পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থাও কিছু করা হয়েছে। বর্তমান বৎসরে নৃত্য, গীত ও অভিনয় সম্পর্কে একটি তিন বৎসর স্থায়ী পাঠ্যক্রম প্রবর্তিত করা হবে। তার বিজ্ঞাপনও প্রকাশিত হয়েছে।

বর্তমান বছরেই আর একটি পাঠক্রম প্রবর্তিত করবার ইচ্ছা কর্তৃপক্ষ পোষণ করেন। তা হল রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠের জন্য একটি ডিপ্লোমা শ্রেণীর পাঠক্রম। তাতে রবীন্দ্রসাহিত্যে অনুরাগী অবাঙালী ভারতবাসী এবং অভারতীয়দেরও যোগ দেবার অধিকার থাকবে। উদ্দেশ্য, রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রত্যক্ষ রসাস্বাদনের সুযোগ যাঁরা বাংলাভাষী নন প্রধানত তাঁদের নাগালের মধ্যে এনে দেওয়া।

স্নাতকশ্রেণীর পাঠক্রমের ব্যবস্থা করতে আরও সময় লাগবে। তবে আশা করা যায় পরের বৎসর তা প্রবর্তিত করা সম্ভব হবে। ইতিমধ্যে তার প্রস্তুতি হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি বিভিন্ন ফ্যাকাল্‌টি স্থাপিত হয়েছে—একটি চারুশিল্পের অপরটি মানবতা বিষয়ক শিক্ষণের।

রবীন্দ্র ভারতী বয়সে শিশু হলেও তার দায়িত্বের গুরুত্ব সম্বন্ধে তা অবহিত, সেই অনুপাতে আকাঙ্ক্ষারও তার শেষ নেই। আর একটি সৌভাগ্যের সূচনা এখনি লক্ষিত হয়েছে। তার অগ্রজা বিশ্বভারতীর স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করতে তা সমর্থ হয়েছে। দুরূহ কর্তব্য সম্পাদনে দেশবাসীর শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ তা পাবে না কি ?

* কলিকাতা বেতার-কেন্দ্র থেকে শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ১১. ৯. ৬২ তারিখে পঠিত। আকাশবাণীর সৌজন্যে প্রকাশিত।

ট্র্যাজেডির রস-প্রসঙ্গে

শ্রীসাধনকুমার ভট্টাচার্য

ট্র্যাজেডি-রসের নাটকের সৃষ্টি, 'ট্র্যাজেডি' নামটির উৎপত্তি এবং 'ট্র্যাজেডি'র সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা—এ সব কিছুরই প্রথমারম্ভ গ্রীসে—সুদূর অতীতে—যীশুখ্রীষ্টের জন্মের কয়েকশত বৎসর আগে। আমরা জানি—থেসপিসের রচনায় ট্র্যাজেডির সূচনা—ডাওনিসাসের মৃত্যুজনিত-বিলাপ গীতি'ডিথিরাম্ব' থেকে ট্র্যাজেডির প্রথম অভিব্যক্তি, এইস্কি-লাস—সফোক্লিস—ইউরিপিডিসের প্রতিভাস্পর্শে ট্র্যাজেডি-রসের অবিস্মরণীয় স্ফূর্তি এবং প্লেটোশিষ্য মূর্তিমান মনীষা এরিষ্টটলের মনন-সুফল "পোয়েটিস" গ্রন্থে ট্র্যাজেডিতত্ত্বের প্রথম বিচার, প্রথম সূত্র-ভাষ্য। তারপর থেকে, একদিকে যেমন চলেছে শিল্পীর রসবোধ ও সৃষ্টিপ্রেরণা থেকে ট্র্যাজেডি নাটকের সৃষ্টিপরম্পরা, তেমনি অন্যদিকে চলেছে ট্র্যাজেডিতত্ত্ব নিয়ে নানা বিচার বিশ্লেষণ—ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ধারণের নতুন নতুন চেষ্টা। এটা খুবই স্বাভাবিক এবং অনিবার্য যে নতুন নতুন যুগে নতুন জীবনাবেগ, জীবনদ্বন্দ্ব এবং জটিলতর আবর্ত ও সংকটের চেতনা থেকে, নতুন নতুন বিভাব-অনুভাবের উপাদান সংযোগে নতুন নতুন ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হবে—নতুন জীবনের অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় ক'রে রসবোধ আত্মপ্রকাশ করার চেষ্টা করবে। কিন্তু যা' অস্বাভাবিক না হলেও বিস্ময়জনক ব'লে মনে হয় তা' এই যে, যা' জ্ঞানের বিষয়, যুক্তি-বিচারের আলোকে যার স্বরূপ আবিষ্কার্য, সেই ট্র্যাজেডিতত্ত্ব-বিষয়েও আজ পর্যন্ত অবিসংবাদিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। সেই কোন্ অতীতকালে এরিষ্টটল ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত করেছেন আর আজ বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক! এর মধ্যে কত কত শতাব্দী চলে গেছে, কত কত মননশীল দার্শনিক ট্র্যাজেডির স্বরূপ নিরূপণের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আশ্চর্যেরই কথা—আজও ট্র্যাজেডি-রসের স্বরূপ নিয়ে বিতর্কের অবসান ঘটেনি; আজও ট্র্যাজেডির রস, ট্র্যাজেডি-নায়কের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বাদ-বিতণ্ডা চলছে।

এই প্রবন্ধে আমি, ট্র্যাজেডির রস সম্বন্ধে বিংশ শতাব্দীতে যে আলোচনা হয়েছে, তার কিছু পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করব এবং সেই প্রসঙ্গে, ডি. ডি. রাফেল মহাশয় "দি প্যারাডক্স্ অফ ট্র্যাজেডি" নামক গ্রন্থে (১৯৬০ খ্রীঃ প্রকাশিত), এবং অধ্যাপক এলারডাইস নিকল মহাশয়, তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত "দি থিয়েটার এ্যাণ্ড

ড্রামাটিক থিওরি” গ্রন্থে (১৯৬২ খ্রীঃ) ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা ও স্বরূপের উপর যে নতুন আলোকপাত করেছেন তার দিকে পাঠকের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করতে চেষ্টা করব।

ট্র্যাজেডি-রসের আলোচনাকালে আমি একদিকে যেমন ট্র্যাজেডির স্থায়ী এবং আনুষঙ্গিক ভাব নিরূপণের দিকে লক্ষ্য রাখব, অন্যদিকে তেমনি ট্র্যাজেডির সঙ্গে মেলোড্রামার পার্থক্য এবং ট্র্যাজেডি-রসের আচ্ছাদক ভাবের দিকেও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করব। আর একবার বলে রাখি, এই প্রবন্ধে আমি শ্রদ্ধেয় ডি. ডি. রাফেল-কৃত “দি প্যারাডক্স্ অফ ট্র্যাজেডি” এবং অধ্যাপক নিকলের “দি থিয়েটার এ্যাণ্ড ড্রামাটিক থিওরি” গ্রন্থের নতুন আলোচনাকে উপস্থাপিত করতে চাই। ট্র্যাজেডি-রস সম্পর্কে প্রথম নাট্যতত্ত্ববিদ এরিষ্টটল যে আলোচনা করেছেন তাকেই আমরা আলোচনার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। কারণ যাঁরাই এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা সকলেই এরিষ্টটলের সিদ্ধান্তকেই আলোচনার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং এ্যারিষ্টটলকে খণ্ডন অথবা সমর্থন করে আলোচনা শেষ করেছেন। আসলে ট্র্যাজেডির রসের আলোচনা শেষ পর্যন্ত এই প্রশ্নেরই আলোচনা হয়ে দাঁড়িয়েছে—ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য কি “শোচনা ও ভয়” (pity and fear) জাগানো? “শোচনা”ই ট্র্যাজেডির মূলভাব কি না? শোচনা ছাড়াও ট্র্যাজেডিতে আর কোন্ কোন্ ‘ভাব’ অপরিহার্য ভাবে থাকা দরকার? আমরা জানি—ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা নিরূপণ করতে যেয়ে এরিষ্টটল লিখছেন “Tragedy, then, is an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude, in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play, in the form of action, not of narrative, through pity and fear effecting the proper purgation of these emotions.” (২৩ পৃঃ, বুচারকৃত অনুবাদ) এই সংজ্ঞা থেকে পাওয়া যাচ্ছে—ট্র্যাজেডি হচ্ছে “সিরিয়াস এ্যাকশান”-এর অনুকরণ এবং তার উদ্দেশ্য—শোচনা ও ভয় জাগানো। অন্যত্রও তিনি বলেছেন—

(ক) “actions producing these effects (pity or fear) are those which, by our definition, Tragedy represents.” (৪১ পৃঃ)

(খ) It should, moreover imitate actions which excite pity and fear, this being the distinctive mark of tragic imitation.” (৪৫ পৃঃ) খুব স্পষ্ট ভাষাতেই এখানে বলা হয়েছে—ট্র্যাজেডির বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য করুণ ও ভয়ানক

ঘটনার উপস্থাপনা করা—শোচনা ও ভয়ের উদ্রেক করা। এরিষ্টটলের মতে—ট্র্যাজেডি "সিরিয়াস এ্যাকশান" এবং 'সিরিয়াস এ্যাকশান' বলতে বুঝায়—ভয়ংকর ও শোচনীয় পরিণামের ঘটনা—"unmerited misfortune"-এর ঘটনা—শোচনীয় ভাগ্যবিপর্যয়ের বা পতনের কাহিনী। এই কাহিনী—এমন জীবনবৃত্ত যা' শুধু দেখে নয়, শুনেই লোকে "will thrill with horror and melt to pity"—ভয়ে শিউরে উঠবে এবং শোচনায় বিগলিত হবে।

এখানেই প্রশ্ন উঠে এবং উঠেছেও—এরিষ্টটল কি তবে দুটি ভাবকেই ট্র্যাজেডির স্থায়িভাব ব'লে গণ্য করেছেন? ট্র্যাজেডি কি একাধারে, আমাদের পরিভাষায়, ভয়ানক ও করুণরসের নাটক? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'লে, বলা বাহুল্য, ভয় (fear) এবং শোচনা (pity) বলতে তিনি কি বুঝেছেন তা আগে জেনে নিতে হবে। খুবই আনন্দের কথা যে এরিষ্টটল নিজেই ভয় ও শোচনার ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন; লিখেছেন—"pity is aroused by unmerited misfortune, fear by the misfortune of a man like ourselves" (৪৫ পৃঃ), অর্থাৎ শোচনা জাগে অনুচিত বিপত্তি বা ভাগ্যবিপর্যয় দেখে, আর ভয় জাগে আমাদেরই-মতো-কোন-লোকের দুঃখদুর্গতি দেখে। যেটা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়, সে এই যে ভয় সাধারণ ভয় নয়, ভয়ংকর কোন কিছু দেখার ভয় নয়, এ ভয় সমবেদনাজনিত মানসিক অবস্থার বিশেষ রূপ। 'ভয়' কথাটিকে যে তিনি সাধারণ ভয়ানক ঘটনাজনিত সন্ত্রাস অর্থে ব্যবহার করেননি, তার প্রমাণও রয়েছে। তিনি "terrible" ও "monstrous" এই দু'টি শব্দ প্রয়োগ করেছেন এবং বলেছেন—ট্র্যাজেডির ঘটনা "terrible" বটে, কিন্তু "monstrous" নয়। বলেছেন—"Those who employ spectacular means to create a sense not of the terrible, but only of the monstrous, are strangers to the purpose of Tragedy" (৪৯ পৃঃ) অর্থাৎ "sense of the terrible" না জাগিয়ে "sense of the monstrous" জাগালে ট্র্যাজেডির রস নষ্ট হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, এই "sense of the terrible" দৃশ্যতঃ ভয়ানক ঘটনার দ্বারা উদ্বোধিত কোন ভয়-ভাব নয়; এ "misfortune of a man like ourselves" দেখে মানুষের পরিণাম-চিন্তাজনিত বেদনা শংকা। একটি দৃষ্টান্ত দিলে "terrible" এবং "monstrous"-এর পার্থক্য স্পষ্টতর হবে। রাজা ইডিপাস যে যে কাজ করেছে—(পিতৃহত্যা, মাতৃগমন প্রভৃতি) তাকে আমরা চরম "terrible" ব'লে মনে করতে পারি। এই সব ঘটনার ভয়ংকরত্ব তাদের বাহ্যিক প্রকৃতির মধ্যে নিহিত নেই, নিহিত রয়েছে—তাদের নীতিবিপর্যয়কারী প্রকৃতির মধ্যে। এই সব ঘটনা

চক্ষুরিন্দ্রিয়ের চেয়ে মনকেই বেশী তীব্র ভাবে পীড়া দেয়, ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মনের কাছেই বেশী অসহ্য। খাঁটি "terrible"-এর আবেদন মনের কাছে, 'monstrous'-এর আবেদন স্থূল ইন্দ্রিয়ের কাছে। "terrible"-কে বলা যায় মানবিক বা মানসিক ভয়, monstrous-কে বলা যায় জৈবিক বা দৈহিক ভয়। মোট কথা এরিষ্টটল 'ভয়' ব'লতে "sense of the terrible"-ই বুঝেছেন এবং ঐ ভয়ের সঙ্গে শোচনার খুব নিকট সম্পর্ক। এ নিছক অনুমানও নয়। "রেটোরিক" গ্রন্থে (দ্বিতীয় পর্ব, ৫ম ও ৮ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এরিষ্টটল 'পিটি' এবং "ফিয়ার"-এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কল্পনা করেছেন এবং পোয়েটিক্স্-গ্রন্থেও স্পষ্ট ভাষায় তা' ব্যক্ত করেছেন।

এরিষ্টটল হয়তো মনে করতেন—রাফেলের ভাষায় বললে—"One of the purposes of Tragedy is to make us fear for ourselves the distress we pity in others" (১৬ পৃঃ প্যারাডক্স্ অফ ট্র্যাজেডি)। শোচনার সঙ্গে আত্মক্ষতির আশংকা কিভাবে এবং কতখানি মিশে থাকে না থাকে, তা নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রবেশ করবার প্রয়োজন নেই। এখানে এইটুকু জানাই যথেষ্ট যে এরিষ্টটল কথিত "ফিয়ার" "মিচফরচুন"—চেতনাজনিত এবং সমবেদনাত্মক মানসিক অবস্থা এবং শোচনায় পৌঁছানোরই অব্যবহিত পূর্বের অবস্থা। এইদিক থেকে দেখলে এ কথা অবশ্যই বলতে হবে যে, ট্র্যাজেডির মূল বা মুখ্যভাব হচ্ছে শোচনা এবং ভয় হচ্ছে আনুষঙ্গিক ভাব। এই প্রসঙ্গে ডি. ডি. রাফেল মহাশয় যা লিখেছেন তা উল্লেখ করা যেতে পারে—"Nor does it need much argument to show that Aristotle ties pity and fear too closely together. His doctrines rest on the fact that to be capable of pity we must be capable of imagining and therefore of experiencing in ourselves, pain or evil such as that which we see affecting or threatening the person pitied. More generally, sympathy of any kind, since it includes the representation in imagination of another's feelings, presupposes experience of sufficiently similar feelings in ourselves. To pity another's pain I must know what pain is" (১৭ পৃঃ; প্যারাডক্স্ অফ ট্র্যাজেডি)। বোধহয় এরিষ্টটলের বক্তব্য এই যে শোচনার সঙ্গে ভয় মিশে থাকে এবং ট্র্যাজেডি যে শোচনা জাগায় তা' ভয়মিশ্র শোচনা। সে যাই হোক, এরিষ্টটলের মতে ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য হ'ল 'শোচনা ও ভয়' জাগানো। তবে শোচনা ও ভয় ছাড়াও আর একটি ভাবের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, সেই ভাবটি হচ্ছে—বিস্ময় (wonder)।

তিনি লিখেছেন—"The element of the wonderful is required in Tragedy" (৯৫ পৃঃ) এবং wonderful নির্ভর করে—"irrational"-এর উপরে। "irrational" শব্দটি তিনি দু'টি অর্থে ব্যবহার করেছেন, এক অর্থে 'ইর্‌র্যাশানাল' ব'লতে অবিশ্বাস্য ঘটনা বুঝায়, অন্য অর্থে—antecedent or subsequent events, which lie beyond the range of human knowledge and which require to be reported and foretold ; for to the Gods we ascribe the power of seeing all things (৫৫-৫৬ পৃঃ)। ট্র্যাজেডিতে বিস্ময়কর ঘটনার বিন্যাস প্রয়োজনীয়, এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ কথাও বলেছেন—"within the action" there must be nothing irrational (৫৭ পৃঃ), অর্থাৎ বৃত্তের মধ্যে অযুক্তিযুক্ত কিছু থাকতে পারবে না। মোট কথা তা' হলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, ট্র্যাজেডি একাধারে "শোচনা", "ভয়" এবং "বিস্ময়" এই তিনটি ভাবকেই উদ্রিক্ত করবে, অর্থাৎ এই তিন ভাবের সমুচিত সংযোগের উপরেই ট্র্যাজেডি-রসের নিষ্পত্তি নির্ভর করে।

এই ধারণা এরিষ্টটলের সময় থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত গতিতেই চলে এসেছে। কোন সমালোচকই তেমন কোন আপত্তি করেন নি। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে হেগেল প্রমুখ দার্শনিকদের কাছে ধারণাটিকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। হেগেল (১৭৭০-১৮৩১), শোপেনহাওয়ার (১৭৮৮-১৮৬০) এবং নীৎসে (১৮৪৪-১৯০০) ট্র্যাজেডির রস সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন তা'তে এরিষ্টটলের সিদ্ধান্তের বিপরীত কথাই বলা হয়েছে। তাঁদের মতে শোচনা ও ভয় জাগানো ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য নয় ; ট্র্যাজেডি মনকে ভয় ও শোচনার ঊর্ধ্বে নিয়ে যেয়ে মহত্তর একটি বোধের ভূমিতে পৌঁছে দেয়। দার্শনিক হেগেল ব'লতে চান—ট্র্যাজেডির দ্বন্দ্ব ও সমাধানের ভিতর দিয়ে আমাদের অন্তর্নিহিত ন্যায়বোধ (sense of Eternal Justice) চরিতার্থ হয়, নায়কের পতনের দৃশ্য দেখে—sense of reconciliation জাগে। এই ন্যায়বোধ ও সমাধানবোধের মধ্যেই ট্র্যাজেডির আসল রস নিহিত থাকে। দার্শনিক শোপেনহাওয়ার বলেন ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য ভয় ও শোচনা জাগানো নয়, ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য—"spirit of resignation"—আত্মসমর্পণের প্রশান্তি উদ্বোধিত করা। ট্র্যাজেডি-নায়কের পরিণাম দেখে দর্শক বা শ্রোতা জীবনের বৃথা অভিমান পরিত্যাগ করে, বাসনাকে প্রশমিত করে এবং নিয়তির কাছে নায়কেরই মতো আত্মসমর্পণ করে। যে নাটক এভাব জাগাতে না পারবে, তা' ট্র্যাজেডি পদবাচ্য হবে না। দার্শনিক নীৎসেও তাঁর দর্শনের বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে ট্র্যাজেডির রস সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন। "বার্থ অফ ট্র্যাজেডি"-গ্রন্থে তিনি এ সম্বন্ধে যে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন তার সার কথা

এই যে, ট্র্যাজেডি আমাদের মধ্যে "মেটাফিজিকাল কম্‌ফর্ট"—পারমার্থিক সান্ত্বনা সৃষ্টি করে। নায়কের বিনাশ দেখে দর্শকরা দুঃখিত বা ভীত হয় না—আনন্দিত হয়। আমাদের মধ্যে যে "secret instinct for annihilation" আছে, ট্র্যাজেডি সেই বাসনা চরিতার্থ করে। ট্র্যাজেডির রসাস্বাদ আসলে 'পারমার্থিক সান্ত্বনা' লাভেরই আনন্দ।

এই সব দার্শনিকদের আলোচনা, আগেই বলেছি ট্র্যাজেডির রসবিচারকে শোচনা-ভয়-বিস্ময় প্রভৃতি ভাবের স্তর থেকে পরাদর্শনের বা দার্শনিক ভাবনার স্তরে নিয়ে গেছে এবং সেখানেও যে কোন মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি, নানা মুনির নানা মতেই তা' প্রমাণিত। এঁদের আলোচনায় এবং সিদ্ধান্তে আর কিছু হো'ক না হো'ক, ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য যে শোচনা-ভয়-বিস্ময় প্রভৃতি সংকীর্ণ ভাবাবেগ জাগানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—এই ধারণা প্রচলিত হ'য়েছে এবং "প্যাথেটিক ট্র্যাজেডি" নামে ট্র্যাজেডির যে প্রজাতিটি চলে আসছিল তার উপর উৎকট বিরাগ দেখা দিয়েছে। বলাবাহুল্য, এঁদের চিন্তা বিংশ শতাব্দীর শিল্পতত্ত্ববিদ্‌দের চিন্তাকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করেছে—ট্র্যাজেডি-রসে 'শোচনা'র স্থান কতটুকু বা আদৌ আছে কি না এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিংশ শতাব্দীতে ট্র্যাজেডিতত্ত্ব নিয়ে যাঁরা চিন্তা করেছেন তাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত চিন্তাশীলরা উল্লেখযোগ্য।

১। এ. সি. ব্র্যাড্‌লে—শেকস্‌পীয়ারীয়ান ট্র্যাজেডি (১৯০৪)

২। জে. এম. স্মার্ট—'ট্র্যাজেডি' (এসেজ এ্যাণ্ড স্টাডিজ অফ দি ইংলিশ এসোসিয়েশান, ৮ম খণ্ড (১৯২২)

৩। ডবলু্ ম্যাকনিল ডিক্সন—ট্রাজেডি (১৯২৪)

৪। আই. এ. রিচার্ড—প্রিন্সিপিল্‌স্ অফ লিটারারি ক্রিটিসিজ্‌ম্ (১৯২৫)

৫। এফ. এল. লুকাস—ট্র্যাজেডি (১৯২৭)

৬। এলারডাইস নিকল— { এ্যান ইন্‌ট্রোডাকশান টু ড্রামাটিক থিওরি (১৯২৩)
দি থিওরি অফ ড্রামা (১৯৩১)।

৭। চু কোয়াঙ্ শিয়েন—দি সাইকোলজি অফ ট্র্যাজেডি (১৯৩৩)

৮। উনা এলিস-ফারমোর্—দি ফ্রন্টিয়ার্স অফ ড্রামা (১৯৪৫)

৯। কার্ল জেস্‌পার্স—ট্র্যাজেডি ইজ নট এনাফ্ (১৯৫৩)

১০। এইচ. ডি. এফ. কিট্টো—ফর্ম এ্যাণ্ড মিনিং ইন ড্রামা (১৯৫৬)

১১। টি. আর. হেন—দি হারভেষ্ট অব ট্র্যাজেডি (১৯৫৬)

১২। ডবলু. জি. ম্যাক্‌কোলোম—ট্র্যাজেডি (১৯৫৭)

১৩। কেনেথ মুর—সেকস্‌পীয়র এ্যাণ্ড দি ট্র্যাজিক্ প্যাটার্ণ (১৯৫৮)

'* ১৪। ডি. ডি. রাফেল—দি প্যারাডক্স্ অফ ট্র্যাজেডি (১৯৬০)

১৫। জর্জ স্টেইনার—দি ডেথ অফ ট্র্যাজেডি (১৯৬১)

* ১৬। এলারডাইস নিকল—দি থিয়েটার এ্যাণ্ড ড্রামাটিক থিওরি (১৯৬২)

দার্শনিকদের আলোচনায় যে "শোচনা" বিরাগ দেখা দিয়েছিল, বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত নাট্যতত্ত্বকার অধ্যাপক এলারডাইস নিকলের গ্রন্থে তা নতুন আকারে দেখা দিয়েছে। 'থিওরি অফ ড্রামা' গ্রন্থে (১৯৩১) তিনি এ বিষয়ে যা 'লিখেছেন তা উদ্ধৃত করলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

"Pity and terror"—we can not quite be assured what Aristotle meant by these words, but taking them at their ordinary English value, we may well meditate whether they express exactly the genuine tragic emotions. Terror, assuredly, is frequently called forth by a great drama, although terror is not the chief emotion in the audience ; but as regards pity, we may truly feel doubtful whether in a high tragedy it may to any great extent enter in. Tragedy, after all, is not a thing of tears......Pathos is closely connected with pity and neither is generally indulged in by the great dramatists as the main tragic motif........There is always something stern and majestic about the highest tragic art.......... ....* Tragedy, then, we may say, has for its aim not the arousing of pity, but the conjuring up of a feeling of awe allied to lofty grandeur"—(পৃঃ ১২০-১২২)। শেষাংশে অধ্যাপক নিকল খুব স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়েছেন—ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য শোচনা জাগানো নয়, ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য "feeling of awe allied to lofty grandeur" সৃষ্টি করা। "feeling of awe" বলতে বুঝায় বিস্ময়বোধ এবং সেই হিসাবে ট্র্যাজেডিকে বলতে হয় অদ্ভুত রসের নাটক। আমরা দেখছি অধ্যাপক নিকল এরিষ্টটল কথিত 'পিটি এ্যাণ্ড ফিয়ার"-কে বিশেষ আমল দেননি, "feeling of wonder, admiration, awe"-কেই মুখ্য ভাব রূপে গণ্য করেছেন। এই সিদ্ধান্ত করেই তিনি সন্তুষ্ট হ'তে পারেননি। আমরা দেখতে পাই, ১৯৬২ খৃঃ প্রকাশিত 'দি থিয়েটার এ্যাণ্ড ড্রামাটিক থিওরি' গ্রন্থে তিনি নতুন ক'রে ট্র্যাজেডি-রস সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনায় প্রবেশ করার আগে চু কোয়াং শিয়েন এবং ডি. ডি. রাফেল মহাশয়ের সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করা যাক্।

চু কোয়াঙ্ শিয়েন, "সাইকোলজি অফ্ ট্র্যাজেডি" গ্রন্থে (১৯৩৩) ট্র্যাজেডি-রস ও সাবলিমিটির মধ্যে অন্তরঙ্গ যোগ লক্ষ্য করেছেন,—বলেছেন, ট্র্যাজেডি সাবলাইমেরই একটি প্রজাতি। 'সাবলাইম'-বোধের মধ্যে যেমন যুগপৎ "admiration and awe, elevation and abasement" থাকে, তেমনি ট্র্যাজেডি-বোধের মধ্যে থাকে যুগপৎ শোচনা এবং সম্ভ্রম ও বিস্ময়। তিনি মনে করেন—শোচনার সঙ্গে ভয় যোগ ক'রে এরিষ্টটল ঠিকই করেছেন—অবশ্য ভয়ের অর্থ যদি হয় বিস্ময় (awe) তবেই। আর শোচনা ও ভয়ের সঙ্গে (কর্ণেই-কল্পিত) বিস্ময় (wonder or admiration) যোগ করা যেতে পারে।

তিনি বলেন—সাবলিমিটিতে আছে 'গ্রেস', 'এ্যাডমিরেশান এবং 'অ'; ট্যাজেডিতে আছে 'পিটি', এ্যাডমিরেশান এবং অ এবং পিটি জাগে "গ্রেসফুল" থেকে, যার সঙ্গে বিষাদভাব মিশে থাকে; হিরোয়িক গ্র্যাঞ্জার থেকে জাগে 'এ্যাডমিরেশান এবং নিয়তির শক্তি থেকে জাগে 'অ'। তাঁর মতে, শুধু পিটি থাকলে—কেবলমাত্র "sense of sad gracefulness"ই জাগে, মহিমাবোধের উদ্দীপনা তাতে থাকে না; সুতরাং বীরত্বের মহিমা বা ঐশ্বর্য যোগ করতে হবে এবং তা' করলে বিস্ময় উদ্‌বোধিত হবে। কিন্তু বীরত্বের উপাদান প্রধান হয়ে উঠলে চলবে না, ট্র্যাজেডি হবে না। অতএব বীরত্বের উপাদানের সঙ্গে 'element of terror' মিশিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। কারণ শুধু বীরত্ব আমাদের কেবল উদ্দীপিতই করে, আর শুধু 'ভয়' আমাদের কেবল ভীতই করে, উদ্দীপিত করে না। ট্র্যাজেডি যুগপৎ আমাদের উদ্দীপিত এবং ভীত করে। "The merely terrible is in its effect just opposite to the heroic, each possesses what the other lacks. The heroic inspires us without first thrilling us with an emotion of fear, whereas the merely terrible thrills us with fear without inspiring us. The tragic must produce both effects at once" (দি সাইকোলজি অফ ট্র্যাজেডি, ৯০ পৃঃ)। ট্র্যাজেডিতে আমরা নিয়তির শক্তি দেখে শংকিত হই বটে, কিন্তু নায়কের দেবোপম বীরত্ব দেখে উদ্দীপিত হই। ট্র্যাজেডির আনন্দ আসলে—"overflowing life and intense activity" উপলব্ধির আনন্দ।

শ্রদ্ধেয় ডি. ডি. রাফেল মহাশয়, চু কোয়াঙ্ শিয়েন মহাশয়ের সিদ্ধান্তের সঙ্গে কোন স্থলে একমত, কোন স্থলে ভিন্নমত হয়েছেন। তিনি স্বীকার করেন—শুধু শোচনায় ট্র্যাজেডি-রস নিষ্পন্ন হয় না, বীর-ঐশ্বর্যের মহিমা বোধও শোচনার সঙ্গে মিশ্রিত হওয়া দরকার। কিন্তু তিনি তাঁর এ সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না যে, 'হিরোয়িক গ্র্যাঞ্জার'

এর সঙ্গে 'ভয়ের ভাব' না মিশলে ট্র্যাজেডি-রস ক্ষুণ্ণ হবে। সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—চু কোয়াঙ্ শিয়েন 'ভয়' যোগ করেছেন এই যুক্তিতে যে ট্যাজেডি ও সাবলাইমের আবেদন একই এবং 'সাবলাইম'-এর মধ্যে একই সঙ্গে ভয় বা আত্মাবনয়ন এবং মহিমার উদ্দীপনা থাকে। রাফেল মনে করেন—এ ধারণা ভুল, কারণ নিয়তি-লাঞ্ছিত না হওয়া সত্ত্বেও মহাকাব্যের নায়ক সাবলাইম হ'তে পারে। তাঁর দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, চু কোয়াঙ্ শিয়েন মহাশয়—ভয় ভাবের উদ্দীপক করেছেন—নিয়তিকে এবং বিস্ময়ের উদ্দীপক করেছেন—নায়ককে এবং তা' করায় সাবলাইমের সঙ্গে সাদৃশ্য-কল্পনা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। 'সাবলাইম'-বস্তু একই সঙ্গে মহান এবং ভয়ংকর। কিন্তু তিনি মহত্ত্বের আধার করেছেন নায়ককে এবং ভয়ের পাত্র করেছেন—নিয়তিকে। রাফেল মনে করেন—ট্র্যাজেডিতে নিয়তি এবং নায়ক উভয়ই 'সাবলাইম' এবং ট্র্যাজেডি আসলে দুই সাবলাইমের দ্বন্দ্বের রূপ। দ্বন্দ্বের এক পক্ষে থাকে—অনিবার্য কোন শক্তি, যাকে বলা চলে—'necessity' এবং অন্যপক্ষে থাকে আত্মসচেতন সংগ্রামশীল ব্যক্তি। রাফেল ঐ অমোঘ শক্তিকে নিয়তি না বলে 'নেসেসিটি' বলেছেন; কারণ ঐ শক্তি ব্যক্তির বাইরে যেমন থাকতে পারে, তেমনি ব্যক্তির ভিতরেও চরিত্রপ্রবণতারূপে থাকতে পারে। বাইরে যে শক্তি সে যেমন নিয়তি বা প্রাকৃতিক শক্তিরূপে থাকতে পারে, তেমনি তা' সামাজিক শক্তি রূপেও থাকতে পারে। ঐ শক্তি অনিবার্য এবং অমোঘ, কারণ তা' ব্যক্তির সমস্ত ঐকান্তিক চেষ্টা এবং বিস্ময়কর সংগ্রাম সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিকে পর্যুদস্ত করে। নায়কের প্রতিপক্ষ তার বিস্ময়কর শক্তির অমোঘতার জন্য মহীয়ান (সাবলাইম) এবং নায়ক মহীয়ান তার বিস্ময়জনক চরিত্র-মহিমার জন্য। রাফেলের নিজের ভাষায়—"The greatness of his opponent is greatness of physical power. His own greatness is greatness of spirit" ট্র্যাজেডিতে নাট্যকার—"stirs in us more admiration for the human spirit than awe for the powers of necessity." অর্থাৎ শক্তির মহিমার চেয়ে মানব-মহিমাকেই (নায়কের greatness of spirit-কেই) বড় করে দেখিয়ে থাকেন, মানব-মহিমারই প্রতি বেশী সম্ভ্রম জাগাতে চেষ্টা করেন। চু কোয়াঙ্ শিয়েনের মতো রাফেলও ট্র্যাজেডির সৌন্দর্য বা রসকে সাবলাইমেরই একটি প্রজাতি ব'লে মনে করেন বটে, কিন্তু তিনি এ কথা মানতে চান না যে, সাবলাইম সবক্ষেত্রেই 'wonder and awe' জাগাবে। তিনি মনে করেন, awe ছাড়াই শুধু "admiration" 'সাবলাইম' হতে পারে। তিনি এ. সি. ব্র্যাড্লের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত নন যে, সাবলাইম-বোধে যুগপৎ 'feelings of abasement'এবং 'feelings of elevation' অর্থাৎ একদিকে

ভয়ংকরের সম্মুখে আত্মাবনয়ন বা আত্মসমর্পণ, অন্যদিকে বিস্ময়করের সম্মুখে আত্ম-সম্প্রসারণের আবেগ কাজ করে। ট্র্যাজেডি এবং মহাকাব্য উভয়েই নায়ককে মহিমান্বিত করে রূপ দেয়; কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ট্র্যাজেডির দ্বন্দ্ব ও পরিণাম জটিল এবং বিরুদ্ধভাবাত্মক (complicated and paradoxical)

প্রাকৃতিক পর্যায়ে ট্র্যাজেডির নায়ক প্রতিকূল অমোঘ শক্তির হাতে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয় বটে, কিন্তু আত্মিক পর্যায়ে ব্যর্থ সংগ্রামের ভিতর দিয়েই নায়ক মহিমময় হয়ে উঠে। রাফেল বলেন—The inner conflict of Tragedy is between the two forms of the sublime, the awe-spiring strength of the necessity and the 'grandeur d'āme' which inspires admiration. Each triumphs on its own plane, but the triumph of the human spirit is the more elevating" অর্থাৎ ট্র্যাজেডির ভিতরকার দ্বন্দ্ব হ'চ্ছে দুই মহীয়ানের (সাবলাইমের) মধ্যে দ্বন্দ্ব, একদিকে বিরোধী পরিবেশের ভয়মিশ্র বিস্ময়কর শক্তি, অন্যদিকে নায়কের বিস্ময়-উল্লাসকর আত্মিক মহিমা। উভয়েই নিজ নিজ স্তরে বিজয়ী, কিন্তু মানব-মহিমার জয়ই অধিকতর উদ্দীপক। ট্র্যাজেডি দেখে আমাদের যে আনন্দ হয় সে এই মানব-মহিমার জয় দেখার আনন্দ। আমাদেরই মতো একজন মানুষ প্রতিরোধী দুর্বার শক্তির উপরে জয়ী হয়েছে—এই জয় দেখার আনন্দ। যেখানে এই মানব-মহিমাকে ঐ শক্তির চেয়ে ছোট করা হয়, ঐ শক্তির কাছে মানুষের মাথাকে নত করে দেওয়া হয়, সেখানে ট্র্যাজেডি-রস নষ্ট হ'য়ে যায়, কারণ— "abasement has no place in tragic emotion." দেখা গেল—শ্রদ্ধেয় ডি. ডি. রাফেল মহাশয় ট্যাজেডির রসনিরূপণে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হ'য়েছেন যে, ট্র্যাজেডিকে একাধারে শোচনা এবং বিস্মিত-উল্লাস উদ্রেক করতে হবে এবং ট্র্যাজেডির রসে ভয়ের কোন স্থান নেই। ট্র্যাজেডির নায়ককে একই সঙ্গে "object of pity as well as of admiration" হতে হবে।

'পিটি' এবং 'এ্যাড্‌মিরেশান' এই দু'টি যুগ্ম ভাবই ট্র্যাজেডি-রসের স্থায়িভাব ; শুধু 'পিটি' বা শুধু 'এ্যাড্‌মিরেশান' থাকলে ট্র্যাজেডি হবে না। 'এ্যাডমিরেশান'-ছাড়া 'পিটি' এবং 'পিটি'-ছাড়া এ্যাডমিরেশন ট্র্যাজেডি-রস সৃষ্টিতে অসমর্থ। যে সমস্ত ভাব 'পিটি' এবং 'এ্যাডমিরেশানে'র পরিপন্থী অর্থাৎ যে ভাব "unmerited suffering"-এর অস্তিত্ব নস্যাৎ করে দেয় এবং নায়কের মহিমাকে খর্ব করে দেয়, সেই ভাবগুলি ট্র্যাজেডি-রসের ক্ষতিকারক। এই প্রসঙ্গেই শ্রীযুক্ত রাফেল বাইবেলের ধর্মদর্শনের সঙ্গে ট্র্যাজেডির বিরোধের কথা তুলেছেন এবং দেখিয়েছেন দু'টি কারণে ধর্মমূলক

ট্র্যাজেডিতে ট্র্যাজেডি-রস নিষ্পত্তিতে বাধা জন্মে। প্রথমতঃ, ধর্মদর্শন এই কথাই বলে যে, ভগবান যা' করেন মঙ্গলের জন্যই করেন, অমঙ্গল মহত্তর মঙ্গলেরই উপায়বিশেষ, ভগবানের বিধানে অনুচিত দুর্ভোগ ব'লে কিছু থাকতে পারে না, তিনি মঙ্গলময়। এই ধরণের দার্শনিক পরিমণ্ডলে "unmerited suffering"-এর জন্য শোচনা জাগানো সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, ধর্মমূলক নাটকে মানুষের মহিমার চেয়ে ভগবানের মহিমাকেই বড় ক'রে দেখানো হয়, মানুষকে ভগবানের মহীয়ানত্বের সম্মুখে অবনত করা হয়— "it abases man before the sublimity of God." ধর্মদর্শনের সঙ্গে ট্র্যাজেডির বিরোধ রয়েছে—এ কথা সপ্তদশ শতাব্দীর সমালোচক Saint Evremond প্রথম ঘোষণা করেছিলেন। তারপর আই. এ. রিচার্ড, অধ্যাপক কার্ল জেসপারস্, অধ্যাপক উনা এলিস-ফারমোর, চু কোয়াঙ্ শিয়েন প্রমুখ অনেকেই বলেছেন। চু কোয়াঙ্ বলেছেন—ট্র্যাজেডি শুধু খ্রীষ্টধর্মের পরিমণ্ডলেই যে অসম্ভব তা নয়, সমস্ত ধর্মদর্শনের ক্ষেত্রেই এবং সব পরাদর্শনের পরিমণ্ডলেই অসম্ভব। শ্রদ্ধেয় ডি. ডি. রাফেল মহাশয় এঁদের সঙ্গে অনেকাংশেই একমত, তবে ধর্মদর্শনের পরিমণ্ডলে ট্র্যাজেডির অস্তিত্ব সব ক্ষেত্রেই অসম্ভব এ কথা তিনি স্বীকার করেন না। আর কেউ পারুন আর না পারুন, নাট্যকার রাসিন যে ট্র্যাজেডি ও খ্রীষ্ট-ধর্মদর্শনের মধ্যে সমন্বয় করতে সক্ষম হ'য়েছেন এ বিষয়ে তাঁর মনে কোন সন্দেহ নেই। তিনি মনে করেন—দৈব অন্যায়ের সমস্যাটিকে নিয়তিবাদের (doctrine of predestination) দ্বারা পাশ কাটিয়ে যেতে পারলে—"it is possible to stage a conflict, as in Greek Tragedy, between divine power and human ideas of justice." এবং সেই দ্বন্দ্ব তখনই ট্র্যাজিক হবে যখন—"thc side of justice is allowed to win our sympathy with the implication of antipathy to the power opposing it." (৬৭ পৃঃ ; প্যারাডক্স্ অফ ট্র্যাজেডি)। আসল কথাটি এখানেই বলা হয়েছে—দৈব-চেতনাকে আচ্ছন্ন করে মানব-সমবেদনা বড় হয়ে না উঠলে, ট্র্যাজেডির রস-নিষ্পত্তিতে ব্যাঘাত ঘটবেই।

এই প্রসঙ্গেই আমাদের পৌরাণিক নাটকে ট্র্যাজেডি-রস নিষ্পত্তির সুযোগ সম্ভাবনা আছে কি না—সে সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা যেতে পারে। যে সব পৌরাণিক নাটকের নায়ক কোন অভিশপ্ত দেবতা, মরলোকে বাস যার পক্ষে অভিশপ্ত জীবন,— স্বর্গে ফিরে যাওয়াই যার অভিশাপমুক্তি, সেই সব নায়ক-অবলম্বনে ট্র্যাজেডি-রস সৃষ্টি করা যায় না এই কারণে যে, নায়কের ভাগ্যবিপর্যয় এবং মৃত্যু আমাদের মধ্যে ট্র্যাজেডি-সংবিদ-উপযোগী শোচনা জাগাতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ যে সব নাটকের নায়ক, সমস্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ও শোচনীয় দুঃখ-দুর্গতির শেষে ভগবৎ কৃপালাভে পরম পুরুষার্থ লাভ করে, দেবদর্শন লাভ ক'রে মুক্ত হয়ে যায় বা পরম শান্তি লাভ করে, সেই সব ক্ষেত্রেও ট্র্যাজেডি-সংবিদ নষ্ট হ'য়ে যায়। তৃতীয়তঃ যে সব নাটকে (নায়ক অভিশপ্ত দেবতা বা ভগবদ্দর্শনলাভে কৃতকৃতার্থ না হ'লেও) এমন একটি দার্শনিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা হয় যা' মায়াবাদে পরিপূর্ণ বা মঙ্গলময় দৈববিধানের গুণগানে মুখরিত, সেই সব নাটকেও, নায়কের শোচনীয় ভাগ্য-বিপর্যয়ের দৃশ্য দেখে স্বাভাবিক ভাবে যে পরিমাণ শোচনা জাগার কথা, সেই পরিমাণ আশানুরূপ শোচনা জাগতে পারে না; ঐ দার্শনিক সংস্কারের প্রাবল্যে শোচনা প্রশমিত হয়ে যায়। সুতরাং পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করতে হ'লে—নায়কের দ্বন্দ্ব ও দুঃখ-দুর্দশাকে এমন প্রবলভাবে রূপ দিতে হবে যা'তে দৈব-চেতনা ও দার্শনিক সংস্কার শোচনা দ্বারা আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়,—দর্শকের মনে নায়কের শোচনীয় পরিণামের বেদনাই বড় স্থান অধিকার করে। মেঘনাদবধ মহাকাব্যের রাবণের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। রাবণ বল্‌ছেন—'জানি এ সংসার মায়াময়, বৃথা এর সুখ দুঃখ যত, তবু জেনে শুনে কাঁদে এ পরাণ অবোধ।' সব জেনে শুনেও অবোধ প্রাণ কাঁদ্‌বে—তবেই তো ট্র্যাজেডি। যেখানে এই জানা-শোনা এমন একাধিপত্য স্থাপনা করে যে হৃদয়ের অনুভূতি মাথা তুলতে পারে না, সেখানে ট্র্যাজেডি নেই। অতএব দেবতার কথা, দর্শনের কথা থাকলেই ট্র্যাজেডি-রস নষ্ট হয়ে যাবে, এমন কথা বলা চলে না। যে পরিপ্রেক্ষিতেই ট্র্যাজেডি-কার জীবন-দ্বন্দ্ব উপস্থাপিত করুন, তার দৃষ্টিকে জীবনের শোচনীয় পরিণামের বেদনার লক্ষ্যেই নিবদ্ধ রাখতে হবে। পরাদর্শন এবং ধর্মদর্শনের মহিমার দিকে নয়, জীবনের ঐকান্তিক মূল্যবোধের, আশা-আকাঙ্ক্ষার, ক্ষয়-ক্ষতি-অপচয়জনিত শোচনীয় পরিণামের জন্য সহানুভূতি জাগানোর দিকেই তাঁকে একাগ্র দৃষ্টি দিতে হবে। তাঁকে পরিহার করতে হবে একদিকে অত্যুগ্র পরাদর্শনের ও ধর্মদর্শনের কোটিকে—দ্বন্দ্বাতীত মানসিক অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টাকে; অন্যদিকে জীবনের লঘু ও কৃত্রিম পরিবেশ, ভাব এবং ভাবনাকে। এই দুই কোটির মধ্যবর্তী অবকাশে ট্র্যাজেডি-রসের স্থিতি। পরাদর্শন এবং ধর্মদর্শনের প্রাধান্য ঘটলে যেমন ট্র্যাজেডি-রস নিষ্পত্তিতে ব্যাঘাত ঘটে তেমনি লঘু ও কৃত্রিম পরিস্থিতি এবং অস্বাভাবিক কথা অবাস্তব অনুভাব-সঞ্চারিভাব, ট্র্যাজেডিকে মেলোড্রামার স্তরে অবনত করে দেয়। সুতরাং এই দুই শত্রুর বিরুদ্ধে ট্র্যাজেডি-নাট্যকারকে থাকতে হবে সতর্ক এবং সমালোচককে থাকতে হবে অবহিত। পরাদর্শনের, ধর্মদর্শনের মিশ্রণে ট্র্যাজেডিরস ক্ষুণ্ণ হ'চ্ছে কি হ'চ্ছে না এ নির্ধারণ করা যেমন কঠিন কাজ, তেমনি কঠিন কাজ—মেলোড্রামা দোষ স্পর্শে কোথায় ট্র্যাজেডি-রস ক্ষুণ্ণ হচ্ছে তা' নিরূপণ করা। কাজটি

আরো কঠিন এই কারণে যে, 'মেলোড্রামা'র সংজ্ঞা বিষয়ে পণ্ডিতরা সম্পূর্ণ একমত হতে পারেন নি। তবে পণ্ডিতরা সম্পূর্ণ একমত হতে না পারলেও, তাঁদের আলোচনার আলোকে একটি কথা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং সেটি এই যে মেলোড্রামা গুরুগম্ভীর রসের নাটক লেখার অসার্থক চেষ্টা।

মেলোড্রামা কথাটির ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে দেখা যাবে—সপ্তদশ শতাব্দীতে গ্রীক নাটকের অনুরূপ কোরাস-গানযুক্ত ট্র্যাজেডি নাট্যরচনাকে মেলোড্রামা আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। ইতালীতে 'অপেরা' এবং 'মেলোড্রামা' বহুকাল একই অর্থে প্রযুক্ত হয়েছিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ইংলণ্ডে এবং ফ্রান্সে 'মেলোড্রামা' বলতে বুঝাতো সেই নাটককে—যা' সংগীত সহযোগে অভিনীত করা হতো অর্থাৎ গোড়াতে মেলোড্রামা বলতে অভিনয়ের একটা বিশেষ রীতি (a convenient theatrical description based on purely external features) বুঝাতো। কিন্তু পরবর্তী কালে এবং এখন 'মেলোড্রামা' বলতে বুঝায়, অধ্যাপক নিকলের ভাষায়— "a particular approach to dramatic material and a particular way of handling that material—(৮৫ পৃঃ ; দি থিয়েটার এ্যাণ্ড ড্রামাটিক থিওরি) এই গ্রন্থে অধ্যাপক নিকল মেলোড্রামার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন ঃ—

(ক) মেলোড্রামায় 'সাহিত্যিক গুণ' (literary quality) তেমন থাকে না।

(খ) চরিত্রের ব্যক্তিত্ব বিকশিত করার চেষ্টা (to individualise the characters) থাকে না ; চরিত্রগুলি ছকবাঁধা (টাইপ) হ'য়ে উঠে।

(গ) চরিত্রগুলি 'নাটকীয়' 'নাটকীয়' (theatrical) মনে হয়।

(ঘ) আবেগাদি ও পরিস্থিতি কৃত্রিম (fictional) মনে হয়।

(ঙ) দর্শকের মন সব সময় চমকপ্রদ ঘটনা দিয়ে উত্তেজিত করে রাখার চেষ্টা করা হয় (to keep the audience constantly supplied with series of thrills.) এ বিষয়ে অধিক আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবে এই কথাটি মনে রাখা দরকার—'মেলোড্রামা' সবক্ষেত্রে বিয়োগান্ত হবে এমন কোন কথা নেই এবং ট্র্যাজেডি রসোত্তীর্ণ না হলেই নাটক মেলোড্রামা হয় না।

এবার ট্র্যাজেডি-রস বিষয়ে অধ্যাপক নিকল মহাশয়ের অতি সাম্প্রতিক আলোচনায় প্রবেশ করা যাক। আমরা দেখেছি 'থিওরি অফ ড্রামা' গ্রন্থে অধ্যাপক নিকল ট্র্যাজেডি-রস বিষয়ক আলোচনায় "awe allied to lofty grandeur"-কেই ট্র্যাজেডির স্থায়ী ভাব বলে নির্দেশ করেছেন এবং সেখানে সামাজিক ট্র্যাজেডির জন্য একটি

পংক্তি ছেড়ে দিতে কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'দি থিয়েটার এ্যাণ্ড ড্রামাটিক থিওরি'-গ্রন্থে ট্র্যাজেডি-রস সম্পর্কে যে নতুন আলোচনা করেছেন তাতে অনেক ট্র্যাজেডিই ট্র্যাজেডির পংক্তিতে স্থান পাওয়ার অধিকার হারিয়েছে—বিশেষ করে সামাজিক এবং গার্হস্থ্য ট্র্যাজেডিগুলি অপাংক্তেয় বলেই ঘোষিত হয়েছে। অধ্যাপক নিকলের আলোচনা অনুধাবন করলেই দেখা যাবে—তিনি ট্র্যাজেডিরসকে সুদুর্লভ এবং অসাধারণ প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেছেন—সাধারণ 'sense of unmerited suffering' বা 'sense of human waste' প্রভৃতি ভাবের স্তর থেকে ট্র্যাজেডির ভাবকে আরো উর্ধ্বস্তরে নিয়ে গেছেন। অধ্যাপক নিকল 'tragic qualities' পরিচ্ছেদে লিখেছেন—পরবর্তী ক্লাসিকাল যুগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ট্র্যাজেডির আন্তর ধর্মের দিক লক্ষ্য না ক'রে বহির্লক্ষণের দিকেই বেশী ঝোঁক দেওয়া হ'য়েছে; ট্র্যাজেডি বলতে সমালোচকরা বুঝেছেন—'a type of play which showed an illustrious man passing from happiness towards a miserable end." এবং সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন—ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য হচ্ছে নৈতিক আদর্শ প্রচার করা। সুতরাং ট্র্যাজেডি-রসের স্বরূপ আলোচনায় এই সংজ্ঞাগুলি বা বিবরণ কোন উপকারেই আসবে না। তবে, ঐ সব সংজ্ঞা বা বিবরণ থেকে এইটুকু নির্দেশ পাওয়া যায়—(১) সব ট্র্যাজেডিরই বিষয়বস্তু হচ্ছে 'dark events' এবং ট্র্যাজেডির সদা চিন্তা হচ্ছে মৃত্যুর ভাবনা (thought of death) (২) প্রায় সব লক্ষণেই এই কথা বলা হয়েছে যে ট্র্যাজেডির 'নায়ক' হবে উচ্চবংশোদ্ভব এবং বৃত্ত হবে ঐতিহাসিক। (৩) পরিবেশে থাকবে প্রাচীন ঐশ্বর্যের গরিমা এবং চরিত্রে থাকবে অসাধারণ মহিমা। এই লক্ষণগুলি সমালোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক নিকল বলেছেন—মৃত্যু, হত্যা, আত্মহত্যা প্রভৃতি ঘটনা ট্র্যাজেডির উপজীব্য বটে, কিন্তু হত্যা বা মৃত্যুমাত্রেই ট্র্যাজিক নয়। তবে এই হত্যা বা মৃত্যুর উপর বেশী ঝোঁক দেওয়ার তাৎপর্যটি লক্ষ্য করবার মতো। প্রথমতঃ মৃত্যু বা হত্যার ঘটনা—"stimulate the imaginative vision" দ্বিতীয়তঃ—"substitution of the extra-ordinary for the familiar has the power of delving down to the primeval roots of humanity..........make possible an awareness of deeper truths........plot's exceptional nature in itself contributes towards its impress of universality." অর্থাৎ সাধারণ ঘটনার পরিবর্তে অসাধারণ ঘটনার উপস্থাপনা দ্বারা মানবসত্তার গভীরে পৌঁছে দেয়—গভীরতা সত্যের চেতনা জাগিয়ে দেয়—ঘটনাকে সার্বজনীন করে তোলে। তারপর, ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু ছাড়া ট্র্যাজেডি-রস নিষ্পন্ন হতে পারবে না—এ সিদ্ধান্ত ভুল বটে, কিন্তু এই প্রশ্নটি একটু তলিয়ে দেখলেই এ সিদ্ধান্ত করতেই হবে যে—When a dramatist deviates from such procedure he essays a task of truly tremendous difficulty—ঐতিহাসিক অর্থাৎ বিখ্যাত কাহিনী অবলম্বন না করলে ট্র্যাজেডি-রস জমানো কঠিন। এমন কি, নিকল বলেন শেকস্‌পীয়রের ওথেলো নাটকের গভীর আবেগ-আবেদন থাকা সত্ত্বেও পরিবেশে সমসাময়িকতার আবহাওয়া তথা 'domestic spirit' ফুটে ওঠায়, ট্র্যাজেডি-রস ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কারণ "domesticity in a play is apt to destroy the emotion which it is the mission and object of the tragic author to arouse"। 'ট্র্যাজেডিতে' 'strange events' রূপ না দিলে উপযুক্ত ভাব জাগানো সম্ভব হবে না। অধ্যাপক নিকল বলেছেন—নায়কের উচ্চ-বংশোদ্ভবতার উপর জোর দিয়ে প্রাচীন সূত্রকারগণ একটি গভীর সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। এ কথা সত্য বটে যে নায়ককে রাজরাজড়া হতেই হবে এ কথা মানা চলে না, কিন্তু এ কথা আরো সত্য যে "the hero must be generally superior to most men" কারণ ব্যক্তি অসাধারণ না হ'লে সমস্ত মানুষের প্রতিনিধি (symbolic force) হয়ে উঠতে পারে না—'he can not awaken that intense concern for man's plight which is certainly essential to tragedy'. অধ্যাপক নিকলের উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত—মূলতঃ সব ট্র্যাজেডিই প্রত্যক্ষতঃ বা পরোক্ষতঃ "religious and not social in tone." অবশ্য ধর্মমূলক বলতে এ বুঝায় না যে ট্র্যাজেডি কোন বিশেষ ধর্মতত্ত্ব প্রচার করবে, ধর্মমূলক বলা হচ্ছে এই কারণেই যে ট্র্যাজেডিতে মানুষকে অনন্তের পটভূমিতে দাঁড় করানো হয়। "In tragedy we are confronted by infinity and the finite, by the unseen pressure of unfathomable forces and by men." অর্থাৎ ট্র্যাজেডিতে একদিকে থাকবে রহস্যময় অনন্ত-শক্তি অন্যদিকে থাকবে সীমাবদ্ধশক্তি মানুষ। থাকবে এদের দ্বন্দ্ব, থাকবে মানুষের দেবপ্রতিস্পর্ধী শক্তির মৃত্যুঞ্জয় মহিমা।

অধ্যাপক নিকল ব'লতে চান—'ট্র্যাজেডি-সংবিদ জাগাতে হ'লে যেমন উদ্রিক্ত করতে হবে বিস্ময়বোধকে (sense of wonder, of awe), তেমনি সৃষ্টি করতে হবে আনন্ত্যের ব্যঞ্জনা, করতে হবে—নাটকের বৃত্তের মধ্যে 'cosmic issue'-র অবতারণা। সুতরাং যে সমস্ত নাটকে ব্যক্তি ও সমাজ-শক্তির দ্বন্দ্ব রূপ দেওয়া হয়েছে এবং সমাজ-শক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বে মানুষের শোচনীয় পরিণাম দেখানো হয়েছে, অথচ কোনরূপ আনন্ত্যের দ্যোতনা সৃষ্টি করা হয় নি, সেই সব নাটককে কোন মতেই ট্র্যাজেডি

বলা যায় না। আগে আমরা ভুল ক'রেই ইবসেনের 'গোষ্ট' নাটককে ট্র্যাজেডির পংক্তিতে স্থান দিয়েছি ; এখন সেই সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই বদলাতে হবে। ট্র্যাজেডি কথাটি খুব বাদ বিচার করে ব্যবহার করতে হবে—একমাত্র সফোক্লিস এবং শেকস্‌পীয়রের নাটকের মতো নাটকের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতে হবে। বলা বাহুল্য, "cosmic issue"-র উপরে বিশেষ ঝোঁক দেওয়ায়, অধ্যাপক নিকলের হাতে ট্র্যাজেডির ক্ষেত্র সংকুচিত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ট্র্যাজেডি দার্শনিক নাটকে পর্যবসিত হয়েছে। জন্ম-মৃত্যুর রহস্যের এবং দৈব-রহস্যের ভাবনা যে নাটকে থাকবে না, যে নাটকে মানুষের জীবনকে অসীমের পটভূমিতে স্থাপন করা হবে না, সেই সব নাটককে ট্র্যাজেডি ব'লতে আপত্তি ক'রলে, সামাজিক এবং গার্হস্থ্য ট্র্যাজেডিগুলি—এক কথায় 'রিয়েলিষ্টিক' ট্র্যাজেডি-গুলি আপনা থেকেই ট্র্যাজেডির পংক্তি থেকে বাদ পড়ে যায়। দেখা যাচ্ছে, অধ্যাপক নিকল মহাশয়ের এই নতুন সিদ্ধান্তকে মানতে গেলে শুধু 'রিয়েলিষ্টিক' ট্র্যাজেডিগুলিকেই নয়, সফোক্লিস-ইউরিপিডিসেরও বিখ্যাত বিখ্যাত ট্র্যাজেডিকে (এন্টিগোন, মিডিয়া প্রভৃতি) অপাংক্তেয় বলে ঘোষণা ক'রতে হবে। অধ্যাপক নিকলের মতের খাতিরে আমরা তা' করব কি ? অতএব, ট্র্যাজেডির রস সম্বন্ধে নতুন করে আলোচনা করা আবশ্যক।

সমান্তরাল

মন্মথ রায়

॥ মফঃস্বল সহরে কলেজ-কলোনি। দর্শনশাস্ত্রের যুবক অধ্যাপক মনোজ বসুর 'কটেজ'। সুসজ্জিত উপবেশন-কক্ষ। সকালবেলা। ডিভানে মনোজ বসু অবসন্ন অবস্থায় শায়িত। স্ত্রী সবিতা দেবী ফোনে আলাপরত ॥

সবিতা ॥ [ফোনে]..না না জয়াদেবী, আমি ব্লাডপ্রেসারে অচল হয়ে অনেকদিনই পড়ে রয়েছি, তাতে প্রফেসর বোসের হৈ হৈ করা আটকায় নি—আজ তিনি নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে ঘরে বন্দী হয়ে রয়েছেন।···কি বিপদ! আপনি কাল সন্ধ্যায় তাঁকে ভালো দেখেছেন বলেই কি আর তাঁর কোন অসুখ হ'তে পারবে না!···ডাক্তার রায়কে খবর দেওয়া হয়েছে, তিনি এসে দেখলে তবে জানা যাবে অসুখটা কি।···না না, আজ আর আপনি আসবেন না। এখন তাঁর বিশ্রাম দরকার। লড়াই-এর মিটিং? হোক্। যেতে পারবেন না উনি। [রিসিভারটি সজোরে নামাইয়া রাখিয়া স্বামীর নিকটে আসিয়া] এরা ভেবেছে কি?

মনোজ ॥ কে?

সবিতা ॥ কে আবার! তোমার জয়া সেন।

মনোজ ॥ ওঁর দোষ নেই সবিতা। আজ সকালে পাশের গাঁয়ে যাবার কথা লড়াই-এর মিটিং করতে আর প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য টাকা তুলতে। ব্যবস্থাটা ছিল আমার-ই। কিন্তু হঠাৎ এমন অসুস্থ হয়ে পড়ব কে জানতো! মাথা ধরা তো ছাড়েই নি, এখন এমন দুর্বল আর অবসন্ন বোধ হচ্ছে······কৈ, ডাক্তার রায় তো এখনো এলেন না!

[পুনরায় ফোন বাজিয়া উঠিল]

সবিতা ॥ এ হয়েছে আর এক যন্ত্রণা। [ফোন ধরিয়া] হ্যাঁ, আমি মিসেস্ বোস। আবার আপনি জয়া দেবী!······শ্যামপুর থেকে গাড়ি নিয়ে লোক এসেছে আপনাদের নিয়ে যেতে?······বেশ তো, আপনি যান না।······না, উনি যেতে পারবেন না। [রিসিভারটি রাগত ভাবে রাখিয়া দিয়া, স্বামীর কাছে আসিয়া] ······মিটিং করবার লোক কি তুমিই শুধু একা? দেশোদ্ধারের দায় কি একা তোমার-ই? জয়া সেন কি একদিনও একা যেতে পারেন না?

মনোজ॥ জয়া সেন তো আর বক্তা নন। বক্তা আমি।

সবিতা॥ তবে উনি যে সব মিটিং-এ ধেই ধেই করে তোমার সঙ্গে যান, কেন জান? রূপ দেখাতে যান?

মনোজ॥ বলেছি তো, দেশপ্রেমের গান গেয়ে আসর আগুন করে তোলেন উনি। বক্তৃতার চেয়েও কাজ হয় তাতে বেশী।

সবিতা॥ এত বক্তৃতারই বা দরকার কি! চীন ভারত আক্রমণ করেছে। লড়াই করে চীনকে তাড়িয়ে দিতে হবে, দেশের লোককে এটাও আজ বক্তৃতা করে আর গান ক'রে বলে দিতে হবে নাকি? আমার অধিকারে যদি কেউ হাত দেয়, নাক গলায়, আমি তা সইবো না, এটা কাউকে শিখিয়ে দিতে হবে নাকি?

মনোজ॥ সহজ কথা কেমন সহজ করে বলো তুমি। তুমি কেন যাওনা আমাদের সঙ্গে মিটিং করতে!

সবিতা॥ কই, নাওনা তো আমায়।

মনোজ॥ ব্লাডপ্রেসারের রোগী তুমি। ডাক্তারের বারণ। বড় সহজেই তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়ো, আর তাতে বিপদ আছে। আমি দেখেছি সবাইকে তুমি সইতে পার না।

সবিতা॥ পারি না, তা পারি না। যেমন তোমরা সইতে পারছ না ঐ চীনকে।··· দুনিয়াটাই যেন আজ চীন। এগিয়ে আসছে, ধীরে ধীরে গ্রাস করছে···কে?

[দরজায় করাঘাত শুনিয়া সবিতা গিয়া দরজা খুলিল। প্রবেশ করিলেন ডাক্তার রায়]

সবিতা॥ নমস্কার ডাক্তার রায়।

ডাক্তার॥ নমস্কার। হঠাৎ জরুরী কল? ভালো আছেন তো?

সবিতা॥ ভালো আছি মানে সার্পাসিল খাইয়ে ব্লাডপ্রেসারটা নামিয়ে রেখেছেন, তাই দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু আপনার আজকের রোগী আমি নই, রোগী উনি।

ডাক্তার॥ প্রফেসর বোস! ঘুমুচ্ছেন নাকি?···কী হয়েছে?

সবিতা॥ না ঘুমোন্ নি। কাল রাত থেকে খুব অবসন্ন বোধ করছেন। মাথার যন্ত্রণায় কাল সারারাত ঘুমোতে পারেননি।

মনোজ॥ এখনো পারছি না ডাক্তার রায়। মাথার যন্ত্রণাতো রয়েছেই, তার ওপর এমন অবসন্ন বোধ করছি! আছে কি এমন কোন দাওয়াই যাতে চাঙ্গা করে তুলতে পারেন এখনি আমাকে?

ডাক্তার॥ কি আশ্চর্য! পথে দেখা হল শ্রীমতী জয়া সেনের সঙ্গে। তিনি বললেন আপনার অসুখ। ঠিক ঐ অনুরোধ তিনিও করলেন আমাকে।

সবিতা ॥ [স্বামীকে]···শুনলে ? ছিঃ ছিঃ ! কি নির্লজ্জ !

ডাক্তার ॥ শ্যামপুর না কোথায়, কি একটা মিটিং করতে যাবার কথা তাঁর সঙ্গে আজ আপনার।

সবিতা ॥ [দৃঢ় কণ্ঠে] এতবার বলেছি, উনি যাবেন না। যেতে আমি ওঁকে দেব না।

ডাক্তার ॥ না না, অসুস্থ শরীর নিয়ে—

মনোজ ॥ প্রতিরক্ষার তহবিলে টাকা তুলতে ঐ মিটিংটা ডেকেছি আমিই ডাক্তার। লোকজন সব অপেক্ষা করছে। এখনো যাবার সময় আছে, আপনি দয়া করে দেখুন তো—

সবিতা ॥ [উদ্‌ভ্রান্তের মতো] দেখুন ডাক্তার, দেখুন। ঘরে বাইরে আজ চীন—

[টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। সবিতা ছুটিয়া গিয়া টেলিফোন ধরিল। ডাক্তার মনোজকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন।]

সবিতা ॥ [ফোনে] হ্যাঁ, আমিই মিসেস্ বোস।···আপনি কে ?···শ্যামপুরের হেড-মাষ্টার ? কোত্থেকে বলছেন ?···জয়া সেনের বাড়ি থেকে ?···

[সঙ্গে সঙ্গে রিসিভারটি সজোরে রাখিয়া দিয়া ছুটিয়া আসিল ডাক্তারের কাছে—]

সবিতা ॥ চীন ভারত আক্রমণ করেনি, আক্রমণ করেছে আমার বাড়ি।···বলুন, কি বুঝছেন ?

ডাক্তার ॥ নাড়ীটা দুর্বল। ব্লাডপ্রেসারও বেশ 'লো'। কিন্তু ভয়ের কিছু নেই। কি হয়েছিল বলুন তো প্রফেসর বোস।

মনোজ ॥ কাল রাতে মিটিং সেরে বাড়ি ফিরতেই মাথা ধরলো। অসহ্য মাথা ধরা।

ডাক্তার ॥ অ্যাস্পিরিন বা ঐ জাতীয় কিছু খেয়েছিলেন ?

মনোজ ॥ হ্যাঁ, সবিতা দিয়েছিল।

ডাক্তার ॥ [সবিতাকে] কি দিয়েছিলেন ?

সবিতা ॥ হ্যাঁ, অ্যাস্পিরিনই দিয়েছিলাম।

ডাক্তার ॥ ক'টা বড়ি দিয়েছিলেন ?

সবিতা ॥ প্রথমে একটা, কমছে না দেখে পরে আর একটা, তারপর শেষ রাতে আরও একটা।

ডাক্তার ॥ [মনোজকে] তাতেও মাথার যন্ত্রণা কমলো না ?

মনোজ ॥ না, বরং যন্ত্রণা বেড়েই চললো। আশ্চর্য! তারপর ক্রমশঃ আমি যেন কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়তে লাগলাম।

ডাক্তার ॥ [সবিতাকে] কই, প্যাকেটটা দেখি—

সবিতা॥ প্যাকেটটা? [ড্রয়ারে দেখিয়া] প্যাকেটটা তো নেই। তিনটে পিলই ছিল—শেষ হতেই, কি জানি, হয়তো কোথাও ফেলে দিয়েছি।

ডাক্তার॥ অ্যাস্পিরিনই ঠিক দিয়েছিলেন তো?

সবিতা॥ [ম্লান হাস্যে] কেন, আপনার কি সন্দেহ হচ্ছে অ্যাস্পিরিন না দিয়ে আমি আর কিছু দিয়েছি?

ডাক্তার॥ ভুলও তো হতে পারে। আপনার এখানে ওষুধের তো ছড়াছড়ি! তিন তিনটে অ্যাস্পিরিনেও মাথা ধরা একটুও কমলো না, তাই সন্দেহটা হচ্ছে। আচ্ছা প্রফেসর বোস, অ্যাস্পিরিন তো আপনি আগেও খেয়েছেন। অ্যাস্পিরিন না খেয়ে আর কিছু খেলে আপনিও তো নিশ্চয় টের পেতেন সেটা—

মনোজ॥ কি জানি, মাথার অসহ্য যন্ত্রণায় আমার কোন জ্ঞান ছিল না তখন।

ডাক্তার॥ এখন?

মনোজ॥ মাথার যন্ত্রণা কিছুটা কমেছে, কিন্তু অবসন্নতা বেড়েছে।

ডাক্তার॥ আচ্ছা আমি ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তাই বলে আপনার মিটিং করতে যাওয়া আজ চলবে না—এও বলে যাচ্ছি।

[সবিতাকে] আপনি সার্পাসিল খেয়ে যাচ্ছেন তো?

সবিতা॥ হ্যাঁ, সার্পাসিলই আমাকে খাড়া করে রেখেছে।

ডাক্তার॥ তাই বলে আবার বেশী না খেয়ে বসেন। বেশী খেলে কিন্তু অবসাদ আনে ভীষণ। বলেছি তো আপনাকে। আচ্ছা, আসি। দরকার হলেই খবর দেবেন। নমস্কার।

[ডাক্তার চলিয়া গেলেন।]

মনোজ॥ তুমি আমাকে কাল রাতে অ্যাস্পিরিন দাওনি সবিতা।

সবিতা॥ সে কি! তার মানে?

মনোজ॥ তিন তিনটা অ্যাস্পিরিনের বড়ি খেলে মাথা ধরা কিছু না কিছু কম্‌তোই। বাড়্‌তো না। ... সবিতা—

সবিতা॥ বলো।

মনোজ॥ তুমি অ্যাস্পিরিন না দিয়ে আমাকে দিয়েছ সার্পাসিল। না—না, প্রতিবাদ ক'রো না। তোমার ইচ্ছে ছিল না জয়া সেনকে নিয়ে মিটিং করতে যাই আজ।

সবিতা॥ ... কিন্তু তাই ব'লে অ্যাস্পিরিন না দিয়ে তোমাকে সার্পাসিল দেব এতটা নীচ তুমি আমাকে ভাবছ!

মনোজ॥ যখন ওষুধ দিয়েছিলে তখন তুমি তোমাতে ছিলে না সবিতা। অবচেতন মন

কাজ ক'রে যাচ্ছিল, আর তা যাচ্ছিল তোমার বাহ্য চেতনার অজ্ঞাতে।

সবিতা॥ থামো তুমি। সইতে পারছি না আমি তোমার ঐ সব মনোবিজ্ঞানের পণ্ডিতিপনা। খুবই সত্যি, চাই না আমি তোমার সঙ্গে জয়া সেনের ঐ ঢলাঢলি। তোমার অসুখ হয়েছে, বেশ হয়েছে। বন্ধ হয়েছে মিটিং।

মনোজ॥ বটে!

সবিতা॥ হ্যাঁ। ব্লাডপ্রেসারের রোগী হয়ে আমি পড়ে থাকবো বিছানায়, আর তুমি দিন নেই, রাত নেই, বাইরে বাইরে মিটিং ক'রে বেড়াবে ঐ আগুন-মেয়ের সঙ্গে, এ আমি সইবো না।

মনোজ॥ আর তাই তুমি আমাকে দেবে বিষ! এতক্ষণ যে আমি বেঁচে আছি ভেবে অবাক হচ্ছি।

সবিতা॥ এতদিন যে আমি কি ক'রে বেঁচে আছি তা ভেবেও আমি অবাক হই। প্রথমে ভাবতাম জয়া সেন যাকেই জয় করুক না কেন, আমার স্বামী দুর্জয়। শেষে নেহেরুর মতো আমিও চমকে উঠলাম যেদিন তোমারি পকেটে পেলাম তার সঙ্গে তোলা তোমার একটা ফটো! বিশ্বাসঘাতক শুধু চীনই নয়—

মনোজ॥ মিটিং-এর সেই ফটোটা! ··· জয়া সেন যে এত বড়ো, তা জানতাম না।

সবিতা॥ সে আজ অত বড়ো বলেই আজ আমি এত ছোট।

মনোজ॥ তুমি যদি আমার চোখে ছোটই হবে তবে আজ আমি অনেক বড়ো হ'তে পারতাম সবিতা। হ'তে পারতাম কমিশনড্ মিলিটারি অফিসার। এপয়েন্টমেণ্ট লেটার এসে রয়েছে জানো। যাইনি শুধু তোমার জন্য, তোমার অসুখের জন্য।

সবিতা॥ [শ্লেষে] আমার অসুখের জন্য!

মনোজ॥ হ্যাঁ, তোমারি অসুখের জন্য। নইলে দেশের ডাকে প্রাণ দিতেই যেতাম আমি। অফিসারের পোষ্ট না পেলেও যেতাম। ছোটবেলা থেকেই আমি এন্. সি. সি.। ডাক এলে না বলা চলে না আমাদের।

সবিতা॥ গেলে না তবে আমার জন্য, না জয়া সেনের জন্য?

মনোজ॥ বটে! এতো করেও যখন তোমার ভুল আমি ভাঙতে পারলাম না সবিতা, আমিও তবে আর ভুল করব না। [ছুটিয়া গিয়া নিয়োগপত্রটি বাহির করিয়া] এই সেই এপয়েন্টমেণ্ট লেটার। এখনি টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিচ্ছি আমি চাকরি নেব।

সবিতা॥ দাও।

মনোজ ॥ কিন্তু তোমার কি হবে, তোমার কি হবে সবিতা ? আমি লড়াই-এ চলে গেলে তোমার অসুখে কে তোমাকে দেখবে ? আমার মতো ?

সবিতা ॥ সে বুঝব আমি।

মনোজ ॥ টাকা পয়সার অভাব হবে না, সে না হয় বুঝলাম, কিন্তু—

সবিতা ॥ মিটিং করার চেয়ে দেশের কাজ হবে তাতে অনেক বেশী।

মনোজ ॥ কিন্তু তুমি—

সবিতা ॥ আমি তাতে সেরেই উঠবো। তিলে তিলে এমনি করে সন্দেহের বিষে জ্বলে পুড়ে মরার চেয়ে, সেটা হবে আমার আনন্দের জীবন, স্বামীর গর্বে।

মনোজ ॥ সত্যি বল্‌ছ সবিতা ? কিন্তু—

সবিতা ॥ জয়া সেন এখনো তোমাকে টানছে। কি করে যাবে তুমি লড়াই-এ !

মনোজ ॥ আমি যাচ্ছি।

সবিতা ॥ যেতে হবে না তোমাকে। ডাক্তার বলে গেছেন ঘর ছেড়ে নড়বে না আজ। টেলিগ্রামটা লিখে দাও। আমিই পাঠিয়ে দিচ্ছি এখনি।

মনোজ ॥ বেশ।

[টেলিগ্রামটি লিখিতে বসিলে সবিতা ফোনে গিয়া একটি নাম্বার ডায়াল করিল।]

সবিতা ॥ [ফোনে] আমি জয়া সেনকে চাইছি। ও, আপনিই জয়া সেন! হ্যাঁ আমি সবিতা বোস। শুনুন, আমার স্বামীর অবসাদটা কেটে যাচ্ছে। এসে দেখুন।··· হ্যাঁ, যদি তিনি মিটিং করতে যেতে চান, আর আমার আপত্তি নেই। হ্যাঁ, ওঁর দুর্বলতাটা কেটে গেছে। কি বল্‌ছেন ? আসবেন না আপনি ? ও, রাগ হয়েছে ? বেশ। আজকের খবর জানেন তো ? চীন ভারতের পবিত্রভূমি থেকে সরে যাচ্ছে। হ্যাঁ—হ্যাঁ, খুব আনন্দের সংবাদ।···রাখছি।

[সবিতা রিসিভারটি রাখিয়া দিয়া স্বামীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। মনোজ লেখা-টেলিগ্রামটি তাঁহার হাতে দিল। টেলিগ্রামটি পড়িয়া দুই ব্যগ্র বাহুতে স্বামীকে বদ্ধ করিল সবিতা। আনন্দাশ্রুতে প্লাবিত হইল স্বামী-স্ত্রী।]

– য ব নি কা –

●

কৃত্রিম শব্দ

অমর ঘোষ

মঞ্চ-বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমে এবার যে নূতন বিষয়বস্তু সংযুক্ত হয়েছে, সেটি হচ্ছে 'কৃত্রিম শব্দের উৎপাদন ও প্রক্ষেপণ'। নাটকে উল্লিখিত ঘটনাবলীকে বাস্তবানুগ করে তোলার জন্য আমরা যে কয়টি আনুষঙ্গিক বিভাগের সাহায্য গ্রহণ করি, কৃত্রিম শব্দ তাদের অন্যতম। ঝড়, বৃষ্টি, ট্রেনের শব্দ, ছেলের কান্না, রকমারী ঘণ্টা, কলকব্জার আওয়াজ প্রভৃতি কয়েকটি বহু-ব্যবহৃত শব্দের রেকর্ড পাওয়া যায় বাজারে। এগুলিকে দক্ষ হাতে নিয়ন্ত্রিত করে এম্‌প্লিফায়ারের মাধ্যমে প্রক্ষেপণ করলে, ফল খুব খারাপ হয় না। তবে উৎসাহী মঞ্চশিল্পীর কাছে এই জাতীয় রেকর্ড করা শব্দভাণ্ডার প্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি কয়েকটি কারণে। প্রথম কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, শব্দগুলির স্বল্পকাল-স্থায়িত্ব। সাধারণতঃ একটি রেকর্ডের এক পিঠের সওয়া তিনমিনিট সময়কে তিন-চার রকমের শব্দের জন্য ভাগ করে দেওয়া থাকে। ফলে, শব্দ-প্রক্ষেপণকারীকে বার বার শব্দ-প্রক্ষেপণ থামিয়ে গ্রামোফোনের সাউণ্ড-বক্স ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয় শব্দ-রেখার সুরুতে। দ্বিতীয়তঃ, রেকর্ডগুলি সামান্য পুরাতন হলেই, শব্দের সঙ্গে একটা বিরক্তিকর ঘর্ষণের আওয়াজ বেরোয়, যা শব্দের সূক্ষ্ম কাজ নষ্ট করে ফেলে। তৃতীয়তঃ, রেকর্ড-করা শব্দ-ভাণ্ডারের দৈন্য। রকমারী নাটকের প্রয়োজনে যে অগণিত রকমের কৃত্রিম শব্দের প্রয়োজন দেখা দেয়, তার খুব কম অংশই পাওয়া যায় এই রেকর্ডগুলি থেকে।

সবচেয়ে বড় কারণ হলো অবশ্য মঞ্চশিল্পীর মানসিক পরিতৃপ্তি। ভাড়া করা পোষাক বা দৃশ্যপটের সাহায্য না নিয়ে, নিজেদের তৈরী (তা যেমনই হোক) পোষাক বা দৃশ্যপট ব্যবহার করায় যে আনন্দ, বাঁধা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করার তুলনায়, পাড়ায় নিজেদের হাতে বাঁশ পুতে মঁাচা বেঁধে অভিনয় করার মধ্যে আত্মাভিমান চরিতার্থ হওয়ার যে আনন্দ—রেকর্ড-করা শব্দভাণ্ডারের সহজলভ্য পন্থাটিকে এড়িয়ে যাওয়ার মধ্যেও উৎসাহী শিল্পী সেই জাতীয় পরিতৃপ্তি খুঁজে পান।

কৃত্রিম শব্দ-উৎপাদন সর্বাঙ্গীণভাবে একটি প্রয়োগমূলক বিদ্যা। লিখিত প্রবন্ধে

এর সম্যক্ রূপটি ফুটিয়ে তোলা কষ্টকর। তবু একটি সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকার মতো, নীচে কয়েকটি অতি আবশ্যকীয় শব্দ সৃষ্টি করার কৌশল দেওয়া হলো।

ঝড় :

নাটকের সবচেয়ে অধিক ব্যবহৃত কৌশল বোধহয় ঝড়ের ব্যবহার। সাধারণতঃ ছ'রকমের ঝড় ওঠে নাটকে—একরকমের ঝড় ওঠে প্রকৃতিতে, অন্যটি ওঠে মনে। দৃশ্যগত পার্থক্য এদের মধ্যে থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু শব্দগত দিক থেকে এদের রূপ অভিন্ন।

মঞ্চে কৃত্রিম ঝড়ের শব্দ সৃষ্টি করার যন্ত্রটি হলো, একটি ঘোরানোর ব্যবস্থাযুক্ত ড্রাম। এই ড্রামটির সমবর্তুল দিকটিতে থাকে সারি সারি কাঠের রেলিং। ড্রামের সমান প্রস্থ-বিশিষ্ট একটি উপযুক্ত দৈর্ঘ্যের ত্রিপল আড়াআড়িভাবে ড্রামটির উপরে ফেলে রেখে ড্রাম ঘোরালেই, ঝড়ের শব্দ সৃষ্টি হয়। ত্রিপলটির একদিক যন্ত্রের ভূমির সঙ্গে শক্তভাবে আট্‌কে, অন্যদিকে একটি কাঠের বাটাম লাগিয়ে দিলে কাজের সুবিধা হয়। কাঠের বাটামে চাপ দিয়ে, ঘোরানোর সময় শব্দের গভীরতার তারতম্য ঘটানো চলে।

বৃষ্টি :

ঝড়ের সঙ্গে অথবা পৃথক্‌ভাবে বৃষ্টির শব্দের ব্যবহার করা চলে। বৃষ্টির জল সাধারণতঃ টিনের চালা অথবা অনুরূপ কোনও শব্দ উৎপাদনকারী জমিতে আঘাত করলেই বৃষ্টিধারা শ্রুতিগোচর হয়। কৃত্রিম বৃষ্টির শব্দ সৃষ্টির সময়ও ঐ কথাটিকে মনে রাখা হয়েছে।

এক্ষেত্রেও ঝড়ের শব্দ সৃষ্টির যন্ত্রের মতো একটি ঘোরানো ড্রামের সাহায্য নেওয়া হয়। তবে ড্রামের দেয়ালটি থাকে ঢেউ খেলানো টিনের অথবা পাখীলাগানো সার্সির মতো পাতলা কাঠের স্তর দিয়ে তৈরী করা। এই ড্রামের মধ্যে কিছু তেঁতুলের বীজ, কাঁকর অথবা ঐ জাতীয় কিছু রেখে ড্রামটি ঘোরালে, বৃষ্টি পড়ার মতো শব্দ ওঠে।

বজ্রপাত :

শুধু বিদ্যুতের আনুষঙ্গিক শব্দ হিসাবেই নয়; অনেক ক্ষেত্রে চরম নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টির জন্যও বজ্রপাতের শব্দ কাজে লাগানো হয়। অন্যূন তিন ফুট লম্বা এবং আড়াই ফুট চওড়া একটি পাতলা লোহার পাত লম্বালম্বিভাবে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। পাতটির উপর নীচু ছুই মাথায় কাঠের বাটাম লাগিয়ে, নীচের বাটামে একটি হাতল লাগিয়ে দিলে কাজের সুবিধা হয়। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ঐ হাতল ধরে ঝুলন্ত পাতটিকে কাঁপালেই বজ্রপাতের অনুরূপ শব্দ উঠবে।

বন্দুক ও কামান :

ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রেই শুধু বন্দুকের ব্যবহার সীমাবদ্ধ নয়,—পিস্তল আকারে সামাজিক নাটকেও এই আগ্নেয়াস্ত্রের আমদানী চলে। আওয়াজের প্রয়োজন তাই সমানই আছে। যাদের সামর্থ্য ও সুবিধা আছে, তারা সত্যকার বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ করতে পারে। মঞ্চে একটি ·২২ ক্যালিবারের বন্দুক থেকেও যথেষ্ট জোর শব্দ পাওয়া যায়। ফাঁকা ড্রামের মধ্যে এই জাতীয় ফাঁকা আওয়াজ করলে, শব্দের গাম্ভীর্য আরও বেড়ে যায়।

সত্যকার বন্দুক কিন্তু সহজলভ্য নয়। বিকল্প ব্যবস্থা তাই জেনে রাখা ভালো। দেশলাই কাঠির বারুদের অংশ ভেঙে চাবির মধ্যে ঢুকিয়ে, তারপর সেটিকে পেরেকের আঘাতে জ্বালিয়ে চাবিকামান ফোটানোর খেলা ছোট ছোট ছেলেরাও জানে। এরই একটি উন্নততর পর্যায় গন্ধক ও মোমছাল ব্যবহার করা। একটি এক বা দেড় ফুট লম্বা লোহার কড়িতে [রেললাইনের টুক্‌রো প্রযোজ্য] সারবন্দী কয়েকটি বিভিন্ন ব্যাসের ছিদ্র করে রাখতে হবে। ছিদ্রগুলিতে উল্লিখিত বারুদ ভর্তি করে লোহার শলাকা দিয়ে আঘাত করার ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন ব্যাসের ছিদ্রে আওয়াজের তারতম্য ঘটে। আর, সারবন্দী ছিদ্রের ব্যবহারে, হঠাৎ একবার ব্যর্থ হলে, পরমুহূর্তেই দ্বিতীয় বা তৃতীয় ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া সহজ হয়।

কামানের শব্দ অবশ্য ঐতিহাসিক নাটকের সম্পত্তি। বড় ড্রামের গায়ে আঘাত করে কামানের কাছাকাছি শব্দ তোলা হয়। অবশ্য এই তোপ-ধ্বনি যে বহু দূরাগত, সেটুকু বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা যেন নাটকে থাকে।

ঝনাৎকার :

কাচের সার্সি ভেঙ্গে যাওয়া বা বাসনপত্র পড়ে যাওয়ার শব্দ সৃষ্টি করা হয়, বাক্সবন্দী ভাঙা কাচের টুক্‌রোর সাহায্যে। প্রয়োজনে ভাঙা কাচ ভর্তি বাক্সটি কিছুটা উঁচু থেকে নীচে ফেলে দেওয়াও চলতে পারে। বাক্সটি যেন অনুরূপ ব্যবহারের উপযুক্ত মজবুত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। যে কোনও কাচের দোকানে সামান্য দামে প্রচুর ভাঙা কাচ সংগ্রহ করা যাবে।

খুরধ্বনি :

নারিকেলের দুইটি আধখানা মালা দিয়ে হাতের কায়দায় এই শব্দ সৃষ্টি করা খুব সোজা। সামান্য অভ্যাসেই ঘোড়ার বিভিন্ন রকমের চলনের শব্দ উৎপাদন করা যায়। কাঠের পাটাতন, সিমেন্টের মেজে বা মেশনাইট বোর্ডের ব্যবহারে শব্দের চরিত্রগত পার্থক্য সৃষ্টিও সম্ভব হয়।

পদশব্দ :

সৈন্যবাহিনী বা পুলিসদের কুচ্‌কাওয়াজের শব্দ অথবা ধাবমান জনতার পদধ্বনি সৃষ্টি করার জন্য সুন্দর একটি ব্যবস্থা করা যায়। অনেকগুলি তিন-চার ইঞ্চি লম্বা কাঠের টুক্‌রার একপ্রান্তে ছিদ্র করে সেগুলিকে তারে গেঁথে নিতে হবে। তারপর একটি চৌকো কাঠের ফ্রেমের মাঝে অনুরূপ তারে গাঁথা কাঠের টুক্‌রোর কয়েকটি মালা বেঁধে দিতে হবে সমান্তর ভাবে। ফ্রেমটিকে ধরে ঝুলন্ত কাঠের টুক্‌রোগুলিকে সিমেন্টের মেজেয় বা কাঠের পাটাতনে তালে তালে ছোঁয়ালেই কুচ্‌কাওয়াজের শব্দ উঠবে। বেতালে এই আওয়াজই হয়ে উঠবে ধাবমান জনতার পদধ্বনি।

দরজা বন্ধ করার শব্দ :

রঙ্গপীঠে দেখা যাচ্ছে এমন একটি দরজা বা জানালার পাল্লা বন্ধ করার শব্দ শোনাতে হলে ঐ দরজা বা জানালাকে মঞ্চের অবশিষ্ট অংশ থেকে পৃথক্ করে গঠন করা দরকার। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই শব্দ আসে নেপথ্যের কোনও দরজা থেকে। একটি ভারী বাক্সের ডালা বন্ধ করে এই শব্দ উৎপাদন করা যায়। সম্ভবপর হলে ডালায় ল্যাচ্ (চাবি) লাগিয়ে রাখা যেতে পারে, দরজা বন্ধ করার শব্দকে আরও বাস্তবানুগ করে তোলার জন্য। অবশ্য, মঞ্চে হাতের কাছাকাছি কোনও দরজা থাকলে, সেটিকে ব্যবহার করাই সবচেয়ে প্রকৃষ্ট পন্থা।

দরজা খোলার শব্দ :

দরজা বন্ধ করার মতো দরজা খোলার সময় অবশ্য আচম্‌কা কোনও শব্দ হওয়ার কথা নয়। তবে মরচে-পড়া কব্জা-লাগানো পুরাতন দরজা আস্তে আস্তে খুললে এক ধরনের ক্যাচ্ ক্যাচ্ শব্দ হয়, যেটিকে আতঙ্ক সৃষ্টির কাজে লাগানো যেতে পারে।

এম্‌প্লিফায়ারের সাহায্য নিতে হবে এর জন্য। মাইকের সামনে শিশির মুখে ভিজে কর্ক এঁটে বন্ধ করতে গেলে, মরচে-পড়া কব্জার অনুরূপ শব্দ উঠবে। সেলোফেন কাগজ নিয়ে মাইকের সামনে আস্তে আস্তে মচ্‌কালেও ঐ জাতীয় ফল পাওয়া যায়। পাতলা তিনপিস্ বোর্ড ছোট ছোট কাঁটার সাহায্যে আর একটি অপেক্ষাকৃত শক্ত ফ্রেমে আট্‌কে রেখে, প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সেটিকে টেনে ছাড়াতে গেলেও অনুরূপ শব্দ ওঠে। পূর্বাহ্ণে পরীক্ষা করে ফলাফল যাচাই করে রাখা উচিত।

ঘণ্টাধ্বনি :

কাঁসর ঘণ্টা ছাড়াও আধুনিক নাটকে বহুবিধ ঘণ্টা বাজানোর দরকার পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, দরজার কলিং বেল, টেলিফোনের ঘণ্টা, দেয়াল

ঘড়ির বাজনা প্রভৃতি। ৬ ভোল্টের ব্যাটারী চালিত বেল্ ও বাজার এ বিষয়ে খুব প্রয়োজনীয়। রকমারী বেল্ ও বাজারের একটি বোর্ড শব্দ-প্রক্ষেপণকারীর হাতের কাছে প্রস্তুত রাখা খুবই দরকারী। ছোটদের খেলনা পিয়ানোর সাহায্যে ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি খুব বাস্তবানুগভাবেই সৃষ্টি করা যায়। বড় ঘড়ির চাইম্ শোনানোর জন্য এক ধরণের দম দেওয়া চাইম্ বাজনা পাওয়া যায়। এক জাতীয় লাইটারের সঙ্গে এই ধরণের চাইম্ বাজানোর ব্যবস্থা থাকে। এটিকে মাইকের সাহায্যে শোনাতে হবে।

হরবোলা :

নাট্যপ্রতিষ্ঠানে একজন অন্ততঃ হরবোলাকে অন্তর্ভুক্ত করে রাখায় অনেক সুবিধা হয়। পাখী, জন্তু-জানোয়ার প্রভৃতির ডাক এদের সাহায্য ছাড়া বাস্তবানুগরূপে সৃষ্টি করা খুবই শক্ত।

টেপরেকর্ডিং যন্ত্র :

যে কোনও নাটকের জন্য যেমন আবহসঙ্গীত টেপে রেকর্ড করে নিলে, বারম্বার প্রয়োগের ক্ষেত্রে খরচ কমে যায়, তেমনি কৃত্রিম শব্দগুলিকেও রেকর্ড-বদ্ধ করে নিলে, নাটক পরিবেশনের সময় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। তাছাড়া পূর্বাহ্নে টেপে রেকর্ড করার সুবিধাও অনেক। বারম্বার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে শ্রেষ্ঠ ফলাফলটুকু প্রক্ষেপণের জন্য তুলে রাখা সম্ভব হয়। আধুনিক নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে টেপরেকর্ডিং যন্ত্র ক্রমেই অপরিহার্য হয়ে উঠ্ছে।

থিওরি অব রিলেটিভিটি

পিনাকী রঞ্জন চক্রবর্ত্তী

নদীর ওপারের গাছ-গাছালি সবুজ। নদীবুক চিরে একটা বক পাখা মেলে চলেছে। নীল আকাশে একখণ্ড সাদা মেঘ। ঢেউ'র ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। বলছে কি জান,— বসে থেক না। ওঠ। এগিয়ে চল।

নদীতে জোয়ার।

তীরে এসে দাঁড়ালাম। আমি। অপরাজিত বসু। প্রাণোচ্ছল।

গাল দুটো আপেল-আভা।

আমার আশা, আমি পাখি হব, সূর্য হব, চাঁদ, আকাশ, মেঘ............

আমি শ', সেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ, শেলি, কীটস্, বায়রণ, মধুসূদন.........

জ্বলন্ত সূর্য নিভে গেল। গাছ-গাছালি সবুজ থেকে ধীরে ধীরে কালো হয়ে গেল। নদী জল নেমে গেছে, উদ্দামতা নেই। শান্ত। নিস্পন্দ।

সাদা মেঘ কালো হয়ে গেল।

(গল্পের খাতিরে নয়) বাবা আমার মারা গেল। যাবার বেলা হয়েছিল।

পাঁচ বছর পর।

আমার গাল দুটো ফ্যাকাশে। রক্ত নেই।

দুনিয়ার সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় হল।

জীবনের প্রাক্‌টিকাল নোটবুকে উঠল কতকগুলো শব্দ।

প্রথম : ষ্ট্রাগল্ ফর এগজিস্‌টেন্স

দ্বিতীয় : সারভাইভাল্ অব দি ফিটেষ্ট

তৃতীয় : এক্সপ্লয়টার্স এণ্ড এক্সপ্লয়টেড

চতুর্থ : বুর্জোয়া আর প্রলেটারিয়েট্

পঞ্চম : ইকনমিক লিবার্টি

ষষ্ঠ : শয়তান সাধু, সাধু শয়তান

সপ্তম : ভালবাসা

ছ' পাশের ঘাসবনের ভেতর দিয়ে সুরকির সড়ক এসে মিশেছে······না, ভুল। সুরকির সড়ক নেই। বাবার রেলওয়ে কোয়ার্টার্স মিছে। মুছে গেছে······।
পায়ে চলা পথ।
এঁকে বেঁকে চলেছে। যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে লেখা রয়েছে বড় বড় অক্ষরে ঃ

EMPIRE BONE MILL ; BANSBERIA

······ঢং করে ঘণ্টা বাজল। রাত দশটার। আমি অপরাজিত বসু খাকী হাফ প্যাণ্টের পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরালাম।

নাটকের উৎস-সন্ধানে ঃ ভারতবর্ষে

রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়

॥ এক ॥

গ্রীক নাটকের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে, তার মূল থেকে গেছে প্রাচীন মিশরে। ডায়োনিসাসের উৎসব, প্রাচীন মিশরেরই কৃষি-উৎসবের রূপান্তরিত রূপ, সেবিষয়ে কোন দ্বিধা নেই। মিশরে প্রথম নাটকের সন্ধান পাওয়া যায় খৃষ্টপূর্ব ৩২০০ অব্দে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রসঙ্গত এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন J. H. Breasted ; বলেছেন—There must eventually have been multitudes of such pilgrims at···that season, when in the earliest known drama, the incidents of the god's myth were dramatically re-enacted in what may properly be called a 'passion-play'. প্রকৃতপক্ষে এই নাটক থেকেই মিশরে, সেখান থেকে গ্রীসে,—গ্রীস থেকে সমগ্র য়ুরোপে নাটকের ধারা সম্প্রসারিত হয়েছে।

এর পাশাপাশি দূরপ্রাচ্যে আর একটি নাট্যধারা প্রকৃতির অনিবার্য আকর্ষণে পরিণত হ'তে থাকে—সেদিক থেকে ভারতবর্ষের ভূমিকা অন্যতম। প্রাচীন ভারতে নাট্যকলার বহু নিদর্শন উদ্ধার হয়েছে সত্যি, তবু এখনও তা বিশদ গবেষণার অপেক্ষা রাখে। সে বিষয়ে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত।

হিন্দুনাটকের প্রাচীনত্ব ও মূল অনুসন্ধান নিয়ে বহু আলোচনা ইতিমধ্যে হয়েছে। অনেকেই তার মৌল আবির্ভাবের ভূমি হিসেবে চতুর্বেদের অন্যতম ঋগ্বেদ ও সামবেদকে নির্দেশ করেছেন। পঞ্চম বেদ হিসেবে নাট্যবেদের জন্মের তথ্যটি স্বীকার করলে, এমন সিদ্ধান্ত করা খুব কঠিন নয়। নাট্যশাস্ত্রে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ভাষাকে নাটকের ভাষা বলতে গিয়ে উদাহরণ হিসেবে উর্বশী-পুরূরবা, যম-যমী, পনী-সরমা, ইন্দ্র-বরুণা, অনিরুদ্ধ-উষার কথোপকথনকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। তেমনি সামবেদের সামগান থেকে নাটকের জন্ম অতিসহজ বলে মন্তব্য করেছেন। দ্বৈতসংগীতের মধ্যে যে নাটকীয়ত্বের আভাস—ঋগ্বেদে অবশ্যই তার অবকাশ ছিল প্রচুর। মরুৎগণের প্রীতিবিধান করতে ইন্দ্র ও বরুণের ভূমিকা গ্রহণ করে গান ও

আবৃত্তি অনুষ্ঠিত হত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্কের সঙ্গে মৈত্রেয়ী ও গার্গীর কথোপকথন, কঠোপনিষদে যম ও নচিকেতা, শ্বেতকেতু ও পিতার মধ্যে কথাবার্তা হিন্দুনাটকের অপরিণত অবস্থা। সুতরাং তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন, ভারতীয় নাট্যকলা অন্ততঃপক্ষে খৃষ্টের জন্মের দু'হাজার বছর আগে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গহিসেবে উৎকর্ষ লাভ করেছিল। এঁদের এই মতের সমর্থনে Encyclopaedia Britannica-তে বলা হয়েছে—These hymns were combined with the dances in the festivals of the gods, which soon assumed a more or less conventional form. Thus from the union of dance and song, to which were afterwards added narrative recitation, and first sung then spoken dialogue, was gradually evolved the acted drama.

অনেকে মহাকাব্যের মধ্যে নাট্যসম্পর্কিত বিভিন্ন উল্লেখ দেখে নাটকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এ বিষয়ে A. B. Keith যে মন্তব্য করেন তা স্মরণীয়,—There is abundant evidence of the strong influence on the development of the drama exercised by the recitation of the epics. মহাকাব্যের সঙ্গে নাটকের সম্পর্ক-আলোচনার গতিপথে আমরা এ বিষয়ে আলোকসম্পাতের চেষ্টা করব।

প্রাচীন ভারতীয় নাটকের শিল্পরূপ প্রথম ভরতের নাট্যশাস্ত্রে, সাহিত্য ও প্রয়োগের দিক থেকে সূত্রানুসারী হয়েছে,—অন্ততঃপক্ষে আমরা সেখানেই তার পরিচয় পেয়েছি। নাটকের জন্ম নিশ্চয় তারও অনেক আগে। আমাদের আলোচনা সেই কাল-পটভূমি ও সমকালীন সমাজ নিয়ে। এ বিষয়ে এই অবসরে, আমরা সাধারণভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করছি। ভারতীয় নাটকের পেছনে কোন উৎসব ছিল কি না, থাকলে সে উৎসব কি গ্রীসের ডায়োনিসাসের উৎসবের মত কোন ধর্মীয় উৎসব? অথবা ধর্মনিরপেক্ষ কোন জাতীয় উৎসব-অনুষ্ঠানের অঙ্গহিসেবে তার জন্ম হয়? নাটকের সূত্রপাত হয় কখন—বেদের সমকালীন সমাজে, না আরও পরে? কিংবা নাটক কি আর্যদের আগে দ্রাবিড় বা অন্যান্য অন্-আর্য, বিশেষ করে প্রশান্ত-মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে (যাদের মূল বাসস্থান ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল) আগত আদি অষ্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর দান অথবা এদের মিশ্রিত সংস্কৃতির অমৃত ফল? সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে দুটি স্বচ্ছ প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হতে পারলে। প্রথম প্রশ্ন, ভারতীয় নাটক ধর্মসাপেক্ষ অথবা ধর্মনিরপেক্ষ এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন, নাটক আর্যেতর অথবা প্রাগার্য দিনের শিল্প? এর সুষ্ঠু উত্তর ভারতীয় নাটকের উৎস-সন্ধানে অনেকখানি ফলপ্রসূ হবে নিঃসন্দেহে। এ পর্যন্ত এ প্রশ্নে আমরা সাধারণভাবে যে তথ্যগুলোর

ওপর নির্ভর করি, তাদের মধ্যে অন্যতম, বেদের বন্দনাগীতি ও বিভিন্ন কথোপকথন এবং বেদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সমকালীন অন্যান্য সাহিত্য। এছাড়াও নাটক কতখানি ধর্মানুষ্ঠানজাত, কতখানি ধর্মনিরপেক্ষ অনুষ্ঠানের প্রভাব নির্ভর, তাও আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও, বিশেষতঃ গ্রীকদের পশ্চিম ভারতে অভিযানের কথা ভেবে বিদেশী প্রভাবের কথাও আলোচিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, প্রাকৃত সাহিত্য পর্যন্ত এ বিষয়ের অনুসন্ধান অব্যাহত।

॥ দুই ॥

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ সমস্যার আলোচনা করতে গেলে, প্রাচীন সভ্যতার ঊষাকালে মানুষ, তার সমাজ, বিশেষতঃ জীবনযাপনের উপায় ও প্রথাগুলো সম্বন্ধে কয়েকটি কথা স্বচ্ছ করে নেওয়া দরকার। মানুষের বেঁচে থাকার আদিম ও প্রাথমিক প্রয়োজন ছিল। নিজেকে ও প্রিয়জনকে বাঁচাতে প্রথম চাই খাদ্য আর চাই গোষ্ঠীগত লোকবল অর্থাৎ বহু সন্তান। সেই মানুষের অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ জীবনের মূল অবলম্বন ছিল ফসল—মাঠের এবং মনের—যাকে বলা চলে জীবন ও ধর্ম। তখনই আসে সমাজগড়ার প্রেরণা—শুরুও হয়েছিল মানসী পরিকল্পনার রূপমূর্তি খোঁজা। সে রূপের মধ্যে মানুষ মাঠে ঘাটে সমবেত হয়েছে—জীবন-সংগ্রামে প্রয়োজনের পথে কাব্য-সংগীত-নৃত্য এসে পড়েছে। মানুষের কর্মে উৎসাহ ও আবেগ এনে দিত এই নাচ-গান। প্রয়োজনের তাগিদ ও নন্দিত কর্মের শেষে প্রার্থনা ছিল মাঠভরা ফসল, ঘরভরা সন্তান। প্রকৃতির প্রেমপ্রীতি ভালোবাসার সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে ফেলেছিল ধীরে ধীরে। উর্বরতা তারা প্রার্থনা করেছিল মৃত্তিকাগর্ভে ও নারীগর্ভে সমভাবেই। নারীকে অভিসিঞ্চন করত পুরুষ আর পৃথিবীকে আকাশদেবতা সূর্য,—এই ছিল বিশ্বাস। সামাজিক যৌনতা এমনি করে ধার্মিক রূপ নিলে। ফলে দেখা গেল, মাঠের কাজে লিঙ্গকে দেবতার স্থানে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে—তারই সন্তোষবিধানের পালায় অনুকরণ চলেছে গর্ভধারণের। এ রূপ মানুষের মনে আদিম কবিতা—মাঠ-প্রকৃতি গর্ভধারণ করবেন শস্য-সন্তান উপহার দিতে। সেই উপলক্ষে সমাজের নারীও একই উদ্দেশ্যে মিলিত হয়েছে পুরুষের সঙ্গে মাঠে মাঠে, পরবর্তী যুগে বাসগৃহে। মিশরের ওসিরিস-আইসিস, সিরিয়ার তামুজ-ঈশ্‌তার, গ্রীসের ডায়োনিসাস-আফ্রোদিতে, ভারতের ভগবান-ভগবতী সেই কৃষিদম্পতির প্রতীক। 'ভগ' শব্দের দুটি অর্থ, জননাঙ্গ ও ঐশ্বর্য, যারা প্রজনন ও শস্যসম্পদের প্রতীক।

প্রজনন কৃষিদেবতা অর্চনার অন্যতম অঙ্গ। আদিম মানুষের কাছে তা নিছক যৌনপ্রবৃত্তি চরিতার্থতার উপায় ছিল না। জীবনে বাঁচবার জন্যে নিজেকে শক্তি-

শালী করে তোলার উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছিল। 'কর্ষণ ও প্রজনন ছিল একই সৃষ্টিতত্ত্বের দ্বিবিধ প্রকাশ ; উভয়ের শ্রীবৃদ্ধি কামনায় অভিন্নদেবতা-কৃত্য, কথা ও মন্ত্রের পরিকল্পনা, একের জন্যে অপরের অনুশীলন'। মা-নারী আর মা-মাটির গর্ভে দুটি ফসলের সম্ভাবনা-সন্তান মানুষ আর শস্য।

সমাজের প্রয়োজনে যে আচারের একদিন জন্ম হ'ল, তার সঙ্গে মনের মাধুরী মিশে তাকে সৌন্দর্য-মণ্ডিত করে তুলল। সেদিনই নিছক আচরণ শিল্পায়নের পথে পথিক হয়েছে। নৃতত্ত্ববিদেরা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছেন, নৃত্য-নাটক-সংগীত সবদেশেই উৎস-পর্বে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত। মানুষের জীবনের পাশেই তার ধর্ম। তাঁরা এ ব্যাপারে মেক্সিকো ও গ্রীসের ধর্মীয় উৎসবকে উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরেছেন নাটকের উৎস হিসেবে। অতএব নৃত্যগীত-সমৃদ্ধ ফসল-জন্ম-ক্রিয়ার অনুকরণ-বৃত্তি যা ক্রমে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়— তার থেকেই নাটকের জন্ম। ভারতেও এই ধারাটি কোন্ পথে বহমান তা লক্ষ্য করতে হবে।

কৃষিজীবী দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক্ মানুষদের সমাজগঠন ছিল মাতৃতান্ত্রিক। কৃষির ফসল ও উর্বরতার জন্যে ঋতুবদলের সঙ্গে সঙ্গে নাচগানের অনুষ্ঠান দিয়ে উৎসব পালন করত। সেই উৎসবে প্রাধান্য ছিল যাদুবিদ্যার। এর থেকেই তারা কৃষিদেবতার জন্ম দিয়েছিল—Those who lived on an agricultural basis, developed a belief in gods and demons of fertility, or in magic rites designed to secure rich harvests and to deter evil spirits. কৃষি নারীর আবিষ্কার— সন্তান ও শস্যের জন্ম দিত তারা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রাধান্য কমে গেল, পুরুষের গেল বেড়ে,—মহেন্-জো-দাড়োর যোগিমূর্তি সেই পুরুষ দেবতারই প্রতিরূপ।

যাযাবর আর্যরা ভারতে আসে খৃষ্টের জন্মের আড়াই হাজার বছর আগে। তারা ক্রমে ভারতের এই কৃষিসভ্যতাকে স্বীকার করে নিলে। তাদের ধর্মে পুরুষ দেবতার প্রাধান্য। বেদে এক ও অদ্বিতীয়ের ঘোষণা। তবু দেবতার পাশে দেবী এল। উষা, বিদ্যা দেবীরূপে স্থান পেলেন। অন্-আর্যের পশুপতি ও ঋগ্বেদের রুদ্র মিলে জন্ম দিলে—ভারতের নতুন কৃষিদেবতা—শিবের। সে অন্য ইতিহাস।

সূর্যই রুদ্র। ঋগ্বেদে তাঁরই আদি শাস্ত্রীয় রূপ। আর্যদের রুদ্র সংগ্রামের দেবতা—যাযাবরের উপাস্য, জীবনের সাংকেতিক রূপ। প্রাচীন পৃথিবীর সব দেবতাই রুদ্র দেবতা,—জীবন-সংগ্রামের সমকালীন প্রতীক। ঋগ্বেদে রুদ্র বজ্রী,—বায়ুর অধিপতি। তিনি সর্বদাই 'রোদন' করেন অর্থে গর্জন করেন। ব্যাবিলনের ঝড়ের দেবতা মেরোডাক বা মার্ডীক—তাঁর থেকেই মরুৎ নামের বিবর্তিত রূপ। মরুৎকে আমরা

বেদে পাই। আর্যরা রুদ্রদেবতার এই পরিকল্পনা সঙ্গে এনেছিলেন। যাযাবর রুদ্র ঝড়ের গতিতে আর গর্জনে (সংগীতে) উগ্র—অশান্ত সঞ্চরণে অক্লান্ত—সর্বদাই তিনি 'রৌতীতি নানদতি' নটরাজ। প্রাক্-আর্য দিনের ভারতে উপাস্যদেবতাও উগ্র-ভয়াল। তাঁদের উভয়ের মিলনে উন্নততর জীবন প্রতিষ্ঠার মধ্যে সেই রুদ্র-ভয়ংকর শিবসুন্দর কল্যাণকরের রূপ নিয়েছে।

যজুর্বেদে ভীষণ ও বিধ্বংসী শিবের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের উল্লেখ আছে। তার কাছে মানুষ ও পশু সংরক্ষণের জন্যে আবেদন করা হয়েছে। অনার্য শিব মানুষ ও পশুসংহারক। তার অন্যান্য পরিচিতি ব্যাধি-সংক্রামক, অসুর, প্রলয়ী, দুর্গম, ঈশান, বৃষভ (লিঙ্গের প্রতীক), কপর্দী, বনস্পতি ইত্যাদি নামে।

অথর্ববেদেও রুদ্রের ভয়ংকর রূপ ; ভূতপতি, পশুপতি, আকাশনক্ষত্র প্রভৃতি তার নিয়ন্ত্রণাধীন। মানুষ সন্তানবৃদ্ধির কামনা নিয়ে তার উপাসনা করে। গৃহ্যসূত্রে সে রুদ্র আরও ভয়ংকর। ব্রাহ্মণগ্রন্থে প্রথম তাকে আর্যীকরণ করে—বলা চলে শোধন করে শান্ত শিবে পরিণত করা হল। ধীরে ধীরে মিশ্রিত সমাজে সেই শিব সমস্ত দেবতার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে দেবাদিদেব হলেন। তাঁর প্রথম দিনের নৃত্যগীত অভিনয়ের আদিপুরুষ বলে তিনি হলেন নটরাজ। অন্য দেবদেবীরা সকলে নটনটী—তাদের পিতাস্বরূপ দেবাদিদেব নটগুরু। প্রসন্নতার পাশে রৌদ্রদীপ্ত ঝলক নিয়ে ভারতীয় নাটকের প্রথম ও প্রধান পুরুষ।

অতএব অনায়াসেই মনে করা যেতে পারে ভারতের নাট্যকলাও ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে জন্ম নিয়েছে অন্যান্য দেশের মতই। আনুমানিক, খৃষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দের সংকলন 'কাত্যায়ণ শ্রৌতসূত্র' থেকে জানা যায়, দু'রকম অনুষ্ঠান প্রযোজনা করা হত। নৃত্যগীত ও যন্ত্রসংগীত প্রযোজনা করা হত, 'পিতৃমেধ' এবং শুধুমাত্র নৃত্যের বিধান ছিল সত্ত্রায়ণ ও অতিরাত্র যজ্ঞের ক্ষেত্রে। হিন্দু নাটকেও নৃত্য, সংগীত ও যন্ত্রসংগীত অপরিহার্য ছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ আছে ; কারণ—The gods are never so pleased on being worshipped with scents and garlands, as they are delighted with the performance of dramas. The man who properly attends the performance of music or dramas will (after his death) attain the happy and meritorious path in the company of the Brahmanic Sages. [NATYA SASTRA (XXXVI, 81-82) : Asiatic Society.]

(ক্রমশঃ)

প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ গ্রন্থাগার

দীপককুমার বড়ুয়া

শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির তীর্থভূমি ভারতে স্মরণাতীত কাল থেকেই প্রচেষ্টা চলছে জ্ঞানভাণ্ডারকে যথাযথভাবে সুসংবদ্ধ ও সুরক্ষিত করার। কিন্তু প্রাচীনকালে জ্ঞানতপস্বী ভারতীয় ঋষিদের অমূল্য বাণীগুলির সংরক্ষণের প্রশ্ন তেমন প্রবল আকার ধারণ করেনি। কারণ লিখন-পদ্ধতির অপ্রচলনের দরুন কোন পুস্তক সে সময়ে ছিল না। কিন্তু যখনই লিখন-পদ্ধতির প্রচলন হলো এবং পুস্তক সম্বন্ধে ভারতীয়দের ধারণা ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হতে লাগলো, তখনই জ্ঞানভাণ্ডার সংগঠন, সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণের সমস্যাগুলি একে একে দেখা দিতে লাগলো।

যে সময় লিখন-রীতির আবির্ভাব হয়নি, সে সময় পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলি শিষ্যপরম্পরা মুখে মুখে প্রচারিত ছিল। ঋগ্বেদের যুগে সমস্ত শিক্ষাই মুখে মুখে দেওয়া হতো।[১] তখন গুরু শিষ্যকে আবশ্যকীয় গ্রন্থগুলি ক্রমাগত আবৃত্তির দ্বারা মুখস্থ করতে সাহায্য করতেন। সেই জন্যই তখনকার সাহিত্যকে "শ্রুতি" বলা হতো।[২] অনেকে মনে করেন যে বৈদিক ভারতীয়দের কাছে লিখন-রীতি সুপরিচিত ছিল।[৩] কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রমাণের অভাবে এই বিষয়ে পণ্ডিতগণ এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন নি। মনে করা যেতে পারে যে লিখন-পদ্ধতির যদিও প্রচলন ছিল, তবুও এটা তখনকার দিনে ভারতীয় শিক্ষায় নগণ্য স্থান অধিকার করেছিল।[৪] বস্তুত বৈদিক যুগে এবং তার কিছু পরেও পুস্তকের অবস্থিতি ছিল কোন "গ্রন্থাগারে" নয়, বিশিষ্ট পণ্ডিত ও ছাত্রদের "কণ্ঠে"।[৫] তখন এই সব জ্ঞানপিপাসুরাই ছিলেন জীবন্ত ও "মৌখিক" গ্রন্থাগার। তাঁরা শুধুমাত্র বই কণ্ঠস্থ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, উপরন্তু এক একটি বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা, শিক্ষা সম্বন্ধে মতবাদ এবং বিভিন্ন পুস্তকের চাঞ্চল্যকর সংবাদও পরিবেশন করতেন। এইভাবেই বর্তমানে আমাদের হাতে পৌঁছেছে বেদ, ত্রিপিটক এবং অঙ্গগ্রন্থ-

---

১ The Vedic Age, ed. R.C. Mazumdar, pp. 391—392.

২ Mookerji, R.K. Ancient Indian Education, p. 27.

৩ Bulletin of the Deccan College Research Institute, iv, (Apte, V.M. The spoken words in Sanskrit literature)

৪ The Vedic Age, ed. R.C. Mazumdar, p. 455.

৫ Altekar, A.S. Education in ancient India, p. 159.

গুলি—যা' মানব-জ্ঞান-ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ। বস্তুত তখনকার দিনে সেই সব জ্ঞানীদের স্মৃতিই হয়েছিল বর্তমান গ্রন্থাগারগুলির পরিবর্তে সাহিত্য ও দর্শনের ভাণ্ডার।[১] কিন্তু লিখন-পদ্ধতির সুপ্রচলনের সাথে সাথে পুঁথি সংরক্ষণের প্রশ্ন তীব্র আকার ধারণ করে।

পালি শব্দ "পিটক"-এর সাথে ভারতীয় গ্রন্থাগারের উৎপত্তির এক অতি সূক্ষ্ম যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। "পিটক" শব্দের অর্থ "ঝুড়ি" বা "আধার"।[২] বৌদ্ধ হীনযানীয় ধর্মসাহিত্য তিনটি পিটকে বিভক্ত, যথা—বিনয়, সুত্ত ও অভিধম্ম। ব্যবহারিক সুবিধার জন্য প্রাচীনকালে এই পালি ধর্মগ্রন্থ অথবা ভগবান বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণীগুলিকে তিনটি পিটক বা ঝুড়ির মধ্যে রাখা হতো। কালক্রমে যখন এই ঝুড়ি-প্রথার বিলোপ হয়, তখন কেবলমাত্র "পিটক" শব্দটিই থেকে যায়। অধ্যাপক Winternitz-ও মনে করেন যে পিটক বলতে বোঝায় একটা আধার যেখানে রক্ষিত ছিল বৌদ্ধহীনযানীয় গ্রন্থাবলী।[৩] শ্রদ্ধেয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও মনে করেন যে 'পিটক' ডিম্বাকৃতি একটি বেতের ঝুড়ি যা'র উপর পিরামিড্-সদৃশ আচ্ছাদন ছিল।[৪] সুতরাং এইদিক থেকে পালি শব্দ "পিটক" অর্থাৎ ঝুড়ি ভারতে গ্রন্থাগারের উৎপত্তির ক্ষীণতম ইঙ্গিত বহন করছে। সেই প্রাচীনযুগে যখন গ্রন্থাগার বর্তমানের রূপে আবির্ভূত হয় নি, তখন এই পিটকগুলিই ছিল গ্রন্থাগারের এক একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। গ্রন্থাগারের সাথে "পিটক" শব্দটির আরো একটি যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। ব্রহ্মদেশে ইরাবতী নদীর দক্ষিণতীরে প্রাচীন নগরী প্যাগানে একটি মনোরম প্যাগোডা বা বৌদ্ধমন্দির আছে। এই প্যাগোডা "পিটকত্তই প্যাগোডা" নামে সুপরিচিত। এর দ্বিতল অট্টালিকায় একটি মহামূল্য গ্রন্থাগার এখনও আছে। সুতরাং এই সব আলোচনার পর অনুমান করা বোধ হয় খুব অসঙ্গত হবে না যে, "পিটক" শব্দটি যদিও মূলগত অর্থে 'আধার' বোঝায়, তবুও এটাই এককালে গ্রন্থাগার স্থাপনের একটি পরিকল্পনার জন্মদান করেছিল।

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচনা করলে দেখতে পাবো যে এদেশে লেখার প্রচলন হয় মোটামুটি খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে। এর পরই পুস্তকের আবির্ভাব হয়।[৫] এবং কালক্রমে সংঘারাম ও মন্দিরগুলিই পুস্তকভাণ্ডারে পরিণত হয়। লিখন-পদ্ধতির সূচনার সঙ্গে সঙ্গে দেবমন্দির ধীরে ধীরে জ্ঞানমন্দিরে

---

[১] Macdonell, A.A. India's Past, p. 53.
[২] Law, B.C. History of Pali Literature, i, p. 43.
[৩] Winternitz. History of Indian Literature, ii, p. 8.
[৪] Law, B. C. Buddhistic Studies, p. 846.
[৫] 2,500 years of Buddhism, ed. by P. V. Bapat, p. 182.

পরিণত হলো। একই ঘটনা ঘটেছিল মিশর, ক্রীট্, মেসোপটেমিয়া, অ্যাসিরীয়া, গ্রীস, রোম প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যান্য পীঠস্থানগুলিতে। এটা আজ দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যেতে পারে যে বৌদ্ধরাই সর্বপ্রথম ভারতে সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গ্রন্থাগার স্থাপিত ও পরিচালিত করেছিলেন। বৌদ্ধদের সহৃদয়তায় ও উদার দানে বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁদের দ্বারা স্থাপিত এইসব বিশ্ববিদ্যালয় ও সংঘারাম-গ্রন্থাগারগুলির অলঙ্করণেরও ব্যবস্থা হয়েছিল।[১] যে সব মৌলিক গ্রন্থে এগুলি সম্বন্ধে জানা যায়, তা সব বিদেশী পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত। ভারতীয় লেখকরা এই বিষয়ে বিশেষ কিছুই বলেন নি। কিন্তু ফা-হিয়েন (৩৯৯-৪১৪ খৃঃ), সুঙ্-যুঙ্ (৬০০ খৃঃ), হিয়েন সাঙ্ (৬২৯-৬৪৫ খৃঃ), ইৎ-সিঙ্ (৬৭৩ খৃঃ) এবং ও-কুঙ্ (৮০০ খৃঃ) প্রভৃতি চৈনিক তথ্যান্বেষী ও শিক্ষাব্রতী পর্যটকদের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণে এবং প্রাচীন সাহিত্যের অংশবিশেষে আমরা বৌদ্ধগ্রন্থাগারগুলির যে মূল্যবান বিবরণ পাই, তা'র দ্বারা অনায়াসেই প্রমাণ করা যেতে পারে যে প্রাচীনভারতে গ্রন্থাগার উন্নতির এক বিশিষ্ট সোপানে আরোহণ করেছিল। প্রাচীন ভারতের অনেক গ্রন্থাগারই তখনকার নিনেভার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারের চেয়েও ধনী ও সুসজ্জিত ছিল। তবে এটা ঠিক যে বর্তমান যুগে পাব্লিক বা সাধারণ গ্রন্থাগার বলতে যা' বোঝায় সেসময়ে ভারতে তা'র একান্ত অভাব ছিল। কারণ প্রায় সব গ্রন্থাগারই গড়ে উঠেছিল সংঘারামে, মন্দিরে অথবা কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। আজ নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে খৃষ্টীয় প্রথম শতকে বৌদ্ধদের হাতেই ভারতে সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং গ্রন্থাগার-স্থাপনের এই ঢেউ বয়ে চলেছিল ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত। এই কয়েক শতাব্দীতে গ্রন্থাগারগুলি ভারতের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেছে। এই বৌদ্ধ গ্রন্থাগারগুলিই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের কাছে দ্বার উন্মুক্ত করে জনসাধারণের শিক্ষার সম্ভাবনাকে উজ্জ্বলতর করেছিল।

সময়ের দিক থেকে তক্ষশীলার সুবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটি প্রাচীনত্বের দাবী করতে পারে। আধুনিক পশ্চিম পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডির বারো মাইল উত্তর-পশ্চিমে ছিল প্রাচীন তক্ষশীলা।[২] এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নততর পদ্ধতিতে চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হতো। তাই সম্ভবত এখানকার গ্রন্থাগারটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থে সুসজ্জিত ছিল। খৃষ্টীয় ২৫০ থেকে ৮০০ শতক পর্যন্ত

[১] Mazumdar, R. C. & Altekar, A. S. The Vakataka Gupta-Age, p. 398.
[২] Cunningham, A. Ancient Geography of India, p. 681.

এই বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্ষম ছিল। জানা যায় যে আরব নরপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় এখানকার চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অনেক গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হয়েছিল।[১] এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটি সম্বন্ধে অল্প বিবরণই পাওয়া যায়। তবে বৌদ্ধগ্রন্থে এর উল্লেখ থাকায় মনে হয় যে বৌদ্ধযুগেও এই বিশ্ববিদ্যালয়টি সজীব ছিল।[২] এই বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারটি পুরোপুরি বৌদ্ধ না হলেও প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাগার তথা শিক্ষার ইতিহাসে এর এক বিশিষ্ট স্থান আছে।

বর্তমান মধ্যপ্রদেশের বেরারে অবস্থিত ছিল প্রাচীন দক্ষিণ কোশল।[৩] বৌদ্ধ-ধর্মের বেশ প্রভাব ছিল এখানে। এই অঞ্চলে প্রায় একশ'টি সংঘারাম নির্মিত হয়েছিল। অবশ্য এইসব সংঘারামে মহাযানীয় ভিক্ষু ও শ্রমণরাই বাস করতেন। তবে এই স্থান কালক্রমে সুপ্রসিদ্ধ হয়েছিল প্রখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক ও পণ্ডিত নাগার্জ্জুনের বাসস্থান হিসেবে। নাগার্জ্জুনের সম্মানার্থে এখানকার রাজা পাহাড় খোদাই করে একটি পঞ্চতল-বিশিষ্ট সংঘারাম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই সংঘারামটি চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের নিকট "পারাবত"-সংঘারাম নামে পরিচিত। সংঘারামটিতে আচ্ছাদনযুক্ত বিচরণপথ ছিল এবং এর উচ্চতম কক্ষে ছিল গ্রন্থাগার, আর নিম্নতম স্থানে থাকতেন সংঘারামের সাথে জড়িত উপাসক-উপাসিকারা। কিন্তু মাঝের তিনটি তল ভিক্ষুদের আবাসস্থল ছিল।[৪] এই সংঘারামটি সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় শতকের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল এবং এর স্থান চিহ্নিত করা যেতে পারে বর্তমান শ্রীশৈলম্-এর সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু-মন্দির অঞ্চলে।[৫] সুতরাং এর দ্বারা মনে করা যেতে পারে যে প্রাচীনযুগে দক্ষিণ কোশল-অঞ্চলে গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব ছিল।

চৈনিক পর্যটক হিয়েন-সাঙ্ লিখেছেন যে কুষাণ-সম্রাট কনিষ্ক (৭৮-১০১ খৃঃ) রক্তবর্ণ তাম্রফলকে[৬] বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলি খোদিত করিয়েছিলেন। পরে ঐ তাম্রফলকগুলি প্রস্তরনিমিত আধারে আবদ্ধ করে একটি স্তূপের ভিতর রেখেছিলেন।[৭] কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে সে রকম কোন স্তূপ পাওয়া যায় নি। তবুও

[১] Keay, F.E. Indian Education in ancient and later times, pp. 65—66.

[২] Jataka, ed. by Fousboll, i, pp. 356, 436, 505. ii, p. 277 ; iii, p. 122 ; iv, p. 237 ; v, pp, 127, 210 ;

[৩] Cunningham, A. Ancient Geography of India, p. 595.

[৪] Watters. On Yuan Chwang, i, p. 201.

[৫] Mookerji, R.K. Ancient Indian Education, p. 519.

[৬] Beal. Buddhist Records of the Western World, i, p. xx.

[৭] 2,500 years of Buddhism, ed. by P. V. Bapat, p. 201.

এই ঘটনা আমাদের পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয় যে সেই সময়ে ভারতীয়রা গ্রন্থাগার সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন।

হিয়েন-সাঙ্-ই বংস বা বৎসজাতির রাজধানী কৌশম্বীতে একটি সুসজ্জিত গ্রন্থাগার দেখতে পেয়েছিলেন। আধুনিক এলাহাবাদ থেকে ত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে যমুনা নদীর উপরে কোসম ছিল প্রাচীন কৌশম্বীর স্থান।[১] এইখানে ঘোষিতা-রামের দক্ষিণ-পূর্বে একটি দ্বিতল অট্টালিকার ইষ্টক-নির্মিত কক্ষে থাকতেন প্রখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক বসুবন্ধু। তিনি হীনযানীয় বৌদ্ধসম্প্রদায় ও অবৌদ্ধদের মত খণ্ডন করে এখানে রচনা করেছিলেন তাঁর অমর কীর্তি "বিদ্যামাত্রসিদ্ধিশাস্ত্র"। ঘোষিতারামের পূর্বদিকে একটি আম্রকাননে আর একটি অট্টালিকায় থাকাকালীন বৌদ্ধদার্শনিক অসঙ্গ লিখেছিলেন তাঁর সুপ্রসিদ্ধ "বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধিশাস্ত্র"।[২] সুতরাং এর দ্বারা অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে কৌশম্বীতে শিক্ষক ও ছাত্রদের ক্রমাগত চাহিদা মেটানোর জন্য গ্রন্থাগার থাকা মোটেই বিচিত্র নয়।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বিখ্যাত জেতবন সংঘারামে ফা-হিয়েন একটি বিরাট গ্রন্থাগার দেখতে পেয়েছিলেন। এই জেতবন অবস্থিত ছিল উত্তরপ্রদেশে শ্রাবস্তীর এক মাইল দক্ষিণে আধুনিক সাহেথ-মাহেথ নামক স্থানে। ফা-হিয়েনের বিবরণে জানা যায় যে এই সংঘারামে ধর্মদেশনার জন্য কক্ষ, ধ্যানের জন্য প্রকোষ্ঠ, আহার-কক্ষ, স্নান-গৃহ, আরোগ্য নিকেতন, গ্রন্থাগার ও পাঠগৃহ ছিল। এখানকার গ্রন্থাগার-গুলি শুধুমাত্র থেরবাদ বৌদ্ধধর্মবিষয়ক পুস্তকে অলঙ্কৃত ছিল না, উপরন্তু এখানে ছিল বৈদিক, অবৌদ্ধ, শিল্প ও বিজ্ঞান-সম্পর্কিত অনেক গ্রন্থ ও পুস্তিকা। জেতবন সংঘারামের শান্ত ও মনোরম পরিবেশে গ্রন্থাগারগুলি অবস্থিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এই সংঘারাম ও গ্রন্থাগারগুলি কালের নিষ্ঠুর আক্রমণ থেকে রেহাই পায় নি। তাই সপ্তম শতাব্দীতে হিয়েন-সাঙ্ যখন এখানে এলেন, তখন শুধুমাত্র ধ্বংসাবশেষই তিনি দেখতে পেলেন।

তাম্রলিপ্তিতে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মেদিনীপুর জেলায় তম্‌লুকে ফা-হিয়েন পঞ্চম শতাব্দীতে প্রায় চব্বিশটি বৌদ্ধ সংঘারাম দেখতে পেয়েছিলেন।[৩] এখানে তিনি শাস্ত্র অনুলেখনে এবং মূর্তি চিত্রণে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়েছিলেন।[৪] মনে হয় এখানে

---

১ Law, B. C. Historical Geography of Ancient India, p. 100.

২ Ghosh, N. N. An Early History of Kausambi, pp. 75-76.

৩ Cunningham, A. Ancient Geography of India, p. 732.

৪ Giles. The Travels of Fa-hsien, p. 66.

একটি সুন্দর ও উন্নতধরনের গ্রন্থাগার ছিল। নতুবা তাঁর মতো একজন বিদেশী গবেষক-ছাত্রের পক্ষে হাতের কাছে অতগুলি পুস্তক সংগ্রহ করা কঠিন ছিল।

বিজনোরের আট মাইল উত্তরে এবং হরিদ্বারের ত্রিশ মাইল দক্ষিণে বর্তমান মুনডোর-এ ছিল প্রাচীন মতিপুরের প্রায় দশটি বৌদ্ধ সংঘারাম।[১] হিয়েন-সাঙের "জীবনী"-তে দেখা যায়, এই চৈনিক পরিব্রাজক গুণপ্রভের লেখা অমর কীর্তি "তত্ত্বসন্দেশ-শাস্ত্র" পুস্তকখানি মতিপুর-সংঘারামের গ্রন্থাগারে দেখতে পেয়েছিলেন। তাই মনে হয় যে সপ্তম শতাব্দীতে মতিপুরে একটি গ্রন্থাগার ছিল।[২]

প্রাচীন বৈশালীর শ্বেতপুর সংঘারামের গ্রন্থাগারে হিয়েন-সাঙ্ দেখতে পেয়েছিলেন "বোধিসত্ত্বপিটক" নামে একটি মহাযানী পুস্তক।[৩] পুরাতত্ত্ববিদ্ কানিংহাম-এর মতে এই সংঘারামটি অবস্থিত ছিল মুজাফ্ফারপুর জেলার বর্তমান বসার গ্রামের কাছাকাছি।[৪] মহাযানী বৌদ্ধগ্রন্থের এক মূল্যবান সংগ্রহ ছিল এই শ্বেতপুর গ্রন্থাগারে। কাজেই বিশেষ একটি বিষয়ে এই গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংগ্রহ কেন্দ্রীভূত ছিল বলা যেতে পারে।

[পরবর্তী সংখ্যায় সমাপ্য]

১ De, N. L. Geographical Dictionary of ancient and mediaeval India, p. 128.

২ Granthagar (Bengali quarterly), no I, 1958. p. 7

৩ Watters. On Yuan Chwang, ii, p. 80

৪ Report of the Archaeological Survey of India, i, pp. 55-56 ; xvi, p. 6.

কথাকলি নৃত্য

হীরা দেবরায়

মানুষের মুখে তখনও ভাষা ফোটেনি, নিজের আবেদন আকিঞ্চন জানাতে মানুষ শিখেছে ইঙ্গিত, জেনেছে ছন্দ। তরুলতার পল্লবে সে পেয়েছে রূপভঙ্গিমা, নদীর তরঙ্গ-হিল্লোলে সে দেখেছে লীলা, উড়ন্ত পাখীর ডানায় সে পেয়েছে তাল ও লয়।

সেই সুদূর অতীতের কোন এক কল্যাণময় মুহূর্তে মানুষ কাজে লাগায় হস্ত, পদ, চক্ষু, কণ্ঠ, মস্তক, কোটি ও অধরকে। অজান্তে কখন যে ছন্দোময় মুদ্রা মানুষের সারাদেহে আধিপত্য বিস্তার করল মানুষ সে কথা আজ ভুলে গেছে। কিন্তু ইতিহাস সে কথা ভোলেনি। আজও সেই একই পুরাতনী ধারা মানব সভ্যতার বহুস্তর, বহু তোরণ পার হয়ে আমাদের নিয়ে চলেছে শিল্পসাধনার চরম ও পরম স্বর্গে।

অন্তর যে কথা কয়। তারই সুর যখন ছন্দোময় অনুহিল্লোলে রূপায়িত হয়ে ওঠে, তখনই সৃষ্টি হয় কথাকলি নৃত্যের।

মানুষের মনের কথা, নানা অনুভূতি মুদ্রার মাধ্যমে ফুটে ওঠে এই নৃত্যের তালে। এই মুদ্রাই হল কথাকলি নৃত্যের প্রধান অঙ্গ। হস্তমুদ্রার গভীর জ্ঞান না থাকলে কথাকলি নৃত্য নিষ্ফল হয়। তার উন্মাদনা-শক্তি নির্ভর করে সুচারু হস্তমুদ্রা বিন্যাসে।

এই "কথাকলি" কথাটির একটি অন্তর্নিহিত অর্থ আছে। কথা মানে—কাহিনী, কলি মানে—অভিনয়। অর্থাৎ কোন কাহিনী বা Story-সমন্বিত যে নৃত্যাভিনয় তাকেই 'কথাকলি' নৃত্য বলা হয়। রামায়ণ, মহাভারত ও কোন রাজার কাহিনীকে অবলম্বন করে এই কথাকলি নৃত্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

হাব ভাব, হস্তমুদ্রা ও সুচারু অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতির অভিনয়ের দ্বারা কাহিনীর উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়, আনন্দ-বিষাদ প্রভৃতি ফুটিয়ে তোলাই কথাকলি নৃত্য-শিল্পীর শ্রেষ্ঠ সাধনা। এই নৃত্যে ২৪টি মুদ্রার প্রয়োগ দেখা যায়। এত বেশি মুদ্রা আর কোন নৃত্যেই দেখা যায় না। তাছাড়া চঞ্চল অপাঙ্গদৃষ্টি, অধরকুঞ্চন-প্রসারণ, ভ্রু-বিলাস ও হাস্যরেখাঙ্কিত মুখ প্রভৃতি কথাকলি নৃত্যের মধ্যেই বিশেষ ভাবে দেখা যায়। এই কথাকলি নৃত্য দক্ষিণ ভারতের কেরেলায় প্রথম প্রচলিত হয়। ইহা কেরেলার একটি সুপ্রাচীন নৃত্যকলা। কেরেলার মহারাজা "বীর কেরেলা বর্ম্মা" এই নৃত্যের প্রথম প্রচলন করেন। সে সময় হতেই কথাকলি নৃত্যাভিনয় করার নানারকম নিয়ম চলে আসছে।

কথাকলি নৃত্য অনুষ্ঠিত হবার সংরক্ষিত স্থানে প্রথমে একটী বড় পিতলের প্রদীপ জ্বালান হ'ত এবং ছোট ছোট পাত্রে তেল দিয়ে তাতে সল্‌তে দিয়ে চারিদিক আলোকিত করা হ'ত। ছ'জন লোক ছ'দিক হতে একখণ্ড কাপড় উঁচু করে ধরে রাখত রঙ্গমঞ্চের সম্মুখস্থ পর্দার মত। এ পর্দাকে বলা হ'ত "তেরুশীলা"। আড়ালে "তোডায়ম" নামক নাচটী করা হত। ইহা নির্দিষ্ট নৃত্য। এই নৃত্যের সাহায্যে সেদিনের অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করা হয়। অর্থাৎ নৃত্যের স্থানকে পূজা করা হয়। অভিনয়কালে কবি সংস্কৃত ভাষায় চেঁচিয়ে গান করেন। নর্তক সেই অনুযায়ী মুদ্রা ও অঙ্গভঙ্গীতে কথার অর্থ ও ভাবধারা প্রকাশিত করে। এ নৃত্যানুষ্ঠান সাধারণতঃ রাত্রি নয়টার পর আরম্ভ হ'ত আর সমস্ত রাত্রি ধরে অনুষ্ঠান চলত।

কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের মনোভাবের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের চিন্তাধারা ও রুচির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কথাকলি নৃত্যের প্রাচীন নিয়মাবলীর অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে কথাকলি রঙ্গমঞ্চের মধ্যে শিল্পীমনের চিন্তাধারার নানা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পূর্বে যে রঙ্গমঞ্চে প্রদীপের সাহায্যে কথাকলি নৃত্যাভিনয় হত, আজ সেখানে নানারকম যান্ত্রিক সাহায্য নেয়া হয় এবং নানা কারুকার্যে শিল্পীরা রঙ্গমঞ্চের সৌন্দর্য বর্ধন করেন। কেবলমাত্র রঙ্গমঞ্চই নয়, নৃত্যধারারও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

বর্তমানে ভারতের শ্রেষ্ঠ নর্তকীরা কথাকলি নৃত্যের মূল ধারাটুকু অব্যাহত রেখে নানা পুষ্প-পল্লবে একে সজ্জিত করেছেন। বড় বড় নৃত্যগুরুরা কথাকলি নৃত্যকে নানা পরিকল্পনার সাহায্যে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

পশুপাখী ও তরুলতা হ'তে এই কথাকলি নৃত্য অনেক বিচিত্র ভঙ্গি গ্রহণ করেছে। ময়ূর-নৃত্য কথাকলি নৃত্যের একটি শ্রেষ্ঠ দান। শিবের তাণ্ডব নৃত্য কথাকলি নৃত্যের চরম সিদ্ধি। অপরূপ রস নিবেদনের মধ্যে শিল্পে অপূর্ব অভিব্যক্তি কথাকলি নৃত্যে যেমন ভাবে ফুটে ওঠে, আর কোন নৃত্যেই তার তুলনা পাওয়া যায় না।

বর্তমান কালের একজন বিখ্যাত নৃত্য-সমালোচক বলেছেন—

"কথাকলি নাচে দেখেছি এমন এক মায়া, এমন এক মোহ যেখানে নর্তক-নর্তকীরা লোপ পেয়ে যায়, থাকে শুধু একটি মূর্ত রূপ-হিল্লোল, একটি ছন্দোময় ভঙ্গিমা।"

জগতে কথাকলির স্থান অত্যুচ্চে। ভারতবর্ষ তার নৃত্যকলার যা কিছু নিয়ে গৌরব করতে পারে কথাকলি যে তার মধ্যে একটি, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আলো আরও আলো

সুভাষ বসু

Vision and Love'
—I have beheld
The path of thy departure, sleep and death
Shall not divide us long !
—Alastor : P. B. Shelley

ভোরের আলো হামাগুঁড়ি দেয়।
গাছের তলায় তলায়, কাছাকাছি গড়ে ওঠা
কুটিরের আশে পাশে—
তখনও অচেনা অন্ধকার ঘিরে আছে।
সারিবদ্ধ জঙ্গলের মিষ্টি বাতাসের মাঝ দিয়ে
চলে গেছে সঙ্কীর্ণ বীথিপথ—
সেই পথে সে এগিয়ে আসে।
প্রকৃতির ছবি তার মনে ছায়া ফেলে ;
তবু তার অর্জুন-দৃষ্টি বহুদূর প্রসারিত।
সে এগিয়ে চলে, প্রতি পদক্ষেপে
ভাঙে আর ভাঙে অন্ধকারের শেষস্বপ্ন।

ধুলোমাটির পৃথিবী পাশে রেখে
সে এগিয়ে চলে—
পুকুরের ছায়া ছায়া জলে তৃতীয়ার খেলা
তাকে মুগ্ধ করে না।
সূর্য প্রকাশিত হয়
পৃথিবীর রঙ বদলায় ;
তার ব্যাপ্ত দৃষ্টির ঔজ্জ্বল্য
তাকে নিয়ে যায় এক দেশ থেকে আর এক দেশে।

সূর্য তাকে পথ দেখাবে।
মাথার ওপরে সূর্যের প্রখর বিকিরণ।
প্রকৃতির আয়ত কাজল মুছে গিয়ে
পৃথিবী এখন রুক্ষ কঠিন
নির্মম বাস্তবের রূপ—ধুলোর স্তর
ক্রমেই ঘিরছে তাকে।

যদিও তার দৃষ্টি সীমানা পেরিয়ে—
তবু পলে পলে হিসেব করে,
ভেবে দেখে।

এই মর্তের সচল জীবন দেখা যায় দু'পাশে।
তাদের দু'চোখে জেগে উঠে বিস্ময়।
তাদের দিকেই এগিয়ে চলে সে,
তারা ভয় পায়,
দূরে সরে যায়।
শিশুরা আর্তনাদ করে, মায়ের আঁচলে লুকোয়;
কুমারীরা পেছন ফিরে থাকে।
তারা তো জানে না—
কী দুর্বার পিপাসা তার অণুতে অণুতে।
এখানে নয়, এখানে নয়
তার গভীর দৃষ্টি আরও প্রসারিত হয়ে যায়।
ক্লান্ত পা শুষে নেয় তার শেষ শক্তি
বিক্ষিপ্ত মন আবার এগিয়ে চলে।
এখানের জলবায়ু তার তৃষ্ণা মেটাবে না।

এবার সূর্যের তির্যক ভঙ্গি।
সূর্য আর আশা দেয় না; পরাজিত সে
ক্রমশঃ বিবর্ণ হয়ে ওঠে।
অসহ্য নীরবতা তাকে ঘিরে ধরে।
বরফের আঘাত ঝরে!
সূর্য অস্ত যায়।
ক্লান্ত সে দাঁড়ায় সীমাস্বর্গের অপূর্ণ প্রান্তে।

কখনও কখনও কি এক অস্ফুট স্বর
ঘুরে বেড়ায়—
এই জনহীন প্রান্তরে।
একটা বিশ্লিষ্ট সুর হঠাৎ ভেসে আসে
রাশি রাশি বরফের ওপর দিয়ে।
সে বিষাদসঙ্গীতের সুরে সুরে
স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই গ্রহের ক্রন্দন।

নাট্যশাস্ত্রে নাট্যোৎপত্তি-কথা

আরতি মৈত্র

[এক]

প্রাচীন ঐতিহ্যের উপরই গড়িয়া ওঠে অগ্রগমনের নিত্য নূতন ইতিহাস। সেই কারণেই কোন দেশের সংস্কৃতির বর্ত্তমান রূপ সঠিক জানিবার জন্য ফিরিয়া দেখা প্রয়োজন অতীতকে, যেখান হইতে যাত্রারম্ভ। ভারতীয় নাটকের ও নাট্যশাস্ত্রের জন্মসূত্র অনুসন্ধান করিবার জন্য ফিরিয়া যাইতে হইবে খৃষ্ট জন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে, যখন মহামুনি ভরত তাঁহার দিব্য মহিমার মাধ্যমে অপূর্ব্ব কুশলতার সহিত নাটাশাস্ত্রের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় এক অনিন্দ্যসুন্দর শিল্পের জন্ম ও রীতিবৈচিত্র্যের কথা লিপিবদ্ধ করেন।

বিশ্বের সমস্ত দেশের নাটকের জন্ম ধর্ম্মীয় পরিবেশে। ধর্ম্মের রক্ষাকবচ প্রাচীন সমাজের মানুষকে সহজাত কবচকুণ্ডলের ন্যায় আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে, বাধা-বিপত্তি জয় করিবার দুর্জ্জয় শক্তি দিয়াছে আর দিয়াছে আত্মরক্ষার অমোঘ শক্তি। ধর্ম্মের প্রাঙ্গণে সমবেত মানুষ নানা জটিল সমস্যার সমাধান করিয়াছে এবং সেই ধর্ম্মের মহিমাকীর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্যে তাহারাই সৃষ্টি করিয়াছে স্তোত্র, সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটক। বিভিন্ন দেশের নাট্যোৎপত্তির ইতিহাস এই তত্ত্বের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিবে।

পাশ্চাত্যের নাটকের প্রথম বিকাশ ঈজিপ্ট ও এশিয়া মাইনরের passion plays-এর মধ্যে। ঈজিপ্টের Abydos passion plays-এই প্রথম নাট্যলক্ষণগুলি পরিস্ফট হয়। ইহা ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার সঠিক রূপ কী ছিল তাহা জানিবার কোন উপায় নাই ; তবে একথা সত্য যে "The god or deified entered the theatre with aplomb and his exalted character and importance could be honoured only by all the recourses that the early theatre can master······ Best known is the Abydos passion play of Egypt."

গ্রীসের আদি কবি হোমার একজন চারণ ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন কবি ছিলেন কিনা নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা সম্ভব নহে। হোমারের 'ইলিয়াড' কাব্য আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্ব নবম শতাব্দীতে রচিত। চারণ কবিদের সম্বন্ধে জানা যায় যে তাঁহারা

দলের মূল গায়করূপে গান গাহিতেন এবং সঙ্গে অনেক দোহার থাকিত। ইঁহারা নৃত্য-গীত সহযোগে দেবতা এবং মহাপুরুষদিগের মহিমাকীর্ত্তন করিতেন। এই চারণ-গীতিকে গ্রীসে মোল্‌পি (Molpe) বলা হয়। অনেকের ধারণা এই মোল্‌পি হইতেই মহাকাব্যের সৃষ্টি। গ্রীসের পূর্ণাঙ্গ নাটকাভিনয়ের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে, গ্রীক দেবতা Dionysus-এর উপাসনাকেন্দ্র Theatre of Dionysus-এ। Dithyrumb থেকে ক্রমে Tragedy, Satyr এবং Comedy সৃষ্টি হয়। এই নাট্যোৎসবের মাধ্যমেই প্রখ্যাত নাট্যকারগণ—Aeschylus (৫২৫-৪৫৬ খৃঃ পূঃ), Sophocles (৪৯৪-৪০৬ খৃঃ পূঃ), Euripides (৪৮৬-৪০৬ খৃঃ পূঃ) ও Aristophanes (৪৫০-৩৮৫ খৃঃ পূঃ) বিশ্ববাসীর নিকট পরিচিতি লাভ করেন। ইঁহাদের নাটকগুলি অবলম্বনে নাট্যশাস্ত্র রচনা করিয়াই এ্যারিষ্টটল নাট্যশাস্ত্রীরূপে জগদ্বরেণ্য হইয়াছেন। ছয়দিনব্যাপী এই নাট্যোৎসবে Dithyrumb, Tragic Triology, Comedy ও Satyr-এর অভিনয় হইত।

ইংরাজী নাটক-ও গীর্জ্জার সীমানার মধ্যে সৃষ্ট ও পুষ্ট। খৃষ্টীয় পঞ্চম হইতে অষ্টম শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত কালকে ইংলণ্ডের "অন্ধকার যুগ" বলা যায়। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত কালে ইংরাজী নাটকের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে। দিব্য মাহাত্ম্য প্রচারের মধ্য দিয়া গীর্জ্জার ধর্ম্মযাজকগণ নাটক রচনা ও অভিনয় করিতেন। এই নাটকগুলিকে Miracle plays ও Morality plays বলা হয়। প্রাক্-রেণেসা যুগে ইংলণ্ডের অধিবাসীরা নাটক বলিতে Miracle plays ও Morality plays-ই বুঝিত। "Almost to the middle of the fifteenth century the Miracle plays comprised all that was known of stage presentation in connection with serious drama."

ভারতীয় নাটকের জন্মও অনুরূপভাবে ধর্ম্মের স্নিগ্ধছায়াতলে। নাট্যাচার্য্য ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রের অপর নাম নাট্যবেদ। বেদ হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ। নাট্যশাস্ত্রের পূর্ব্ববর্ত্তীকালেও নাট্যকলার যে সামান্যতম নিদর্শন মেলে তাহাও ধর্ম্মগ্রন্থ ঋগ্বেদের মধ্যেই। ঋগ্বেদের মধ্যেই "সরমা ও পনি", "যম ও যমী", "পুরুরবা ও উর্ব্বশী" ইত্যাদি সংবাদ সূক্ত বা গাথা পাওয়া যায়। এই সমস্ত সূত্রকে ভারতীয় নাটকের বীজস্বরূপ বলা যায়। পরম প্রাজ্ঞ ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রই ভারতীয় নাট্যতত্ত্বের প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ।

আমাদের বিশ্বাস বর্ত্তমানকালের নাটকের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির দিনেও নাট্যবেদের অনুশীলন অপরিহার্য্য। প্রয়োগবিজ্ঞানের রীতি-নীতি এবং বৈশিষ্ট্যসকল যে রূপে ইহাতে উপস্থাপিত হইয়াছে তাহা মহামতি এ্যারিষ্টটলের "Poetics"-এও সম্যক্‌রূপে

আলোচিত হয় নাই—Horace-এর 'আর্স পোয়েটিকাতে-'ও নয়। সেই কারণে কেবলমাত্র আমাদের দেশে নয়, সমগ্র বিশ্বের নাট্যশাস্ত্রীদের জ্ঞানের পূর্ণতম বিকাশের জন্য ভরতের নাট্যশাস্ত্র একান্ত প্রয়োজনীয় এবং বিভিন্ন ভাষায় ইহার অনুবাদ একান্ত বাঞ্ছনীয়।

মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও "নাট্যশাস্ত্র" নামটি পর্য্যন্ত অনেকের অজ্ঞাত ছিল। ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মুষ্টিমেয় কয়েকজন এই শাস্ত্রটি পাঠ করিয়াছেন। এজন্য প্রধানতঃ দায়ী গ্রন্থখানির দুষ্প্রাপ্যতা।

F. Hall নাট্যশাস্ত্রের প্রথম প্রকাশক। "দশরূপ" গ্রন্থের সহিত নাট্যশাস্ত্রের কয়েকটি বিশিষ্ট অধ্যায় তিনি প্রকাশ করেন। অতএব Hall সাহেবকেই নাট্যশাস্ত্রের প্রথম আবিষ্কারকও বলা যাইতে পারে। নাট্যশাস্ত্রের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি Hall সাহেব পান নাই এবং সেই কারণেই পৃথক্‌রূপে সম্পূর্ণ নাট্যশাস্ত্র প্রকাশের সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। Hall সাহেবের পরে J. Grosset, ফরাসী পণ্ডিত P. Regnaud এবং আরও অনেকে নাট্যশাস্ত্রের বিভিন্ন অধ্যায় পৃথক্ পৃথক্‌রূপে প্রকাশ করেন। বরোদার অসম্পূর্ণ সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ১৯২৬ ও ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে। কাশী হইতেও ইহার একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহার আধুনিকতম সংস্করণটি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজ হইতে। এই সংস্করণটি অভিনব গুপ্তের টীকাসমন্বিত।

আদি নাট্যশাস্ত্রটি ১২,০০০ শ্লোকে সম্পূর্ণ ছিল। পরবর্ত্তীকালে ইহা মাত্র ৬,০০০ শ্লোকসহ প্রকাশিত হয়। অনেকে এইরূপ মত পোষণ করেন যে ১২,০০০ শ্লোক-সমন্বিত বৃহদায়তন সংস্করণটির নাম "নাট্যবেদাগম" ও ৬,০০০ শ্লোক-সমন্বিত ক্ষুদ্রতর সংস্করণটির নাম "নাট্যশাস্ত্র" ছিল। "ভাবপ্রকাশন" গ্রন্থে সারদাতনয় (১১৭৫-১২৫০) এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন।

"একং দ্বাদশসহস্রৈঃশ্লোকৈরেকং তদর্ধতঃ।
ষড়্‌ভিঃশ্লোকসহস্রৈর্যো নাট্যবেদস্য সংগ্রহঃ॥ (১০/৩৫)

মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ কবি ৩৬,০০০ শ্লোকবিশিষ্ট অপর একটি নাট্যবেদের উল্লেখ করিয়াছেন। এই নাট্যবেদের রচয়িতা "ব্রহ্মা" অথবা "ব্রহ্মাভরত"। (ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রমননের আলোকে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা

ধীরেন দেবনাথ

শিক্ষার সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করেছেন অনেকে। সে আলোচনা প্রায়শঃই বুদ্ধিমূলক। শিক্ষার মানদণ্ডটি কিন্তু প্রয়োগমূলক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি প্রকৃত শিক্ষিত কিনা, তার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাবে তার আচার-আচরণ থেকে। সুতরাং শিক্ষাকে কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞার মধ্যে বাঁধবার চেষ্টা না করে শিক্ষার উদ্দেশ্যকেই আলোচনার বিষয়বস্তু করলে বোধ হয় আসল লক্ষ্যে পৌঁছানো সহজ হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হো'ল মনকে জাগিয়ে তোলা, তার কৌতূহলী প্রবৃত্তিকে প্রশ্নের আঘাতে উৎসুক করে তোলা—সূর্যের আলোয় যেমন করে পদ্মের পাপড়ি বিকশিত হয়। শিক্ষার লক্ষ্য হো'ল বিরাট বিশ্বের অস্তিত্বে নিজের অস্তিত্ব অনুভব করা, আবার নিজের অস্তিত্বে বিশ্বকে প্রত্যক্ষীভূত করা। চিত্তবৃত্তির মানোন্নয়ন ও সাম্যানুভব যে যে প্রক্রিয়ায় সম্ভব, তাকেই শিক্ষা বলা চল্‌বে। যদি কতকগুলি বই পড়লেই এটা সম্ভবপর হয় বলে মনে করি, তাহলে সেই বই পড়াটাই শিক্ষা, যদি নৃত্যগীতের মধ্য দিয়ে সেটা সম্ভব হয়ে ওঠে, তাহলে সেই নৃত্যগীতই শিক্ষা। আর চিত্তভূমি যেখানে ঊষর মরুর ন্যায় চিরশুষ্ক রইল, সেখানে শিক্ষার প্রকরণে বা আয়োজনে দৈন্য না থাকতে পারে, কিন্তু শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ায় তাকে আমরা শিক্ষা আখ্যা দেব না।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে এই আলোকে দেখেছেন, এই মানদণ্ডে বিচার করেছেন। তিনি বলেছেন, "The highest education is that which does not merely give us information, but makes our life in harmony with all existence." মনকে শুধু জানানো হয়, মনের জাগরণ ঘটাতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মনের এই জাগরণ ঘটাতে পারে যে শিক্ষা, তার জন্য কি কোনো বিশেষ উপকরণের প্রয়োজন আছে ? না, বিনা আয়োজনেই এ শিক্ষা আমাদের অধিগত হতে পারে ? জীবনে চলার পথে প্রতি মুহূর্তেই আমরা কিছু না কিছু দেখ্‌ছি, শুন্‌ছি। মনের দুয়ার যদি রুদ্ধ না থাকে, তাহলে এই দেখা আর শোনার মধ্য দিয়ে মন গ্রহণ করে চলেছে নতুনকে, বর্জন করে চলেছে জীর্ণ পুরাতনকে, আবার কখনো বা পুরাতন বিশ্বাসে নতুন সংকল্পে অধিষ্ঠিত হচ্ছে। এ শিক্ষা সর্বোত্তম নিঃসন্দেহে। আর এ শিক্ষা গ্রহণের জন্য মনকে যদি শাণিত করে তোলা যায়, তবেই উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যেতে পারে। নইলে বারে বারে ব্যক্তিগত

পরীক্ষা-নিরীক্ষার আয়োজনে পরম লগ্নটি অপচয়িত হবার আশংকাও কিছু কম নয়। তাই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ যদিও শিক্ষার চরম সার্থকতা, তবু সর্বজনীনতার আদর্শ থেকে বিবিক্ত থাকলেও তাকে চলবে না। সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্থান অপরিহার্য। যে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-প্রবর্তিত একটা পাঠক্রম থাকবে, পাঠদানের উদ্দেশ্যে শিক্ষক-শিক্ষিকা থাকবেন, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি নিয়ে একটা পরিবেশও গড়ে উঠবে। আর সব মিলিয়ে সর্বোপরি থাকবে একটা আনন্দের উত্তেজনা, প্রাণাবেগের স্ফুরণ, সর্বব্যাপী মুক্তির উল্লাস।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় নির্দিষ্ট একটা পাঠক্রম আছে, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহজ আকর্ষণে ছাত্রদের মনে সঞ্চারিত হতে বাধা পায়। যেহেতু একটি নির্দিষ্ট পাঠক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষার ভিত্তিটা গড়ে উঠবে, পাঠক্রম রচনা সম্পর্কে তাই বিশেষভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। ছাত্রদের মানসগঠন, চিত্তবৃত্তির বিশেষ প্রবণতা, ব্যবহারিক জগতের সাথে শিক্ষার যোগ ইত্যাদি বিষয়ের কথা মনে রেখে পাঠক্রম রচনা করতে হবে। যে শিক্ষকের পরে শিক্ষাদানের দায়িত্ব রয়েছে, তাঁর ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্রের মুগ্ধ ও উৎসুক দৃষ্টির সামনে তিনি অপরিচিত বিশ্বের ছবি তুলে ধরবেন। সে ছবি সাহিত্য-জগতের হতে পারে, সাহিত্যেতর শিল্পজগতের হতে পারে, বিজ্ঞানজগতের হতে পারে। স্বর্গদ্বারের চাবি যাঁর হাতে, তাঁকে ছাত্র মনে করে দেবতার বরপুত্র বলে। প্রতি অধ্যায়ে তিনি নতুন নতুন গ্রন্থিমোচন করে চলেছেন, আর ছাত্রের মনে প্রাপ্তির আনন্দ ঝলকিত হয়ে উঠছে। এই আনন্দের অভিপ্রয়াসে ছাত্রের সাথে শিক্ষকের নিবিড় যোগ গড়ে ওঠে। কিন্তু এসবই নিষ্ফল হবে যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশটি সুন্দর না হয়, ছাত্রমনের কাছে প্রীতিপ্রদ না হয়। উন্মুখ চিত্ত যদি প্রথমেই প্রতিকূল ও নিরানন্দ পরিবেশে অবসন্ন হয়ে পড়ে, অথবা পলায়নের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তাহলে শিখবে কে? যে-মন কেবলই পালাতে চাইছে, সে-মন গ্রহণ করবে কিভাবে? আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে তাই অত্যাবশ্যক। অথচ আমাদের দেশের প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির দিকে তাকালে মনে হবে, 'শিক্ষার পরিবেশ' শব্দটি অভিধানবহির্ভূত। পরিবেশের স্বীকৃতি নেই মহাবিদ্যালয়গুলিতে, এমন কি বহু বিশ্ববিদ্যালয়েও। পাঠক্রম, শিক্ষক বা পরিবেশ—কোনো ক্ষেত্রেই কি আমরা আদর্শ স্থাপন করতে পেরেছি যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা নিখুঁত হয়ে উঠবে? অথচ এ সত্য তো আজ আমাদের অজানা নেই যে, একমাত্র আদর্শ শিক্ষাই মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান।

রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটির সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। সাধারণে যেখানে বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে বিরোধ ঘটলে আপোষ-রফা

করে, রবীন্দ্রনাথ সেখানে নিজের সংকল্পে দৃঢ়, নিজের প্রত্যয়ে স্থিতমূল। ছাত্রজীবনে তাই স্কুল পালিয়েছেন সকল নিষেধের বিরুদ্ধে। ছাত্রজীবনে আনন্দময় পরিবেশের অভাব তাঁকে পীড়িত করে তুলেছিল, উত্তর জীবনে তাই অনুকূল পরিবেশে গড়ে তুললেন নিজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আনন্দের সাথে যোগ হোক ছাত্র-ছাত্রীর। আনন্দের উৎস প্রকৃতি, মানুষ ও ঈশ্বর ; সেই প্রকৃতি, মানুষ ও ঈশ্বরের সাথে তাদের নিবিড় যোগ স্থাপিত হোক। এই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হো'ল বিশ্বভারতী—যেখানে সকল পৃথিবী একটি নীড়ে পরিণত হবার বাসনা পোষণ করে, যেখানে একটি নীড় সকল পৃথিবীকে প্রীতির বন্ধনে কাছে টেনে রাখতে চায়। এজাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইঁট, কাঠ দিয়ে তৈরী বাড়ীটা দৃষ্টির অবাধ স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে না। চোখ সেখানে সহজে ক্লান্ত হয় না, মন পীড়িত হয় না। সকল কাজেই বিরাট বিশ্বের সাথে নিজের যোগসূত্রটি ক্ষণে ক্ষণে ধরা পড়ে। কাজ তাই আনন্দের বার্তা বয়ে আনে। শিক্ষাগ্রহণ কেবল একটিমাত্র চল্‌তি পন্থার মাধ্যমে মনকে নিরাসক্ত ও নীরস করে তোলে না। সে প্রতিমুহূর্তেই দেখ্‌ছে, চল্‌ছে, শুন্‌ছে— আর এই দেখা, চলা আর শোনায় জানা-অজানায় নতুনকে গ্রহণ করছে। এমনি করে মনের প্রসার ঘটে, স্বাধীন মননশক্তি বাড়ে, সকল বৃত্তির বিকাশ লাভ হয়। তরুণ শিক্ষার্থী-মনের ভিত্তি একবার গড়ে উঠলে বাকী ধাপটুকু পার হওয়া সহজ।

শিক্ষক তখন তার কাছে দূরাগত কোনো অপরিচিত ব্যক্তি নন্ ; তিনি তার বন্ধু, তার আত্মার আত্মীয়। তিনি কত বড় বিদ্বান্, সে প্রশ্ন তখন একেবারেই অবান্তর। প্রীতির সম্পর্কে মন যা পায়, তাতেই রসসিক্ত হয়ে ওঠে ; প্রকৃতির এই দাক্ষিণ্য-ধন্য পরিবেশে সকলেই যেন একসূত্রে বাঁধা। ছাত্রমনের প্রীতি ও শ্রদ্ধার অভিষেকে শিক্ষকের দানের আগ্রহ ও ক্ষমতা স্বভাবতঃই বেড়ে ওঠে।

শিক্ষায় পরিবেশের প্রভাব রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। এসম্পর্কে তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ

> "প্রাচীন ভারতের তপোবন জিনিষটার ঠিক বাস্তবরূপ কী তার ঐতিহাসিক ধারণা আজ সহজ নয়। তপোবনের যে প্রতিরূপ স্থায়ীভাবে আঁকা পড়েছে ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে সে হচ্ছে একটি কল্যাণময় কল্পমূর্তি, বিলাসমোহমুক্ত প্রাণবান আনন্দের মূর্তি।
>
> আধুনিক কালে জন্মেছি। কিন্তু, এই ছবি রয়ে গেছে আমারও মনে। বর্তমান যুগের বিদ্যায়তনে ভাবলোকের সেই তপোবনকে রূপলোকে প্রকাশ করবার জন্যে একদা কিছুকাল ধরে আমার মনে আগ্রহ জেগেছিল।

দেখেছি মনে মনে তপোবনের কেন্দ্রস্থলে গুরুকে। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ—নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন, সক্রিয়ভাবে; কেননা মনুষ্যত্বের লক্ষ্য সাধনেই তিনি প্রবৃত্ত। এই তপস্যার গতিমান ধারায় শিষ্যের চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তাঁর আপন সাধনারই অঙ্গ। শিষ্যের জীবন প্রেরণা পায় তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্য জাগরূক মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিষটি আশ্রমের শিক্ষার সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান। তার সেই মূল্য অধ্যাপনার বিষয়ে নয়, উপকরণে নয়, পদ্ধতিতে নয়। গুরুর মন প্রতি মুহূর্তে আপনাকে পাচ্ছে বলেই আপনাকে দিচ্ছে। পাওয়ার আনন্দ সপ্রমাণ করছে নিজের সত্যতা দেওয়ার আনন্দেই।"

শিক্ষার সাথে আনন্দের যোগ না থাকলেই শিক্ষণীয় বিষয় বোঝা হয়ে দাঁড়ায় শিক্ষার্থীর কাছে। যে কোনো প্রকারেই হোক, তখন মুখস্থ করার দিকে ঝোঁক পড়ে। কারণ পরীক্ষায় তো পাশ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতিপত্র না পেলে চাকুরি জুটবে না। সুতরাং প্রাণপণ চেষ্টায় মুখস্থ করি, পরীক্ষাও পাশ করি, তারপর সেই কৃতিত্বের দাবীতে চাকুরিও একটা মিলে যায় কোনো এক সময়ে। কিন্তু জীবনের সাথে এ শিক্ষা চিরকাল অসংলগ্নই রয়ে যায়। শিক্ষণীয় বিষয়কে যেখানে হৃদয় বা বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করা গেল না, সেখানে পরীক্ষায় পাশের পর তার সাথে সকল যোগই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মনের বিকাশ লাভের জন্য যে স্বাধীন চিন্তাশক্তির উন্মেষ প্রয়োজন, এ অবস্থায় তা' হয় না। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তাই আমাদের হোঁচট খেতে হয়, আর সকল প্রকার নির্দেশের জন্যই পাঠ্যপুস্তক বা শাস্ত্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। এ শিক্ষালাভ আমরা করি না যে, 'কোনো পাঠ্যপুস্তক বা শাস্ত্রগ্রন্থই জীবনের সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে না। শিক্ষণীয় বিষয় বা শিক্ষকের সার্থকতা সেখানে, যখন শিক্ষার্থী তাদের প্রয়োজন ক্রমশঃ ভুলে যেতে পারে। কিন্তু আমরা চিন্তার ক্ষেত্রে, বুদ্ধিপ্রয়োগের ক্ষেত্রে চিরকাল না-বালক রয়ে যেতে পারলেই বেঁচে যাই; দায়িত্বটা অন্যের পরে দিতে পারলেই স্বস্তিতে থাকি। এতে আর যাই হোক্, সম্পূর্ণতা অর্জন হয় না; এদের দিয়ে দেশের প্রয়োজনও মেটে না। বিদ্যা ও তার ব্যবহারের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে বলেই 'পুঁথিকে আমরা কত বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব (অর্থাৎ মানুষ) তাহাকে কি তুচ্ছ বলিয়া জানি।'

যে শিক্ষা নিজের জীবনের মধ্যেই অপরিণত ও অপ্রযুক্ত, সে-শিক্ষা দেশের সাথে, বিশ্বপ্রাণের সাথে নিজেকে যুক্ত করতে সক্ষম হয় না। ফলে শিক্ষিত ব্যক্তিরাও পরস্পরের সাথে যোগহীন এবং অশিক্ষিতের প্রতি উদাসীন। সমাজজীবনের সাথে ব্যক্তিজীবনের

অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠতে পারে না। এরই পাশাপাশি আমাদের প্রাচীনকালের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে তুলনা করা যেতে পারে। সে যুগেও শিক্ষিতের সংখ্যা সুপ্রচুর ছিল না, কিন্তু সমগ্র সমাজমানসটি একসূত্রে বিধৃত ছিল। শিক্ষার উদ্দেশ্যই যেখানে শিক্ষার্থীমনের কৌতূহলী ও অনুসন্ধিৎসু প্রবৃত্তি বাড়িয়ে তোলা, সেখানে প্রকৃতপক্ষে হয় আমরা কিছু সংখ্যক অনুদার ও ঈর্ষাকাতর লোক পাচ্ছি, নতুবা একদল উদাসীন লোক তৈরী করছি। চিত্তের সংকীর্ণতা যেমন বৃহৎ ও মহতকে অবনমিত করার চেষ্টায় উন্মুখ, ঔদাসীন্যও তেমনি শিক্ষাগ্রহণের পথে অন্তরায়। মনের সজীবতা, চাঞ্চল্য ও গ্রহণের আকাংক্ষা না থাকলে সকল শিক্ষাই তো কঠিন প্রস্তরের দেহে বারিধারার প্রথম আঘাতের মত নিস্ফল হবে। শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যে প্রত্যক্ষতা থাকলে শিক্ষা সজীব হয়ে ওঠে, সেই প্রত্যক্ষতার অভাবকে রবীন্দ্রনাথ দায়ী করেছেন এই মনোভাব সৃষ্টির কারণ হিসাবে। পুঁথি ছেড়ে সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে পাঠের বিষয়বস্তু করার প্রয়োজনীয়তার দিকে তাই তিনি অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন।

আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যে ঔদাসীন্য ও স্বাধীন চিন্তাশক্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়, শিক্ষণীয় বিষয়কে কোনোরকমে গলাধঃকরণ করে পরীক্ষায় পাশ করতে সচেষ্ট দেখা যায়, বিদ্যা ও তার প্রয়োগের মধ্যে যে দূরবিস্তৃত ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়, তার প্রধান কারণ অবশ্যই আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি। পাঠ্যবিষয়কে বাস্তব-জীবনে প্রয়োগ করবার সুযোগ নেই, অধিকাংশ শিক্ষকের মধ্যে আদর্শনিষ্ঠা নেই, অধ্যাপনা-বৃত্তির প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নেই, শিক্ষার্থীর মনের অনুকূল পরিবেশ নেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, শিক্ষার মধ্যে প্রত্যক্ষতা নেই, এসব অভিযোগ বহুশ্রুত। মানবপ্রেমী রবীন্দ্রনাথ শুধু এসম্পর্কে আলোচনা করেই ক্ষান্ত হননি। আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা বলতে যা বোঝায়, তাই তিনি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। শিক্ষা তো শুধুমাত্র বইয়ে লেখা কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয় অধিগত করা নয়। শিক্ষার সম্পূর্ণতা সাধিত হতে পারে মনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের দ্বারা। যে সোনার কাঠির পরশে ঘুমন্ত মন জেগে ওঠে, তা আছে একমাত্র আনন্দের। সব সৃষ্টির মূল কথাই তো আনন্দ। সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতিকে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য বা বিজ্ঞান শিক্ষা থেকে তাই বিযুক্ত করেননি। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাপ্রসূত যাঁরা, তাঁদের শিক্ষার মধ্যে এই পূর্ণতার বীজটি আশ্রয় পাচ্ছে না। জীবনের ব্যাপক ক্ষেত্রে তাঁরা তাহলে কোন্ আসন দাবী করবেন ?

শিক্ষাব্যবস্থায় উল্লিখিত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, অশিক্ষিত থাকার চেয়ে এ শিক্ষাগ্রহণও ভাল। কিন্তু সেক্ষেত্রেও তো পথ নিরঙ্কুশ নয়। শিক্ষার

মাধ্যমই শিক্ষাবিস্তারের প্রধান অন্তরায়। বিদেশী ভাষা শিক্ষণে প্রচুর সময় ব্যয়িত হচ্ছে, অধিক মনোযোগ দিতে হচ্ছে, ফলে অন্য বিষয়গুলি অবহেলিত হয়ে থাকছে। যে ভাষা দেশের জলমাটির মত আমাদের রক্তের মধ্যে লালিত নয়, তাকে আয়ত্ত করা সহজসাধ্য নয়। শিক্ষণীয় বিষয়ের চাইতে ভাষার দাপটটাই প্রবল হয়ে ওঠে তরুণ শিক্ষার্থীর কাছে। এই বিদেশী ভাষাশিক্ষার ব্যাপারকে আরো ভয়াবহ করে তোলেন স্বল্পশিক্ষিত শিক্ষকগণ — যাঁদের উপর নীচু ক্লাসে ইংরাজি শেখাবার দায়িত্ব সাধারণতঃ ন্যস্ত। অথচ তাঁরা নিজেরাই সেই ভাষা ও সাহিত্যে সম্পূর্ণ পারদর্শী বা আগ্রহশীল নন্। ফলে কাঁচা ভিত নিয়ে উঁচুর দিকে গিয়ে প্রতিপদেই বাধা ঠেকে। বড় বড় বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিত ব্যক্তির নজীর দেখিয়ে অবশ্য কেউ কেউ বলতে পারেন যে, তাঁরাও তো বিদেশী ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন।

তার উত্তরে সবিনয়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে—এঁদের সংখ্যা কত ? ব্যতিক্রম দিয়ে সাধারণ নিয়মকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাছাড়া, তাঁদের শিক্ষার ভিত্তি প্রায়শঃই নির্ভরযোগ্য। কিন্তু অধিকাংশ সাধারণ মানুষের অবস্থা কি ? শিক্ষাকে যেখানে সর্বজনীন করা প্রয়োজন বলে আমরা মত পোষণ করছি, শিক্ষার প্রসার যেখানে দেশের সর্ববিধ অবনয়ন দূরীকরণের উপায় বলে বিশ্বাস করি, সেখানে এ পন্থা কোনোমতেই গ্রহণীয় হতে পারে না। শিক্ষার ভাষা ও শিক্ষার্থীর ভাষার মধ্যে ঐক্য স্থাপিত না হলে শিক্ষার বিস্তারও যেমন ঘটবে না, তেমনি শিক্ষা দেশের প্রাণে সাড়া জাগাতেও পারবে না। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যকে স্মরণ করা যেতে পারে—

> "পশ্চিম হইতে যা কিছু শিখিবার আছে জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল, তার প্রধান কারণ, সেই শিক্ষাকে তারা দেশী ভাষার আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে। অথচ জাপানি ভাষার ধারণাশক্তি আমাদের ভষাার চেয়ে বেশি নয়। নূতন কথা সৃষ্টি করিবার শক্তি আমাদের ভাষায় অপরিসীম। ··· আমরা ভরসা করিয়া এপর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলা ভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায়। এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন যে, একদল ছাত্র থাকে, যারা ভাষা শিক্ষায় ততটা পটু নয়। অথচ সাধারণ বুদ্ধি তাদের কম নয়। বিদেশী ভাষার বাধাটা দূর হলেই এরা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে এবং একটি নির্দিষ্ট শিক্ষণীয় বিষয়ে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণকারী ছাত্রদের তুলনায় তাদের পারদর্শিতা কোনো

অংশেই লঘু বলে প্রতিপন্ন করা যাবে না। রবীন্দ্রনাথ তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ও দেশী ভাষা উভয়কেই মাধ্যম হিসাবে ব্যবহারের সমর্থন জানিয়েছেন।

কোনো একটি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে গেলে আনুষঙ্গিক আরও অনেক বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ভাষা যদি সেখানে ছাত্রমনের কাছে সহজ ও স্বাভাবিক বলে মনে না হয়, তাহলে সে এ ব্যাপারে উৎসাহ দেখাবে না। বাংলা ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় রচিত উপযুক্ত পুস্তকের অভাব সাময়িক অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম পরিবর্তনের সাথে সাথে উচ্চ শিক্ষার উপযোগী পুস্তকও রচিত হতে থাকবে। প্রয়োজন থেকেই তো নতুনের সৃষ্টি।

শিক্ষাকে সহজ ও স্বাভাবিক করে তোলার উদ্দেশ্যে মাতৃভাষার মাধ্যম গ্রহণ কোনো কোনো মহলে আজো বিতর্কের বিষয়বস্তু। কিন্তু ইংরেজি বর্জন না করেও দুয়ের সংরক্ষণের যে পথ রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেছেন, সে সম্পর্কে কোনো সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত আলোচনা হয় না কেন ?

রবীন্দ্রনাথ পরাধীন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, পরাধীন ভারতবর্ষের মাটিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি বেদনার্ত হৃদয়ে পরাধীন দেশের নিরক্ষরতা, কুশিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যভিচার লক্ষ্য করেছেন। বিদেশী শাসনব্যবস্থায় স্বভাবতঃই আমাদের শিক্ষার মধ্যে বহু অসংগতি ও অসম্পূর্ণতা ছিল— যা' বিদেশী শাসন ও শোষণ কায়েম রাখার পক্ষে অনুকূল এবং আমাদের মধ্যে জাতীয় ভাব উন্মেষের অন্তরায় স্বরূপ ছিল। শিক্ষাসম্পর্কিত আলোচনায়, নিজের গড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে, তাঁর প্রবর্তিত পাঠক্রমে ও শিক্ষাদান ব্যবস্থায় এই ত্রুটিগুলিকে তিনি বিদূরিত করতে চেয়েছেন। শিক্ষাকেই তিনি লক্ষ্য রেখেছেন, উপকরণকে নয়। অনটনের মুহূর্তে আহার্য ও পাত্রের মধ্যে আহার্য ই প্রথম ও প্রধান বিবেচ্য তাঁর কাছে।

সত্যসন্ধানী কবিহৃদয় সমাজভাবনায় আবেগাকুল। শিক্ষা, ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি সর্বত্রই তিনি বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছেন। বিজ্ঞানীর নিষ্ঠা ও দূরচারী দৃষ্টি নিয়ে, রোম্যান্টিক কবির অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাবার দুর্মর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি সারাজীবনই তো পথ চলেছেন, আর ডাক দিয়েছেন মানুষকে। আবার প্রাচ্য ঋষির আধ্যাত্মিক অনুভাবনায় বিকেন্দ্রিক আকর্ষণের মাঝেও এক শাশ্বত সত্যের অচঞ্চল প্রাণ-বিন্দুতে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছেন।

হয়ত তিনি গীতা ও উপনিষদ্ থেকে দীক্ষা নিয়েছেন, হয়ত প্লেটো, অ্যারিষ্টটল, রুশো, ফ্রোয়েবেল, ডিউই তাঁর মনে সাড়া জাগিয়েছেন, হয়ত বা মহাত্মা গান্ধী, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের বাণী তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছে; তবু এ সত্য প্রমাণের

অপেক্ষা রাখে না যে, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসম্পর্কিত চিন্তাধারা তাঁর সমগ্র জীবনদর্শনেরই অঙ্গীভূত।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পিমানস এ যুগে দুর্লভ। সে জন্য ক্ষোভেরও কারণ দেখি না। কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব তো মেলাতে পারছি না, রবীন্দ্রমননের ফসল কি আমাদের চিত্তভূমিতে যথাযথ আশ্রয় পেয়েছে? দেশ আজ স্বাধীন। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্বতন ত্রুটিগুলি কি আজও আমরা দূর করতে পেরেছি? শিক্ষার সাথে একাধারে আধ্যাত্মিকতা ও জীবন-ভাবনাকে যুক্ত করতে পেরেছি কি? শিক্ষাবিস্তার, শিক্ষার পরিবেশ, পাঠক্রম ইত্যাদি নিয়ে কিছু কিছু প্রশংসনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা অবশ্য হচ্ছে। কিন্তু সমগ্র জীবনের সাথে শিক্ষার সম্পর্ককে যে অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করার প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন, সেই মূল সত্য সম্বন্ধে পূর্ণভাবে অবহিত হতে না পারলে, আমাদের এ জাতীয় প্রয়াস কোনো স্থায়ী সমাধানের নির্দেশ দিতে পারবে না।

আমাদের আঙিনায়

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ শ্রদ্ধেয় উপাচার্য মহোদয় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং অন্যান্য কর্মীদের এক মিলিত সভায় জাতীয় সংহতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

*   *   *   *

গত ৫ই নভেম্বর, ১৯৬২ উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। চীনা আক্রমণের পটভূমিকায় দেশের সঙ্কটময় পরিস্থিতি এই সভার আলোচ্য বিষয় ছিল। বিভিন্ন বক্তা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মীগণ একদিনের বেতন এবং শিক্ষার্থীরা তাদের সামর্থ্যানুযায়ী প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করবেন।

*   *   *   *

৪ঠা নভেম্বর, ১৯৬২ সাইপ্রাসের প্রেসিডেণ্ট আর্চবিশপ ম্যাকারিওস রবীন্দ্র ভারতী পরিদর্শন করেন। সমবেত কণ্ঠে গীত রবীন্দ্রনাথের 'আকাশভরা সূর্যতারা' গানটির ভাষা ও সুর-মাধুর্য তাঁকে মুগ্ধ করে।

*   *   *   *

৯ই নভেম্বর, ১৯৬২ নেদারল্যাণ্ডের মহামান্যা রাজকুমারী বিয়েট্রিক্স রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এই উপলক্ষে 'শ্যামা' নৃত্য-নাট্যের একটি নির্বাচিত দৃশ্য অভিনীত হয়। অভিনয় দেখে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন এবং অংশগ্রহণকারী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন।

*   *   *   *

গত ১৬ই নভেম্বর, ১৯৬২ রাষ্ট্রপুঞ্জ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকর্তা মাননীয় শ্রীভবতোষ দত্ত মহোদয়। তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপুঞ্জের কার্যাবলীর এক বিস্তৃত বিবরণ দেন।

*   *   *   *

গত ১৯শে নভেম্বর, শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী রবীন্দ্রভারতী পরিদর্শন করেন। এই উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে তাঁকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানানো হয়। তিনি ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকমণ্ডলীকে আশীর্বাদ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা কামনা করেন।

পশ্চিম জার্ম্মান গণতন্ত্রের মহামান্য প্রেসিডেণ্ট ডঃ হাইনেরিখ্ লুব্কের সস্ত্রীক রবীন্দ্রভারতীতে শুভ পদার্পণ ঘটে গত ৩০শে নভেম্বর, ১৯৬২ তারিখে। ছাত্র-ছাত্রীগণ এই উপলক্ষে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য অভিনয় করে। তিনি রবীন্দ্রনাথের পৈত্রিক ভবনে পদার্পণ করতে পেরেছেন বলে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নৃত্যের প্রশংসা করেন।

* * * *

গত ১লা ডিসেম্বর, ১৯৬২ শ্রদ্ধেয় উপাচার্য মহোদয়ের সভাপতিত্বে দেশের বর্তমান জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় ঐক্যরক্ষা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থাগ্রহণে আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও প্রশাসনিক বিভাগের সকল কর্মীই এই সভায় যোগদান করেন। সাধ্যানুযায়ী প্রতিরক্ষা বণ্ড ক্রয়, ছাত্র-ছাত্রীদের এন. সি. সি.-তে যোগদান এবং সীমান্তরক্ষী জওয়ানদের জন্য শীতবস্ত্র তৈরী করতে অনুরোধ করা হয়।

* * * *

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৬২ নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাগত জানানো হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে আয়োজিত এই বরণোৎসবে সভাপতিত্ব করেন সংগীতবিভাগের ছাত্র শ্রীব্রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শঙ্খের মঙ্গলধ্বনি, চন্দনের অভিষেক, ধূপের সৌরভ আর রজনীগন্ধার সজীব বৃন্তের সমারোহে আয়োজনটি মনোরম হয়েছিল।

* * * *

বৎসরের শেষ দিনটিতে (৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৬২) ছাত্র-ছাত্রীরা মিলিত হন এক বিদায়োৎসবে। এই সভায় বিদায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের শুভ কামনা জানানো হ'ল এক প্রীতিমধুর পরিবেশে। পুরাতন পরিচিতের প্রতি আকর্ষণ ও নবীন জীবনের প্রতি উন্মুখতা—এরই পরিচয় পাওয়া গেল বিদায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের মর্মস্পর্শী ভাষণে। এ অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন নাটক বিভাগের ছাত্র শ্রীপ্রকাশ নন্দী। শ্রদ্ধেয় উপাচার্য মহোদয় বিদায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের আগামী জীবনের চলার পথে কল্যাণ-কামনা জানালেন। এ বিদায় কোনদিন বিচ্ছেদের নিষ্করুণতায় লীন হবে না— এ বিশ্বাসও তিনি ব্যক্ত করলেন।

* * * *

গত ১১ই জানুয়ারী, ১৯৬৩ যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার পটভূমিকায় ফিল্মস্ ডিভিসন কর্তৃক গৃহীত কয়েকটি তথ্যমূলক ছবি বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হয়।

গত ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৬৩ কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী শ্রীশ্যামনাথ রবীন্দ্রভারতী পরিদর্শন করে গেলেন। তাঁর সম্মানার্থে একটি মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

* * * *

রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন আফগানিস্তানের মন্ত্রী ডঃ মহম্মদ আসেফ সোহিল গত ২২শে জানুয়ারী, ১৯৬৩।

* * * *

পক্ষান্তকালীন প্রতি শনিবার বিকাল ২-৩০মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়-মঞ্চগৃহে সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য ও নাটক সম্পর্কে আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করছেন উল্লিখিত বিষয়সমূহে খ্যাতকীর্তি সুধীগণ। এতে জনসাধারণের অবাধ প্রবেশাধিকার আছে।

গত ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৬৩ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস অধ্যাপক শ্রীপি. কে. গুহ মহোদয় "আধুনিক সমস্যামূলক নাটক" সম্পর্কে এবং ২রা ফেব্রুয়ারী বিশ্বভারতীর সংগীত ভবনের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয় "সংগীত রচনায় রবীন্দ্রনাথ" সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন।

●

ENGLISH SECTION

Editorial Notes

We are glad to announce the publication of the first issue of the Rabindra Bharati Patrika which will be published quarterly and in both Bengali and English.

The Rabindra Bharati University has taken upon it the task of ensuring a deeper study and a penetrative research on Rabindranath and of bringing his messages and philosophy before all—from the higher down to the lower strata of the society.

Along with the other agencies of the University, the Rabindra Bharati Patrika professes to work towards these ends, the necessity for which has assumed a significant importance in the present crisis of the country, which we are grimly determined to get over.

With profound sorrow, one day we mourned the loss of Dr. B. C. Roy, to whose ideas and determination the University owes its origin and today once again we pay our homage to his sacred memory.

We had the proud privilege of welcoming during the last few months some distinguished foreign visitors like Arch Bishop Makarios of Cyprus, H. R. H. Princess Beatrix of the Netherlands, H. E. President Hienrich Lubke and Madam Lubke of West Germany, H. R. H. Prince Norodom Sinhouk of Cambodia and Their Majesties King Paul and Queen Frederica of Hellenes, Greece, besides many other cultural delegations and dignitaries from our own country as also from abroad.

●

MY EXPERIENCES AND THE ACTING OF TAGORE

AHINDRA CHOWDHURI

Much has been said about Tagore dramas, though much yet remains to be said. Tagore as a dramatist has written profusely and though some of his dramas are difficult to produce, yet many have been staged and perhaps superbly.

In his earlier dramatic career, the poet was under the influence of foreign masters and specially Shakespeare, but this method was changed later and he introduced in his dramas indigenous dramatic elements which were found in the soil of his birth. Jatra and Palagans as conceived in Bengal, exerted their influence on his dramas to a great extent. His dramatic writings range from western patterns to indigenous ones and he made experiments with all forms of dramatic art, such as romantic and reading dramas, dance-drama, musical drama, farce, opera, symbolic drama and expressionistic dramas.

There are three kinds of expressionism—pre-war, war-period and post-war and his was of the first kind as is found in Muktadhara and Raktakarabi.

Today the dramatists of our country are imitating western method in a slavish manner. The spirit of Bengali drama today has therefore lost its natural fervour. Rabindranath alone stands unique and apart from other Bengali dramatists of this period ;—his was not an imitative method. He created and recreated and remodelled his older plays to suit his ever-changing dramatic ideology.

Thus the dramas of Rabindranath are to be produced according to the Poet's own method suggested in his various writings, articles, letters, diaries and in the prefaces of the dramas themselves, if they are at all to be produced in a perfect Tagore manner. Rabindranath, therefore, conceived of a stage of his own, which is a place where can be presented a combination of folk music, dance-dramas and jatras and panchalis which are natural to the soil of Bengal. The stage which he visualised never saw the light of the day, but if conceived properly that would have been yet another wonder in the realm of the drama. In 'Natir Puja' which was staged in Jorasanko Thakurbari and in which the poet himself took part in the role of Upali, the Buddhist monk, he showed what his imaginary stage would have been. The poet, as Upali, went straight on the stage from the auditorium and acted according to the thoughts expressed in the dialogue of the role. This was in the method of 'Hanamichi' of the Kabuki stage of Japan.

In this centenary year every one is producing Tagore dramas according to own choice and means, never caring for the traditions for which Tagore wrote these dramas, thereby corrupting the philosophy of life preached by the Poet and vitiating the spirit of Tagore dramas. The purposes of Tagore dramas are, therefore, definitely lost. If they are to be produced in a perfect manner, there ought to have been a stage, befitting Tagore's conception of it. His dramas, I think, cannot be played anywhere other than on a stage specially conceived by the great Poet. The ordinary professional stage is not quite adequate for this purpose.

It would be very difficult to impress upon the general readers, who are not professional actors like me about the method of production of the dramas of Tagore briefly enumerated above. Language cannot describe the feeling that an actor experiences while producing a Tagore play. No professional actor of today has ever asked me about it. Yet I will let you know how and what I did feel about it.

In 1923 I was in the Art Theatre. On 25th, 27th, 28th of August, this year Tagore staged 'Bisarjan' at the Empire Theatre, which is now known as Roxy Cinema. Sri Amritalal Bose, the veteran artist, dramatist and director of the Bengal stage wrote a review of this performance in the *Indian Daily News*. Tagore plays as yet had not been able to produce any effect in the public mind. Moreover, many had no occasion to see these performances. They said that these were amateur performances, peculiar to Jorasanko Thakurbari and therefore, have to be taken as an independent method not found with prevalent stage-craft. Highly cultured people saw them performed on the stage and these were not made for the general public. People became surprised when they read the article by Amritalal Bose, himself a great actor. Suddenly the public became interested. They thought that there must be something worth seeing since Amritalal praised so highly. Even Saratchandra, the great Bengali novelist, became so interested that he said that he must see them or he should not die. He admitted this in a letter to Sri Amal Home. We, too, were also eager to see it and were invited to do so. We took our seat in the box, when a gentleman whispered in our ears that none should clap their hands in praise of the performance while it was going on. This gentleman moved from box to box, requesting the visitors to keep silence. The curtain was raised and the poet appeared as Jaisingha, Dinendranath Tagore as Raghupati, and Rathindranath Tagore in the role of the Raja. There was no music in 'Bisarjan' as a drama, but some song-hits were also introduced by the Poet himself and were sung by Srimati Sahana Devi. Tagore was then in his 62nd year, but he moved on the stage with such a pliable body and graceful movement that none thought that he was so old. His flowing beards were tied around and were blackened. The performance went on, nobody clapped hands, no one moved or spoke a word, the whole auditorium seemed to be motionless and still. Apparently they were almost charmed to silence, they were spell-bound.

A good actor ought to have individuality and those who have not are not great. Rabindranath was of this opinion, when he wrote his 'Europe Jatrir Diary'.

"I had been to Lycium Theatre today. A dramatic version of Bride of Lamarmoor by Scott was staged. Irving was in the hero's role. His pronunciation was

hazy and gestures were peculiar, yet he conquered the hearts of his hearers by a strange method", he wrote.

Great dramatic critics of England referred to this surprising quality of the great Irving's expressive individuality. It was said about him that, if this quality is taken away from his acting nothing remains there to see. Tagore as an actor possessed this great quality.

Was there on that day a more exuberant individuality on the stage than Tagore himself ? His broad forehead, his dazzling eyes, his pointed nose and clear pronunciation, his sweet melodious voice were qualities befitting a great actor. While he played, his eyes sparkled on a dazzling splendour as if there was a flash of lightning. These were god-gifted qualities. There was no attempt on the part of this great actor to produce any forced dramatic effect. I wonder, how this could be produced so magically.

In western dramatic technique is to be found the word 'artistic economy' which means that thereshould not beany exaggeration whatsoever in the actor's movement and in his speech. Tagore's acting reminded me of the truth of this expression. There was no forced attempt to move even his eye-lids. His acting was a model book of 'artistic economy'. The deep-seated attention which is so necessary for good acting was there in a predominant degree, but I could not measure the depth then, which I, however, experienced at a later period in 1926 when 'Shodbhodh', a Tagore drama was being ready for the stage.

Satish, the hero of 'Shodbhodh' after defalcating his office money, was trying to commit suicide ; before this he tore to pieces the leaves of his garden plants with a cane. This was to be produced in a different way. Had we acted this role, it would have taken an extra dramatic turn in our hands. In order to give a correct rendering, I requested the Poet to kindly read it out to me ; I believed that dramatic action would be according to his measured reading, neither more nor less. He agreed to this and read out.

When he read the passage out, he was so much engrossed with the thought that he became unconscious about his surroundings. The agony which was rending the mind of the hero was at once portrayed. How I wished that I could express these words in the Poet's manner in order to avoid the dramatic overtones which were sure to develop. I have never seen such an attention which is prone to make us forgetful about what is going around.

Another great quality of his acting was the charm which he created and which cast a magic spell upon his hearers. Nemirovitch Danchenko, the great Russian producer said that in order to be a great actor one should possess individuality, craftsmanship, simplicity, attention and over all this charm. He wrote, "An actor may display imagination, intelligence and taste, but his influence on audience perception will stop at some point, whereas the actor with charm takes hold of the spectator completely, authoritatively. Can charm be implanted ? Can charm be acquired through training ?"

These qualities cannot be acquired by training. And he further said. "It would seem the perception of charm is much too subjective. You cannot make of this quality an object of scientific research. Still the audience almost in its entirety feels the presence or absence of charm."

This was possible, because the Poet was a great expressionistic artist and exponent of the Rasa. The general actor, either acts emotionally or acts according to situations and not according to ancient practice of Rasa ; 'Rasa' is constituted of 'Bhab', 'Bibhab' and 'Anubhab' : the Poet acted according to this 'Rasa' theory. No one can act in conformity with this 'Rasa', unless he masters Sthayi, Sanchari and Sattwik Bhab and Bibhab. Those who think that an honest endeavour will make a good actor are mistaken. Rabindranath was fully filled with this 'Rasa' or sentiment to the core and as an actor he acted accordingly. Therefore, his performance proved excellent.

'Griha Prabesh' was chosen as a play by the Star Theatre in December, 1925. I used to take one of our musicians, the organ player frequently to the Poet at his Jorasanko house to take musical notations of his songs from him for this drama. He listened to the Poet singing melodiously and frequently asked the Poet to sing again, so that he could take real and not wrong notations. The Poet did not feel at all annoyed, neither he felt tired nor embarrassed. He also gave me readings of the dialogue of my role, as Jatin, the hero of the drama. When this was done, he was apparently pleased and his eyes dazzled. He smiled and said 'good'. Dinendranath Tagore also used to come to the Star Theatre to train and check the correctness of musical notations taken by the musician. Rehearsal went on full swing. Gaganendranath Tagore directed the scenic designs. It was first played on the stage on Saturday, the 25th December, 1925. The third day of staging was 29th December, when it was notified in the press that the Poet himself was coming to witness the play. He sat on the first row and later on moved at the back and sat at the dress circle on the balcony on the first floor. When the curtain fell, I ran to the Poet and wanted to know the reaction. The Poet smiled and was apparently pleased with the play, but he jokingly remarked, "How could you play here ?—In the ground floor, there is constant noise of footsteps and above I heard the noise of tram cars. How could you concentrate in the midst of so much noise ?"

I have already referred to his deep meditative attention and his ready sympathy for us and those who went to him for learning from his own self. He asked us to come on the next day and we eagerly waited for this tomorrow to come. The next day we called at him at the appointed hour, when he discussed various problems. During this discussion he even went to change the dialogue. He asked me to call again and take it home. I went again. He added further dialogues by the margin and on the top of the page. In some pages his editings were made. This copy of the drama is still with me as an affectionate memento from the great Poet. Still further additions have been made and he created two entirely new characters, one Tukri, a little girl and another a Baishnav woman. Thus the manuscript saw many changes and additions and further changes and further additions before it was ready for the stage. I used to go to him twice or thrice in the week to keep him informed of the

performance of the drama in the Star. He also was eager to hear of it and sometimes used to ask me to see him again. He again made further additions in the dialogue of the drama, and thus the rehearsal went on. One day he was pleased to ask me, 'You have acted all along lying on your back ; were you not inclined to rise ?' I answered in the negative. We divided the play in three parts—the first part was played in a half-inclined chair, the second in a full-inclined easy chair and the third entirely lying on bed. If Jatin, the hero got up, the tragic value of the drama would have been lost. It was a semi-realistic symbolic drama. In every human being there is a poet's mind which never sees fulfilment of his desires. This is never realised and hence the tragedy. The audience could not understand the deep significance of this tragic aspect of the drama and hence the house was not at all crowded, and free and complimentary passes were freely distributed.

Rabindranath wrote as many as sixty dramas, each one differing from the others in tone and subject matter. These were diverse and varied. Hence their production would be equally diverse and varied, and so also the style of acting. His style of writing changed from book to book and what was maintained once in the beginning was discarded or remodelled in later years. The method of writing of any other dramatist will be easy to discern if we look to it with a scrutinising eye, but it is not so with Tagore because of the great range and variety of the dramatic output. In order to be perfect each one of them is to be presented and produced in a different manner and independently of all others.

THE LESSON

(*Poem Number* 94 *from Tagore's Naivedya*)

India ! Thou hast taught the sovereign
To scorn the sceptre and crown, territory and the throne,
And to wear the mendicant's garb ; thou hast taught
Thy heroes to forgive the foe at every turn in righteous
wars,
And to hold back arms, fearless of consequences.

The man of action thou hast taught to offer
In lofty detachment all his earthly desires
to Brahman the Absolute ;
And the house-holder to throw open his hearth
To neighbours, guests, kith and kin, and the shelterless.

All worldly longings thou hast tied down to self-control,
On plain living, austere and pure, thou hast put a crown
of glory.
Thou hast inspired the affluent to lasting good
through pious deeds,
To forget the petty self, and in all weal and woe
To dedicate all earthly cares ever and anon
to the Almighty.

Translated by BHABARANJAN DE

INDIAN CLASSICAL DANCES IN THE MODERN AGE

SRI BALAKRISHNA MENON

It is agreed by all that Indian Dance has achieved great reputation and fame, not only in India, but all over the world. The form of Indian Classical Dances has been transformed through the different ages, but it has not detached itself from its main currents ; the aesthetic beauty and charm of these Dances would have been lost if it had done so.

The condition of Classical Dancers was very precarious only twenty-five years back. Neither was there encouragement from the State, nor was there any appreciation from the general public. But it has completely undergone a change now. Classical Dance and its Dancers are esteemed now as national treasure. Considering the promotion of this Dance as a national duty, the Government have taken it up in their own hands and are giving adequate encouragement to the dancers.

It is said about the origin of Indian Dance that the King of the gods, Indra, once requested the creator, Bramha, to formulate such a "Veda" which will be within everybody's reach. Being requested by Indra, Bramha formulated the so-called fifth Veda. After the formulation, he first of all taught it to the Sage Bharata. The Sage Bharata produced the Dance with the 'Gandharbas' and 'Apsaras' before Mahadeva and Parvati. Mahadeva was pleased with this dance production and he ordered Tandu to teach the Sage Bharata the Tandav form of dance. In this way the Sage Bharata learnt Tandava from Tandu and then the 'Lasya' form of dance from Parvati herself. The disciples of Bharata propagated this dance throughout the world.

The Indian dance, originating from the Sage Bharata, was gradually developed into four different forms. These four forms are, Kathakali of Kerala, Bharat Natyam of Madras, Manipuri of Manipur and Kathak of Northern India. Though all these four forms originated from the 'Natya Shastra', still the characteristics of each of them are quite evident.

In one of the Sutras of the Natya Shastra, dancing, acting and music have been described as the best of the fine arts, and all these three have been blended together in *Kathakali* and possibly there are other ingredients in it. The present highly aesthetic form of Kathakali has not been achieved within a day or two. From the origin to the highest point of development, Kathakali has a history of its own. One of the current notions is that Kathakali originated through reforms of Krishna-natyam. From the stories of Kathakali borrowed from the Ramayana, it can be guessed that

the dance might have been called Rama-natyam previously. The present form of Kathakali might have been derived from the different dance forms current in Kerala such as Kudi-Attam, Jakkarkulm, Mudi-ettu, Shankhakali etc. The Stage for the performance of Kathakali is quite simple. Kathakali may be performed in a small pandal erected in front of a wide open space. Light for this performance is provided from a huge lamp made of bell-metal. The dress and make-up for Kathakali is one of its peculiarities. The dress and make-up have been designed in such a way that the Divine characters and the divine feeling of the dance may be expressed. The dress and make-up differ according to the difference in characters.

It is very difficult to appreciate Kathakali because of the gorgeous attires used in this dance. That is why in order to simplify it, the dancers of the later period brought a few changes in the dress and make-up. As a result it was possible for the general public to enjoy this dance better. Natanakalanidhi Gopinath was the first among the dancers to rectify the dress, make-up and routine period of this dance form to some extent and this the public have come to know as *Kathakali* now-a-days. But still the dancers follow the old grammar of the dancing art even now, otherwise the charm would have been lost. The hand gestures (Mudras) and the facial expressions (abhinaya) of Kathakali are still composed according to the written systems of Bharata's 'Natya Sutra' mainly. The influence of Kuth-atyam, composed on the basis of 'Natya Sutra' may be noticed to a great extent in the hand gestures and facial expressions of Kathakali. Kathakali has a language of its own and it is a mixed form of Malayaalam and Sanskrit.

A discussion on Kathakali naturally reminds us of the late Poet Vallathol. It is Poet Vallathol who has changed it to its present form. It is only for him that Kathakali has become well known outside Kerala. He dedicated his life for Kathakali and its dancers. He founded the famous Kerala Kala Mandalarm at Chermthuruthi in Kerala for the propagation of Kathakali dance.

Bharat-natyam, which was previously known as Dasi-atyam, is composed on the basis of Natya Shastra. Previously the Devadasis used to perform this dance in the Temple court-yard. In ancient times, the girls alone used to take part in this dance. Now-a-days, of course, boys learn and perform this dance as well. A dance form, called Bhagavata-Mela-Natak was current in South India in the old days and Bharat-natyam might have been developed from it. These age-old dance forms may be witnessed even today in the villages of South India.

Music has a very important role to play in Bharat-natyam. The Nattuans play the music, remaining behind the dancer and the dancer performs the dance according to the tala and raga of the music. Bharat-natyam is begun with an item called Alaripu and ends with the item called Tilana. Though much has been changed of this dance form, yet it is noticed that the main items, such as, Alaripu and Jatiswaram are very popular even now. Srimati Rukmini Devi has reformed this dance to some extent. She has attempted to re-orient it as far as she could without deviation from the main current.

Manipuri Dance Form is very popular in Assam and Bengal. The peculiarities of this dance lies in the soft movement of the limbs. Primarily this is a 'Lasya' form of dance. The gorgeous dress which is used by the dancers of this dance is very interesting. Some may well think that it is very easy to learn this dance form, but they realise how difficult this dance is only when they try to learn it from a master. Emphasis is not given on the hand gestures in the case of Manipuri dance form as it is given in the cases of Bharat-natyam and Kathakali. But the dancer has to master the movements of the limbs, because the special charm of this dance form is expressed only through the softness of the movement, Manipuri form of dancing is an essential part of the dance-dramas composed by Tagore. The aesthetic beauty of his musical composition may nicely be conveyed through the soft charming movements of the limbs peculiar to the Manipuri form of dancing.

Kathak Dance originated in Northern India. This dance form has become immensely popular now-a-days. Foot-work occupies the major part of this dance and it expresses the finest cultivation of the Tala. Previously it was limited to the Royal Courts of Northern India alone. The life-story of Sri Krishna is its main subject matter. The dancer has to recite the rhythm pattern (bole) first of all, and then he has to translate that pattern in dance. This is, no doubt, a very difficult task. No major change has been brought into this dance form. But the foremost among the rising young dancers, Gopikrishna, is trying to bring some re-orientation in it, and he is achieving success in this respect gradually. It can be hoped that this dance form will be greatly improved in the near future.

India's reputation has been established all over the world through Indian Classical Dances. The Government of India has realised it and is taking the initiative for establishing institutions in every State to impart adequate training to the dancers. It is true that one cannot qualify oneself in this subject overnight. It will take quite a long period to equip these institutions properly. First the Government will have to find out able teachers and, if necessary, loosen the strings of its purse. It is agreed that most of our dancers do not know the theoretical side as much as they are efficient in the practical side ; they must know the theoretical side as well. It is necessary to make adequate arrangements for imparting instructions in the theoretical sides of the Indian Classical Dance. I firmly believe that India's reputation will be greatly enhanced for Classical Dance through the fullest patronage of the Government.

●

PAINTING GALLERY AND EDUCATION

SAMAR BHOWMIK

> *"A large part of man can never find its expression in the mere language of words. It must, therefore, seek for its other languages—lines and colours, sounds and movements".* *RABINDRANATH*

Problem of education

It is a porblem not only to the educationists ; rather it is a social problem. The problem of education is the outcome of the modern age and is growing acuter with the march of time. Even a century ago in a time like this common men were not so vocal, and their thoughts, sentiments and attitudes had little influence upon the main course of event. But their meteoric rise to influence in this century of the common men is putting a serious strain upon the fabric of our traditional society and it is making demands upon them personally, which they are ill equipped to meet. The social revolution through which we are passing can not bear fruit in the moral and intellectual spheres until the contemporary education is tuned to contemporary needs and the common men are enabled to find a creative, balanced and happy place in the community. Many of the changes which are helpful for the fulfilment of general education of the masses have relevance to museum work. The increasing emphasis now placed upon the practical methods of learning ; the present interest in Visual education in all its forms ; the tendency to deal with broad social themes and other developments can hardly have their fulfilment within the four walls of class rooms. That is why progressive and modern educational system is shifting its emphasis to museums. As an aesthetic and practical institution of knowledge, a great responsibility of social and cultural reconstruction has fallen on the hands of the museums of art. Miniature painting galleries being part and parcel of art museums have tremendous duties for the aesthetic and appreciative development and social and cultural upliftment of the people of India.

Necessity of art education

The spreading recognition of drawing and painting as an element of education is one among many signs of the more rational views on the mental culture now beginning to prevail. In the artist society has a living reminder that despite the relentless logic of everyday life, man's capacity of dreaming still survives. Artist of the past created images significant of the necessity of his time and place, yet universal and timeless. Art education is so valuable, because education by means of art fosters

the whole development of the personality, uniting intellectual activity with physical skills, and fusing them in a creative process that is in itself among the most primal attributes of man. Very few of us are gifted enough to become great artists, but we can all benefit from experiencing the nature of artistic creations and from appreciating work of art. The necessity for these abilities is as great now as at any time, perhaps even greater in a world where physical barriers to communication are being removed so rapidly by science, whereas every channel of personal communication needs to be fostered and encouraged.

Art is often mentioned as comprising the universal language of communication, above national language and custom, race and creed, and this is clearly true in the widest cultural sense. But it will be a mistake to generalise the very nature and spiritual depth of art superficially as merely a mediun of universal communication. Appreciation of art involves its own discipline of understanding. Although the visual image and the musical sound may make immediate and emotional impression upon us irrespective of their place of origin and of where we may be, they must arise from indigenous roots and their fuller communication depends upon deeper knowledge, upon some form of education.

In India, where ancient remains stand side by side with modern buildings, a type of art exists which is neither too ancient nor modern ; this is the traditional popular art, *i.e.*, miniature painting, which has been and still is being produced by slow but subtle change constantly taking place in its forms. The continuance of this art raises a number of questions. How have the illiterate masses been able to maintain the spirit of their tradition without loss or damage ? How have they succeeded in keeping their forms virtually unchanged and yet so vividly alive and complete in their integrity ? In the modern art education what can we learn from this way of passing on the tradition ? In seeking answers to these questions we may throw some light on the worth of modern methods and on the causes of disintegration in the evolution of art forms so often found in the works of class rooms.

Producers of traditional miniature paintings draw our admiration, but their consciousness of the value of their works of art is doubted. They utilize their creative activities for bare subsistence. Their culture is narrowed but integrated. What they learn is completely due to heridity-influence. They live and work in continuous contact with their family, and so they pass on to their children, through an indirect method, all the values and essential qualities of their experiences.

In contrast to this we have school and college students who have to learn from a tradition in order to secure a basis for their creation, but with which there frequently exists a kind of dissociation in their styles or forms. They do not reach a definite conclusion. Thus they become imitators of modernists, of the academic works of their teachers and as a result they get no chance for original research.

An art teacher naturally finds himself in a sort of dilemma when he sees that the traditional artists with their limited tradition and conservative attitudes are able to reach an integration of forms, while the students, with a liberal attitude towards

change, become more confused to create integrated forms as they become more conscious of a wide variety of tradition. This is undoubtedly a crucial problem. A special painting gallery equipped with all sorts of informative materials of facts and techniques can help the teachers as well as students to overcome this difficulty.

Next comes the problem of the people who, due to various economic burdens, have forgotten the source of realisation of perfect life and philosophy, history and culture of the country in its truest sense. For all these subjective and objective upliftments, painting galleries can do a lot.

Analysis of the educational job performed by miniature painting galleries

The contributions of the museums to art education lie in various fields : on the meaning of the preservation of History in the hands of the enlightened and promotion of understanding of the romantic mind. The result of art historical research will be piling up on the models of the past. These are generally preserved but not used for the promotion of our own life. Only an evolutionary philosophy can do that, because it alone considers the sequence of styles as the object of research. Only the monument which as a pioneer out-grew tradition's way may bid fair to become valuable in the eyes of time. We have not to negate tradition but to digest and outgrow it. This would create a common bias for also the museums of natural, pre-historic and artistic evolution and bring them to a co-operative action. A nation without history is comparable to a person who has not given any proof yet of his value. If this point is justified, then the painting galleries in our country would be spots of glory without historical organisation. Such painting galleries existed and are still in existence. But we should say that these galleries do not make use of all the possibilities of an well-accomplished painting gallery. The traditional miniature painting galleries should not only give joy and some disconnected historical facts but, beyond that, should convey an understanding of the continuous growth of our cultural and social concepts of reality. Thus a gallery, which is to convey the idea of continuous growth, cannot remain passive in its display. It must bring to life the differences between the different stylistic phases and at the same time inner-convenance which opens into our time.

Written texts should support this philosophy. We need nothing so much as a united concept of the world. Only if all fields of our culture co-operate towards an integrated knowledge, shall we be able to reach a concept, and a faith which follows from it can only grow from knowledge.

●

TAGORE AND BENGALI JOURNALISM

ANIL KUMAR ROY CHOWDHURY

It is Bengal's good fortune that some of her noblest sons took to journalism at one stage of their life or another. That is the story from Raja Rammohun Roy to Ramananda Chatterjee. Of course all these men did not practise journalism for its own sake. Many took it up to further the cause of Bengali language and literature. Many more have used it as a powerful weapon against the foreign rulers or as one with which to fight our own social evils. Bengali literature as well as Bengali journalism owes a deep debt of gratitude to Bengali Journalism. Some of our great men, who have figured prominently in the field of journalism, had to depend upon it as their means of subsistence. Among the journalists of the earlier days poet Iswarchandra Gupta, Editor of Sambad Prabhakar, is one such instance. But there are many who have done the journalistic job mainly as a labour of love.

Gurudev Rabindranath Tagore more or less belongs to this latter category, so far as the actual editing of or supervising the publication of journals is concerned. What he may have got for his contributions to different journals is another matter. Rabindranath's contribution to the development of Bengali journalism in the second of these two ways is by no means less significant, for who does not remember how even in our own days the pages of prominent journals like the Prabshi or the Vichitra used to be filled, month after month and year after year, with contributions from the mighty pen of Rabindranath.

Rabindranath's association with journalism began even when he was a boy in his teens, and, if we take the term 'journalism' in a broad sense, this association continued in some form or other till the last stage of his life. Some of his earliest compositions made their appearance in Tattwabodhini, Bharati, and the Bengali edition of Amrita Bazar Patrika, all very prominent journals in the middle of the second half of the nineteenth century. The Poet was directly connected with some of these and other journals such as Balak, Sadhana, Bangadarshan (new series) and Bhandar.

Rabindranath was the Manager of Balak, a monthly journal, which was started in the Bengali year 1292 under the Editorship of Jnanadanandini Devi, wife of his brother Satyendranath Tagore. After a year the Journal ceased to be published and became merged with Bharati, then edited by the poet's sister Swarnakumari Devi. What the Poet wrote, when resigning his Managership of Balak is interesting to note. "For sometime", the Poet said, "there has been irregularity in the publication and distribution of Balak owing to the inefficiency of its Manager. The Manager, after offering apologies to the readers, is retiring. The Manager of Balak is a litterateur by profession. So he requires plenty of time. He is not, moreover, noted for

managerial efficiency or skill. He has got other responsibilities as well. So it is hoped that the readers of Balak will gracefully allow him to retire". However, apart from managerial work, Rabindranath had to contribute articles regularly to Balak as is evident from what he writes about this journal at another place : "Mejabauthakurani had a strong desire to publish an illustrated journal for children. She wanted that Sudhindra, Balendra and other boys of our family should contribute articles to this journal. But when she became Editor, she realised that the paper could not be run only with their writings. So she wanted me to take charge of articles for the Journal."

Bharati, another prominent monthly journal with which, as it has been already said, the poet was connected, was started in the Bengali year 1284. Among the Editors of this journal, at different stages of its career, were eminent persons like Dwijendranath Tagore, Swarnakumari Devi, Rabindranath Tagore himself and others. The journal could reach the great literary height that it did because the persons at its helm were no mere journalists—they were creative literary artists, whose position now is assured in the history of Bengali literature. While giving up the post of Editor of this journal Rabindranath wrote something—part of which is quoted below—which speaks of the Poet's honesty of purpose and offers good guidance to journalists in our country. The Poet wrote : "A journal may be run properly if only the Editor, giving up every other work, is prepared to look after its affairs like a vigilant helmsman piloting his boat. But the job of a journalist in our country is like that of a cow which must plough the land and also give milk—working in the field throughout the day, it has, in the evening, to yield milk which will go to the buyer mixed with some quantity of water. At this the most patient animal gasps for breath, and the buyer of milk is also dissatisfied. Only that man who can make journalism the chief object of his life may have the heart to fight constantly against heavy odds. But one who does not have the time nor the capacity to fill the columns of his journals with his own writings or does not have the endless patience or perseverance regularly to collect articles from others or does not know how to save the press from the numerous crises that it has often to face, should not hanker after the much-coveted post of an Editor." All whose desire is to pursue journalism as a career would benefit highly by these wise words of Tagore the Journalist.

Sadhana, of which Rabindranath became the Editor in the fourth year of the existence of the journal, was a monthly journal started in the Bengali year 1298. The Poet's nephew Sudhindranath was the first Editor of this journal. The Poet wrote at one place, "My nephew Sudhindranath was the Editor of this journal for three years—and in the fourth year I had to take charge of it. Most of the articles for this journal I had to write myself, and I had to look over the writings of others as well".

Tagore's association with journalism has been of immense benefit to Bengali life and culture, and particularly to Bengali literature. The Poet has contributed in a very remarkable way to the development of Bengali language and literature through journalism. The world abroad knows Tagore as a poet and philosopher. But it

will be of interest for everybody to know how Bengali journalism, like all the other aspects of Bengali life, bears the impress of the Titanic personality of Rabindranath Tagore. Shri Hemendra Prasad Ghose, the eminent Bengali journalist, has rightly pointed out that most of the writings of Tagore, coming under the category 'General Prose', tend to be argumentative, and hence journalistic. In fact, just as Tagore has served literature through journalism, so also has he served journalism through literature. The literary quality of his pen as well as the charm of his personality has raised the standard of Bengali journalism to an enviable height.

●

নেদারল্যাণ্ডের রাজকুমারী বিয়েট্রিক্সের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা

প্রথম বর্ষ ● এপ্রিল-জুন
দ্বিতীয় সংখ্যা ● উনিশ শ' তেষট্টি

১

সম্পাদক : ধীরেন্দ্র দেবনাথ

রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা

পত্রিকা পর্ষদ্

ভবরঞ্জন দে কর্তৃক সাধনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৭৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট : কলিকাতা ১২ হইতে মুদ্রিত ও ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন : কলিকাতা ৭ হইতে প্রকাশিত।

মূল্য : এক টাকা

সূচীপত্র

ENGLISH SECTION

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নব জাগরণের ইতিহাসকে বিষয় করে একটি প্রদর্শভবন স্থাপন করা। তাতে তিনটি বিভাগ থাকবে: ১। রবীন্দ্রনাথ, ২। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার এবং ৩। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মনীষিগণের কীর্তি। রবীন্দ্র ভারতীর কর্তৃপক্ষ এঁদের সম্পর্কিত প্রদর্শনের উপযুক্ত দ্রব্য সংগ্রহে আগ্রহশীল। এই মহৎকার্যের সাফল্যের জন্য সকলের সহযোগিতা এবং সক্রিয় সাহায্য কামনীয়। যিনি এই আবেদনে সাড়া দিতে ইচ্ছা করেন, তিনি অনুগ্রহ করে রবীন্দ্র ভারতী প্রদর্শভবনের অধ্যক্ষ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সহিত যেন সংযোগ স্থাপন করেন।

সম্পাদকীয়

রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। যে বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষার ঘোষণায় আমাদের পথচলা সুরু হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে আমাদের সংকল্পকে দৃঢ়তর করে তুলতে চাই। রবীন্দ্রনাথ আত্মপ্রকাশের সকল মাধ্যমকেই—তা সে সাহিত্য-সৃষ্টি হোক্, সংগীতসাধনা হোক্, নৃত্যশিল্প বা অভিনয়বিদ্যার চর্চাই হোক্, অথবা চিত্রাঙ্কন রীতির প্রয়োগই হোক্—স্বীকার করেছেন সমান প্রীতি ও শ্রদ্ধায়। তাঁর নিজের জীবনেও এ স্বীকৃতির সুপ্রচুর সমর্থন রয়েছে।

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাই শিক্ষার্থী-মনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশকেই শিক্ষা-ব্যবস্থার আসল উদ্দেশ্য বলে বিশ্বাস করে। মানুষের মধ্যে যে সৃজনশীল প্রতিভা অবিরাম তাকে নতুন থেকে নতুনতর পথে চালিত করতে চায়, এক তৃপ্তির লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই অন্য তৃপ্তির সন্ধানে ব্যাকুল করে তোলে, সেই প্রতিভার স্ফুরণ একটি মাত্র পথেই সম্ভব, এ কথা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন নি। আজকের এই অস্থির জীবন-যন্ত্রণার যুগে এ সত্যকে আমরাও তো মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। এবং বিশ্বাস করি সম্ভাবনাময় সৃষ্টিধর্মী সেই প্রাণবীজটিকে সযত্নে লালন করে তুলতে হলে আত্মবিকাশের সকল পথকেই সমান সুগম করে তোলা প্রয়োজন। আমাদের দেশের এতাবৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থায় এ সম্পর্কে কোনো সচেতনতাই লক্ষিত হয় নি। পরিপূর্ণতার উপাদান ও উপকরণকে বাদ দিয়ে তো পরিপূর্ণ মানুষ সৃষ্টি সম্ভব নয়। আর সম্ভব নয় বলেই বর্তমান যুগব্যবস্থায় অসংখ্য অসংগতি ও মারাত্মক ক্রুটী দুরারোগ্য ব্যাধির আকারে দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্র-জন্মবার্ষিকীর পরম লগ্ন আজ তাই বিশেষ দাবী করবে আমাদের কাছে। সে দাবীকে সম্মান জানাতে হবে।

আজকের শপথ-বাণী হোক্—আমাকে সম্পূর্ণ মানুষ হতে হবে, আমাকে সমগ্র মানুষ হতে হবে। তবেই দুর্যোগের কালো মেঘে যদি আকাশ কখনো ছেয়ে থাকে, পথে আলো নিভে যায়, তবু অন্তরের বিশ্বাস-আলোকে সুন্দরের অভিমুখে পথচলা আমাদের থামবে না।

নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর 'পদ্মশ্রী' সম্মান প্রাপ্তিতে নাট্যানুরাগীমাত্রেই খুশী হয়েছেন, নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করেছেন। শিল্পীর সম্মান তো শিল্পরসিকদেরই রুচি ও বোধশক্তির প্রতি সম্মান। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত থেকে তাঁর এই সম্মাননায় তিনি আমাদের বিশেষ গর্ব ও আনন্দের অধিকারী করে তুলেছেন।

শিল্পীর নিরলস সাধনায় অসংখ্য নাটকের বিভিন্ন ধরনের চরিত্রে তিনি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন একদিন। বহু বিনিদ্র রজনীর উদ্বেগ ও নিভৃত মুহূর্তের গোপন অশ্রুর মালায় তিনি দুর্লভ সিদ্ধিকে করায়ত্ত করেছেন। আর আমাদের জীবনপাত্র ভরে দিয়েছেন সেই সৃষ্টি-সুধারসে। আজ পরিণত জীবনের প্রান্তে এসে শিল্পী সেই প্রথম জীবনের আবেগ-অনুভূতি ও স্বপ্ন-কল্পনাকে প্রত্যক্ষ করছেন ধ্যাননেত্রে। আর তারই সাথে বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিপুল আয়োজনে এ যুগের অভিনয়-শিক্ষার্থীদের তরুণ চিত্ত সম্পৃক্ত করে তুলছেন। নতুন জীবনবোধ ও শিল্পচেতনা সৃষ্টির এ ব্রতে তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবন উৎসর্গ করুন—এই কামনা।

* * * * * *

সদাকত আশ্রমের নিভৃতে একটি মহৎ প্রাণের তিরোধান ঘটল। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের স্থান নির্ণয় করবেন আগামীকালের ঐতিহাসিক। নিরভিমান, নিরহঙ্কার, জ্ঞানতপস্বী এই নেতার চরিত্রে ভারতের সনাতন আদর্শ ও বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছিল। মৃত্যুতে দেহের অবসান, কিন্তু মহৎ আদর্শ তো যুগপরম্পরায় বিধৃত। এই মহাপ্রাণের আদর্শ আমাদের স্মৃতিতে, আমাদের কর্মে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

●

প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ গ্রন্থাগার

(পূর্বানুবৃত্তি)

দীপককুমার বড়ুয়া

কিন্তু সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত, সুসংগঠিত ও উন্নতধরনের বৌদ্ধ গ্রন্থাগারটি ছিল সম্ভবত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই বিশ্ববিদ্যালয় আনুমানিক ৪৫০ থেকে ১১০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সজীব ও প্রাণবন্ত ছিল।[১] বিহারের পাটনা থেকে পঞ্চান্ন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে নালন্দা ধীরে ধীরে বৌদ্ধদের হাতে এক বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোক এখানে একটি মন্দির তৈরী করান। কিন্তু শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে নালন্দা প্রসিদ্ধি লাভ করে ৪৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে। কারণ ফা-হিয়েন ৪১০খৃষ্টাব্দে যখন এখানে এসেছিলেন, তখনও পর্যন্ত এই স্থান শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত হয় নি। গুপ্তসম্রাটদের সক্রিয় সহযোগিতায় ও আর্থিক সাহায্যে নালন্দা ক্রমে ক্রমে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। শক্রাদিত্য (সম্ভবত প্রথম কুমারগুপ্ত, ৪১৪-৪৫৫ খৃঃ) এখানে একটি সংঘারামের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু আনন্দের বিষয় যে সেই প্রাচীনযুগেও নালন্দার "কর্তৃপক্ষ বুঝতে পেরেছিলেন যে একটি গ্রন্থাগারহীন সংঘারাম, অস্ত্রাগারহীন একটি দুর্গের মতোই অকেজো।[২] সুতরাং অসংখ্য ছাত্র ও শিক্ষকের চাহিদা মেটানোর জন্য একটি সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত গ্রন্থাগার স্থাপন ও রক্ষণের বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। চৈনিক তীর্থযাত্রী ইৎ-সিঙ নালন্দায় চারশ' সংস্কৃত গ্রন্থের অনুলিপি পেয়েছিলেন।[৩] এর দ্বারা মনে হয় যে নালন্দার গ্রন্থাগারে মূল্যবান সংগ্রহ ছিল। তাছাড়া যখন কোন ভিক্ষু এখানে দেহত্যাগ করতেন, তখন তাঁর পবিত্র গ্রন্থগুলি নালন্দার গ্রন্থাগারের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হতো এবং তাঁ'র অন্যান্য দ্রব্য ও অবৌদ্ধ পুস্তকগুলি দান অথবা বিক্রী করা হতো। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ধীরে ধীরে কিছুদিনের মধ্যেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিভিন্ন দানের দ্বারা এক মহামূল্য সম্পদে পরিণত হয়েছিল।[৪] যেখানে গ্রন্থাগার অবস্থিত ছিল

---

১ Gokhale, B. G. Ancient India : History and culture, p. 137

২ Altekar, A. S. Education in Ancient India, p. 121

৩ Mookerji, R. K. Ancient Indian Education, p. 574

৪ Indian Librarian, Vol. 9, No. 2, Sept., 1954, p. 54

সেই অঞ্চলকে বলা হতো ধর্মগঞ্জ।[১] সেখানে ছিল তিনটি বিরাট অট্টালিকা—তাদের নাম যথাক্রমে রত্নসাগর, রত্নদধি এবং রত্নরঞ্জক।[২] এদের মধ্যে রত্নসাগর ছিল একটি নবতলবিশিষ্ট প্রাসাদ।[৩] সেখানে সংগৃহীত হয়েছিল "প্রজ্ঞাপারমিতা" ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের অনেক মূল্যবান ও পবিত্র গ্রন্থ।[৪] একটি অনুশাসন থেকে জানা যায় যে জাভা ও সুমাত্রার রাজা বালপুত্রদেব এখানে একটি সংঘারাম তৈরী করিয়েছিলেন এবং বাঙ্গালাদেশের সম্রাট দেবপালের কাছে ঐ নূতন সংঘারাম রক্ষণাবেক্ষণ ও এখানকার গ্রন্থাগারে পুঁথি অনুলেখনের ব্যয় নির্বাহ করার জন্য (ধর্মরত্নস্য লেখনার্থম্) পাঁচটি গ্রাম যাচ্ঞা করেছিলেন।[৫] কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে এই বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারটি বিদেশী আক্রমণকারীদের হাত থেকে বেশীদিন রেহাই পায় নি। তিব্বতী ধর্মগ্রন্থ Pag-Sam-Jon-Zang-এ এই গ্রন্থাগারটির ধ্বংসের এক করুণ উপাখ্যান বর্ণিত আছে: তুরস্ক আক্রমণকারীদের ধ্বংসলীলার অবসানে মুদিতভদ্র নামে একজন ভিক্ষুর দ্বারা নালন্দার মন্দির ও চৈত্যগুলির সংস্কার করা হয়। এর কিছুদিন পর মগধরাজ্যের মন্ত্রী কুকুটসিদ্ধ নালন্দাতে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। একদিন যখন এই মন্দিরে ধর্মদেশনা চলছিল, তখন দু'জন তীর্থিক সন্ন্যাসী সেখানে উপস্থিত হলে কতগুলি অল্পবয়স্ক শ্রমণ ঘৃণাবশতঃ তাঁদের দিকে ময়লা জল ছুঁড়লে তাঁরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। সুতরাং প্রায় বার বৎসর সূর্য-উপাসনার পর তাঁরা একটি যজ্ঞ করলেন এবং যজ্ঞবেদী থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে বৌদ্ধ মন্দিরগুলি জ্বালিয়ে দিলেন। তাতে বিরাট অগ্নিকাণ্ড হয়ে রত্নদধির অমূল্য গ্রন্থসংগ্রহ সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়।[৬] এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়েই আমরা পাই ভারতে প্রথম সুসংগঠিত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার। বিদেশী ভ্রমণকারীরা নালন্দার বিরাট গ্রন্থাগার দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়েছিলেন।

কাথিওয়াড়ের ওয়ালার নিকটে ছিল প্রাচীন বলভী বিশ্ববিদ্যালয়—যেখানে ছিল আর একটি সুবৃহৎ গ্রন্থাগার। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে বলভী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছিল। ৪৮০ থেকে ৭৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মৈত্রক সম্রাটরা শিক্ষার প্রসারের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা এই গ্রন্থাগারটির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সরাসরি দান করেছিলেন। তার প্রমাণ আছে প্রথম

১ **Pag-Sam-Jon-Zang, ed. S. C. Das, p. 92**
২ **Bokil, V. P. History of Education in India, pp. 199-200**
৩ **Mazumdar, N. N. History of Education in Ancient India, p. 93**
৪ **Sankalia, H. D. The University of Nalanda, p. 63**
৫ **Epigraphia Indica, Vol. xvii, p. 310**
৬ **Vidyabhushana, S. C. Mediaeval School of Indian Logic, p. 146**

গুহসেনের দানপত্রের "সদ্ধর্ম্মস্য পুস্তকোপচয়ার্থম্" পংক্তিটিতে।[১] হিয়েন-সাঙ ও ইৎ-সিঙ দু'জনেই এই সংঘারামে থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট প্রভাব দেখতে পেয়েছিলেন।

বাঙ্গলাদেশের পালরাজা ধর্মপালের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিহারের বরগাঁও-এর নিকটবর্তী সিলাও গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার।[২] লক্ষ্য করার বিষয় যে এই গ্রন্থাগারে শুধুমাত্র পুস্তক সংগ্রহে মনোযোগ দেওয়া হয় নি, পুস্তক প্রকাশেরও যথেষ্ট ব্যবস্থা হয়েছিল। এ ছাড়া পুরাতন ও ব্যবহারের অযোগ্য অসংখ্য পুস্তকের সংস্কার বা পুনঃসংস্থাপন হতো এখানে। সুদূর তিব্বত থেকে পর্যন্ত বিক্রমশীলা গ্রন্থাগার ব্যবহারের অনুমতি প্রার্থনা করা হতো। এখানে পুস্তক অনুলেখনের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক লিপিকার নিযুক্ত ছিলেন। সাধারণত ভিক্ষু-শিক্ষকরাই এই কাজে ব্যস্ত থাকতেন। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারের[৩] অস্তিত্ব ছিল। কথিত আছে যে, বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী এই গ্রন্থাগারকে ভুলবশত দুর্গ মনে করে ধ্বংস করেন। আক্রমণের প্রাক্কালে এখানে বসবাসকারী ছাত্র ও শিক্ষকরা গ্রন্থাগার থেকে কিছু কিছু বই নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তবে তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই প্রাণ হারিয়েছিলেন আক্রমণকারীদের হাতে এবং গ্রন্থাগারটি এই সময় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। তবকৎ-ই-নাসিরীতে এই গ্রন্থাগার ধ্বংসের এক অতি করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।[৪]

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পতনের সময় বিহারের প্রাচীন ওদন্তপুরীতে আরেকটি আবাসিক বৌদ্ধ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পালসম্রাট গোপালের দ্বারা।[৫] মহাযানী বৌদ্ধ পণ্ডিত অভয়াকরগুপ্ত এখানে থাকাকালীন অনেক গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। ওদন্তপুরীর এই মহাবিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারটিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ১১৯৭ সালে বখ্‌তিয়ার খিল্‌জীর উন্মত্ত সৈন্যদের হাতে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক তারানাথ লিখেছেন যে মগধরাজ এই সংঘারামটি রক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রচুর সৈন্য ও অস্ত্র পাঠিয়েছিলেন আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য।[৬] কিন্তু শেষ পর্যন্ত এখানকার অমূল্য গ্রন্থাগারটি আক্রমণকারীদের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয় নি।[৭]

এইসব প্রখ্যাত ও উন্নত গ্রন্থাগার ছাড়াও প্রাচীনভারতে ইতস্ততঃ আরো অনেক ছোট বড়ো বৌদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা দলবদ্ধভাবে কোন সংঘারামে বা

১ Indian Antiquary, vii, p. 67 ff.
২ Reports of the Archaeological Survey of India, Vol. viii
৩ Vakil, K. S. Education in India : ancient period, p. 24
৪ Tabakat-i-Nasari (Eng. Trans. by Raverty), i, p, 552
৫ Mazumdar, N. N. History of Education in Ancient India, p. 97
৬ Taranath. History of Buddhism, trans. by, Schiefner, pp. 259-261
৭ Das, S. K. Educational System of the Ancient Hindus, p. 382

মঠে বাস করতে অভ্যস্ত। সেখানে তাঁরা আধ্যাত্মিক উন্নতি ও জ্ঞানার্জনে নিজেদের নিযুক্ত রাখতেন। তাই স্বভাবতই জ্ঞানানুসন্ধানের জন্য গ্রন্থাগার তাঁদের কাছে অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। প্রায় প্রত্যেকটি সংঘারামে অন্ততঃ একটি গ্রন্থাগার ছিল। ধারাবাহিক অনুসন্ধানের অভাবের জন্য এখনও ভারতে বৌদ্ধ গ্রন্থাগারগুলি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। এখানে আমরা যে সব গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আলোচনা করেছি, সেগুলি সবই প্রথম শ্রেণীর এবং বর্তমানের যে কোন উন্নত গ্রন্থাগারের ঈর্ষার কারণ হতে পারে। এই সকল গ্রন্থাগার ছাড়াও বিভিন্ন বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে প্রাচীন পাহাড়পুর, কান্হেরী, জগদ্দল, ধনকটক, কাঞ্চিপুর, চীনভুক্তি প্রভৃতি স্থানেও বৌদ্ধ গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন ভারতে গ্রন্থাগার বস্তুত বৌদ্ধদেরই সৃষ্টি। তাঁরাই প্রথম শিক্ষার প্রয়োজনে গ্রন্থাগার স্থাপনে ব্রতী হন। এটা ঠিক যে, মধ্য ও আধুনিক ভারতে অনেক উন্নতধরনের বিরাট বিরাট গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সময় ও সুযোগের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে গ্রন্থাগারের প্রাথমিক যুগেও বৌদ্ধ গ্রন্থাগারগুলি বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। বৌদ্ধসন্ন্যাসীরা শুধুমাত্র পুস্তক সংগ্রহ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। সেই সব অমূল্য গ্রন্থগুলিকে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের মৌলিক পরিকল্পনাও তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। যদিও আধুনিক বর্গীকরণ (classification) ও সূচীকরণ পদ্ধতি তখন প্রচলিত ছিল না, তবুও পুস্তকগুলি সুরক্ষিত ও সুপ্রচারের জন্য তাঁরা সমস্ত সম্ভাব্য উপায়ই অবলম্বন করেছিলেন। সুতরাং এইদিক থেকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ গ্রন্থাগারগুলি।

❂

লহ প্রণাম *

শ্রীপ্রণবকুমার ঘোষ

অভিনয় শুধু নয়, উদ্ভাসিত প্রজ্ঞার আলোয়
রেখেছ প্রাণের স্বাক্ষর, শিল্পীর গভীর নিষ্ঠায় ;
বেদনা-পুলকে তুমি ভরায়েছ মানব হৃদয়,
সকল যন্ত্রণা বুঝি লুপ্ত হয় সমুদ্র-সত্তায়।

জন্ম-মৃত্যু নাটকের মঞ্চ-পৃথিবীতে—
তোমার সার্থক সৃষ্টি বেঁচে রবে প্রেরণা যোগাতে॥

প্রতিভার দীপ্ত সূর্য, ছায়া নামে গোধূলি বেলাতে ;
হারায়ে সবার মাঝে, আজ চাও খুঁজিতে নিজেরে।

সম্মানিত নটসূর্য, প্রণাম তোমায়,
নাটকের ইতিহাসে তুমি রবে অম্লান, অক্ষয়।

*নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর সম্বর্ধনা-উদ্দেশ্যে লিখিত।

বিবর্তনের পটভূমিকায় নারীসমাজ

সবিতা মুখোপাধ্যায়

আজকের সমাজের দিকে তাকিয়ে নারীসমাজের যেরূপ দেখছি, তা কিন্তু শাশ্বত বা সনাতন নয়। এ হো'ল বিবর্তনের সুদীর্ঘ ক্রান্তিপথ পরিক্রমার ফলশ্রুতি। সময়ের ধাপে ধাপে পা ফেলে সমাজ এগিয়ে চলেছে শুধু পরিবর্তন নয় প্রগতির দিকে। সমাজ যে গতিশীল, এ কথা আজ দৃষ্টান্ত দিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে না।

সামাজিক পটভূমিকায় মেয়েদের কথা আলোচনা করতে হলে স্বভাবতঃই পুরুষের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। কেননা সমাজ-রঙ্গমঞ্চে নারী-পুরুষের ভূমিকা অকৃত্রিম নায়িকা ও নায়কের। নাটকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যপট বদলায়। পরিণতিমুখী ঘটনাপ্রবাহে নায়ক-নায়িকার জীবনের ছবি হয় স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষগোচর। তেমনি সমাজ-মঞ্চে নারী-পুরুয়ের জীবনের ছবি যুগে যুগে কতভাবে পরিবর্তিত হোল! বিবর্তমান সমাজ ব্যবস্থা এ পরিবর্তনের উৎস।

প্রশ্ন উঠতে পারে সমাজ হতে নারী সমাজকে এ বিচ্ছিন্নকরণ কেন? এক কথায় এ প্রশ্নের সহজ উত্তর হো'ল বিভিন্ন যুগে শ্রেণীগত ভাবে মেয়েদের নানা রূপায়ণ দেখা যায়। সামাজিক মর্যাদা নারীসমাজ চিরদিন একই ভাবে পেয়ে আসেন নি। সমাজে তাঁদের অবস্থা ও অবস্থান-ও চিরদিন এক রকম দেখা যায় নি। প্রাক্-ঐতিহাসিক সমাজ, দাস সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, ধনতান্ত্রিক সমাজ ও বর্তমান সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থায় নারী সমাজের রূপান্তর খুবই স্পষ্ট। ভিন্ন ভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থায় নারী-পুরুষ সম্পর্কের পার্থক্যটুকুও সহজেই চোখে পড়ে। বিভিন্ন যুগের উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে সামাজিক বিধিব্যবস্থা ও আইন-কানুন গড়ে উঠেছে। আর নারী-পুরুষের জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তারই ফলে।

বর্তমান প্রবন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থায় নারীসমাজের সামগ্রিক রূপের পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো। বর্তমান শতকের গোড়ার দিক অব্দি শ্রেণীগতভাবে মেয়েদের পুরুষের তুলনায় নিকৃষ্ট ভাবা হো'ত। এ ধারণার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন একজন দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক। সুতরাং তাঁদের মতামতের ধারা অনুসরণ করে আলোচনা করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

সমাজে একটা ধারণা দীর্ঘ দিন ধরে প্রচলিত দেখা যায় যে আঙ্গিক ও শারীর ক্রিয়ার পার্থক্যের জন্য নারী-পুরুষে মানসিকতার পার্থক্য আছে। এ পার্থক্য জন্মগত, বিধিদত্ত এবং অপরিবর্তনীয়। প্লেটো হ'তে ফ্রয়েড এবং আদিকালের দাস সমাজ হ'তে বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রচলিত ধারণা এই যে মানুষে মানুষে অর্থাৎ শাদা আর কালো মানুষে যেমন জন্মগতভাবে ব্যবহার ও মনোগত পার্থক্য আছে, নারী-পুরুষেও তেমনি মানসিক পার্থক্য আছে।

পুরোনো মনোবিদ্‌গণ যাঁরা মানুষকে কেবল মাত্র বায়োলজিকাল বিয়িং (Biological being)-রূপে আখ্যাত করেছেন তাঁরা মানুষের সামগ্রিক সত্তার নিয়ামক হিসেবে লিবিডো (Libido) বা জৈব শক্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁদের মতে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কও পারিবারিক সম্বন্ধ নির্ণয়ে, এমন কি মানুষের চৈতন্য-মানসের বিকাশ, ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন, বিচ্ছিন্ন ও সামগ্রিক আচরণ, বৃত্তি-নির্ণয় সব কিছুর মূলে আছে লিবিডো। সমাজের ভাঙাগড়ায়, অর্থনৈতিক বিন্যাস ও বিপর্যয়ের মূলেও আছে ব্যক্তিগত কামশক্তি। এ ছাড়া আক্রমণাত্মক ও ধ্বংসাত্মক মনোভাব ছাড়া আর সবেরও মূলে এই ব্যক্তিগত লিবিডো। এক কথায় এই সহজাত প্রথম রিপু হো'ল মানুষের সামগ্রিক সত্তার নিয়ামক। সিগ্‌মণ্ড ফ্রয়েড হলেন এ মতের প্রবর্তক ও পৃষ্ঠপোষক।

কিন্তু ফ্রয়েডের এই মত তাঁর অনুগামী শিষ্য হর্নি, ফ্রোম প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরাও আজকাল পুরোপুরি মানেন না। তাঁরা 'কালচার' ও 'সামাজিক পরিবেশের প্রভাব' কথা দুটির উল্লেখ করেছেন। অবশ্য চূড়ান্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে শেষ পর্যন্ত তাঁরা মানসিক ক্রিয়া ও চৈতন্য বিকাশের ব্যাখ্যায় জৈব শক্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।[১]

আসল কথা হো'ল মানুষের জন্মবৃত্তান্ত বায়োলজিকাল কারণে নিহিত হলেও মানুষ প্রধানতঃ সামাজিক জীব। সেদিনের গুহা মানবের যুগ হতে বর্তমানের কালান্তরের ধারাটি আলোচনা করলে দেখা যায় মানুষ চিরদিন সংঘবদ্ধ ভাবে বাস ক'রতে চেয়েছে। প্রাণী-জগতের ক্রম-বিবর্তনের ফলে লক্ষ লক্ষ বছরের চেষ্টায় মানুষ দু' পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখ্‌লো। দু'টি হাতের ব্যবহার শিখে হাতিয়ার তৈরী করলো। নিত্য-নতুন কর্মপদ্ধতি আবিষ্কার করে দুনিয়া জয়ের নেশায় মাতলো। দু' হাত ভরে আয়ত্তে আনলো প্রকৃতির সব সম্পদ। এমনি ধারা এগিয়ে চলার ফলে প্রাচীন আরণ্যক সভ্যতা গ্রামীণ এবং ক্রমে বর্তমান নাগরিক সভ্যতায় রূপান্তরিত হো'ল। নারী-পুরুষ এ পথচলার সহযাত্রী।

১ জে. ফার্স্ট—'দি নিউরটিক', প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৪

পশুত্বের স্তর থেকে মানবত্বের স্তরে উন্নয়নের মূলে প্রধান উল্লেখ্য হো'ল ভাষার বিকাশ,—দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের উন্মেষ। এ উন্মেষ রহস্যময় বা ঐশ্বরিক ব্যাপার নয়। এ হো'ল ক্রমবিবর্তনের আশীর্বাদ। নারী-পুরুষ উভয়েই এ প্রসাদগুণের সম-অধিকারী।

মানুষের সমস্ত ধ্যানধারণা, জ্ঞানবুদ্ধি, বিচারবিবেচনা দর্শন বিজ্ঞানের মূলে মস্তিষ্কের প্রথম ও দ্বিতীয় সংকেতিক স্তরের সমন্বয়-সম্ভূত বিশিষ্ট ধর্ম—উপলব্ধি। ব্যক্তির সামাজিক জীবন এই উপলব্ধির জনক। সভ্যতার যে কোন স্তরে যে কোন দেশে হোক না কেন, মস্তিষ্ক স্বাভাবিক অবস্থায় থাক্‌লে মানুষ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ক্ষমতা অর্জন করবেই। বহির্বাস্তবের পরিবর্তন উপলব্ধিকে পরিবর্তিত করে। মানুষে মানুষে বুদ্ধিমত্তার, চারিত্রিক গুণের ও মানসিকতার অন্যান্য যে পার্থক্য ও তারতম্য দেখা যায়, সেগুলি অন্তর্নিহিত বা জন্মদত্ত সূত্রে প্রাপ্ত পার্থক্য নয়। এ হো'ল সম্পূর্ণ পরিবেশগত ও আকস্মিক উদ্দীপক-সঞ্জাত পার্থক্য। এ ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষ পার্থক্যের প্রশ্ন ওঠে না।

নারী-পুরুষে আঙ্গিক পার্থক্য আছে। এ কথা সত্য যে দেহের পরিণামক্রিয়া পুরুষের তুলনায় মেয়েদের কিছু কম। নারীদেহে সম্ভাব্য উত্তর-পুরুষকে ধারণ ও পালন করতে হয় বলে মেয়েদের শারীর ক্রিয়ারও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। কায়িকশ্রমে সাধারণত পুরুষেরা মেয়েদের তুলনায় বেশি দক্ষ। (প্রসঙ্গত বলা যায় সহরজীবনে অভ্যস্ত সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান কোন ভদ্রলোক পাহাড়ী বা সাঁওতাল মেয়েদের মতো কায়িক পরিশ্রম করতে পারেন না।) কিন্তু বিজ্ঞানীরা এ থেকে মনে করেন না যে স্ত্রী-পুরুষের চরিত্র ও মানসিকতার কোনো 'গুরুতর পার্থক্য' ঘটতে পারে। অথচ গুরুতর পার্থক্য আছে—এই ব'লে নারী-সমাজকে পৃথকীকরণের প্রয়াস খুব স্পষ্ট।

নারীসমাজের আলোচনায় নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্কের বিচার-বিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্ক শুধুমাত্র জৈব কারণ দ্বারা নির্ণয় করা ভুল। মাতাপুত্র, ভ্রাতাভগ্নী, বন্ধু-বান্ধবীর মধ্যে যে কেবল জৈব সম্পর্ক নিহিত আছে গোঁড়া ফ্রয়েডপন্থী ছাড়া এ কথা কেউই বল্‌বেন না। এমন কী রোমান্টিক প্রেমও জৈব সম্পর্ক দ্বারা নিরূপিত হয় না। মানুষের রোমান্টিক প্রেমের জন্ম মাত্র সেদিন। আদিম সমাজে এ হৃদয়বৃত্তি অজ্ঞাত ছিল। মোট কথা, স্ত্রী-পুরুষের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র বা মানসিকতার কোন পার্থক্যই বিধিদত্ত, জন্মগত, শাশ্বত এবং জৈবসম্পর্ক সঞ্জাত ব'লে আধুনিক বিজ্ঞান মনে করে না।[২]

সমাজকে বুঝতে গিয়ে পাভলভের পূর্বসূরীরা দ্বান্দ্বিক বিচারপদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। পাভলভের বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞান প্রাকৃতবিজ্ঞানের সমগোত্র—বিষয়গত (Objective) পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে পুষ্ট। এ মনোবিজ্ঞান মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের ওপর

২ 'লিয়নটাইলার'—সাইকলজি অফ হিউম্যান ডিফারেন্সেস; চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রতিষ্ঠিত। পাভলভ পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে গুরুমস্তিষ্ক কেবলমাত্র বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা গ্রন্থি ও আন্তর্যন্ত্রকে পরিচালিত করে তাই নয়, মানুষের সামগ্রিক আচরণ ও ব্যবহারেরও নিয়ামক এই গুরুমস্তিষ্ক। আধুনিক শারীরবৃত্তবিদ্‌রা বলেন সামাজিক বা পরিবেশগত উদ্দীপক মানুষের গুরু মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করে আর শারীর-ক্রিয়াকে নিয়ত প্রভাবিত করে। গুরুমস্তিষ্কে ইন্দ্রিয় মারফত বহির্জগতের প্রতিফলন থেকে সমস্ত রকমের মনন-ক্রিয়ার এমন কী চৈতন্যেরও উদ্ভব। মানব চরিত্র বা তার ব্যক্তিত্বের জটিলতা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে গেলে কেবলমাত্র সহজাত প্রবৃত্তির দোহাই পাড়লে চ'লবে না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রভাবকে স্বীকার করতেই হবে। মানুষের চিন্তা, ভাবনা, অনুভূতি—এ সমস্তই তার সামাজিক অভিজ্ঞতার ফল। শুধু মস্তিষ্ক-কোষের স্পন্দন দিয়ে এই চিন্তা ভাবনার হদিস মেলে না। বিশেষ স্থান-কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ সামাজিক অবস্থানের ওপরই এই সব চিন্তা-ভাবনা-অনুভূতি নির্ভর করে। মোটামুটি মানুষের সমস্ত অভিজ্ঞতাই সামাজিক, অভিজ্ঞতা। মনস্তত্ত্ব সামাজিক মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বারা নিরূপিত।

পাভলভের মস্তিষ্কাশ্রিত মনোবিজ্ঞান মানুষে-মানুষে বা নারী-পুরুষে জন্মগত বা সহজাত বৈষম্য যে অবাস্তব নানা দিক দিয়ে তা' প্রমাণ করেছেন।[৩]

পাভলভ-বিজ্ঞানের তথ্যপ্রমাণ দিয়ে একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে ঃ 'এ সাইকলজি হুইচ্ মেকস্ ইনবর্‌ন ইনস্‌টিঙ্কট্‌স্ সেণ্ট্রাল, অর ওয়ান হ্বাট ষ্ট্রেসেস্ ইনেট ইনটেলিজেন্স (আই. কিউ) সারভ্‌স্ দি পারপস ···অল পিপ্‌লস্ আর এনডাউড্ উইথ দি সেম এসেনসিয়াল নার্ভাস এ্যাপারেটস্ ফর দি ডেভলপমেণ্ট অফ কনসাসনেস এ্যাণ্ড হিউম্যান নেচার জেনারেলি। অ্যাকর্ডিং টু দিস সায়েন্টিফিক সাইকলজি দেয়ার আর নো ইনেট ডিফারেন্সেস্ ইন দি হায়ার নার্ভাস মেকানিজম্‌স্ অফ ক্লাশেস্, রেসেস, নেসনস্ অর দি সেক্সেস ·····দি ডকট্রিন অফ ইনেট সুপিরিয়রিটি অফ মেন ওভার উইমেন, মেল সুপিরিয়রিটি ইজ এ মোষ্ট এফেক্‌টিভ কমপ্লিমেণ্ট টু দি ডকট্রিনস্ অফ ক্লাশ, ন্যাশনাল এ্যাণ্ড রেসিয়াল সুপিরিয়রিটি।"[৪]

বিবর্তনের ধারায় নারী-সমাজের রূপান্তরটুকু এবার বিচার করে দেখা যাক। কোনো কোনো দেশে সমাজ-ব্যবস্থায় যেমন হাজার হাজার বছর ধরে পুরুষকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়েছে তেমনি বহু আদিম সমাজে নারীকেও বীর্যময়ী ও মহীয়সী ভাবা হো'ত।[৫]

৩ কে. এম. বিকভ—নিউ ডেটা অন দি ফিজিওলজি এ্যাণ্ড প্যাথলজি অন দি সেরেব্রাল করটেক্স, (১৯৫৩)

৪ এইচ. কে. ওয়েলস—পাভলভ এ্যাণ্ড ফ্রয়েড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৮০

৫ রবার্ট ব্রিফো—দি মাদারস্, পৃঃ ৩০৭

নরনারীর সম্পর্ক ও তাদের চারিত্রিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য সামাজিক উৎপাদনের ও বণ্টন-ব্যবস্থায় তাদের পারস্পরিক অংশ গ্রহণের ওপর নির্ভরশীল—একথা ইতিহাসসম্মত।[৬] সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন আদিম কৃষিনির্ভর সমাজে অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরাই ছিলেন প্রধান উৎপাদক। তাঁরাই চাষ আবাদ করতেন, খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ করতেন, মৃৎপাত্র নির্মাণ ও বস্ত্র বয়ন করতেন। শিশুদের লালনপালন ও শিক্ষার দায়িত্বও ছিল এঁদেরই হাতে। সব রকম সামাজিক কাজে এঁদের ছিল অপ্রতিহত প্রভাব। এঁরা ছিলেন পরিবারের প্রধান, ধর্মকার্যের পরিচালক এবং সম্পত্তির মালিক। সমাজ তখন ছিল মাতৃপ্রধান। লাক্ষা দ্বীপের একটি অঞ্চলে আজও মাতৃপ্রধান সমাজব্যবস্থা প্রচলিত। কেরালার কয়েকটি সম্প্রদায়ে এখনও সম্পত্তির উত্তরাধিকার ব্যাপারে মাতৃপ্রধান নীতি চলে। ব্রিফোর বইটিতে মাতৃপ্রধান সমাজের প্রচুর বিবরণ পাওয়া যায়। মহাভারতে শান্তিপর্বে ভীষ্মের উক্তির মধ্যে সে কালের সমাজব্যবস্থার পরিচয় মেলে।

কালক্রমে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে পিতৃপ্রধান সমাজের সূচনা হো'ল। উৎপাদনব্যবস্থার কর্তৃত্ব এলো পুরুষের হাতে। রাজনৈতিক, আইনগত ও ধর্মগত অধিকার ব্যাপারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিলো। বিবাহবিধি পরিবর্তিত হো'ল। নৈতিক মানদণ্ডের নব-মূল্যায়ন করা হো'ল। তাতে নারী হো'ল বিজিত এবং ধরে নেওয়া হোল শারীরিক, চারিত্রিক ও বুদ্ধিগতভাবে পুরুষ অপেক্ষা হীন বলে সামাজিক বিধি-ব্যবস্থায় তাদের স্থান হবে পুরুষের নীচে। বাইবেলের আদম-ইভের গল্প পুরুষ-দম্ভের একটি নিদর্শন।

ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনব্যবস্থায় অপরিহার্যরূপে নারীকে অংশ নিতে হয়েছে। প্রাক্-ভিক্টোরিয় যুগের তুলনায় মেয়েদের অবস্থার উন্নতি অনস্বীকার্য। বিবাহ-বিচ্ছেদ মেয়েদের প্রয়োজনে সহজ হয়েছে। ভোটাধিকার অর্জন করেছে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার ব্যাপারে কিছু সুবিধে পেয়েছে। কিন্তু শ্রেণী হিসেবে এখনও নারী পুরুষের দ্বারা শোষিত, অবহেলিত ও নিপীড়িত। রাজনৈতিক কারণে নারীচরিত্রের অপকর্ষ প্রচার করা হয় অনেক পুঁথি-পুস্তক-প্রবন্ধে। জার্মান লেখক এমিল লুডউইকের 'ওম্যান এ ভিণ্ডিকেসন' খেয়ালী রচনা নয়।

আমেরিকার মতো অগ্রসর দেশেও মেয়েরা রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক কোন ব্যাপারেই পুরুষের সমান মর্যাদা পান না। ১৯৫০ সালে আমেরিকার শিল্পপতিরা একই কাজের জন্য মেয়েদের পুরুষের তুলনায় কম মাইনে দিয়ে প্রায় পাঁচ বিলিয়ন ডলার

৬ বার্নস্টাইন—এঙ্গেলস্ অন দি ফ্যামিলি, সায়েন্স এ্যাণ্ড সোসাইটি, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৪৮) পৃ: ৪২

বেশি লাভ করেছেন। রাজনৈতিক ক্ষমতাও এখানে অনেকটা সীমিত। আমেরিকান কংগ্রেসে স্ত্রী-সভ্যসংখ্যা আঙুলে গোনা যায়। ইংলণ্ডের পার্লামেন্টেও নারী-সভ্য সংখ্যা নগণ্য। পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে শিল্প, বিজ্ঞান বা দর্শন ও অন্যান্য সৃজনমূলক কাজে বা মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে পুরুষের অবদান বেশী। কারণ নারী-সমাজ উপযুক্ত সুযোগ লাভে বঞ্চিত। এ-দিক দিয়ে ভারতবর্ষ অনেক এগিয়ে গেছে। সিংহল দেশ শ্রীমতী বন্দরনায়েকের প্রধান-মন্ত্রিত্ব স্বীকার ক'রতে কুণ্ঠিত হয় নি।

সোভিয়েত ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নারীসমাজ আজ বিবর্তনের ধারায় সার্থকতার গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে উপনীত হয়েছে। সোভিয়েত সংবিধানের একশো বাইশ ধারায় বলা হয়েছে—"অর্থনৈতিক, সরকারী, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে মেয়েদের পুরুষদের তুলনায় সমান অধিকার দেওয়া হইল।" এখানে শিক্ষা-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ললিতকলা, শিল্প-স্থাপত্য প্রভৃতি সকল বিভাগেই মেয়েরা যোগ্যতা অনুযায়ী প্রতিভা-বিকাশের সক্রিয় সহযোগিতা ও সমান সুযোগ পেয়ে থাকেন। এখানে শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক ও টেক্‌নিক্যাল বিভাগ, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগ, শ্রমশিল্প, জাতীয় গবেষণা—ইত্যাদি সকল বিভাগে নারীজাতির যোগ্যতা ও বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনার ব্যাপারে সমকক্ষতা প্রমাণিত হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে আজও শ্রেণীগত ভাবে মেয়েদের পেছিয়ে থাকার মূলে রয়েছে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বিধিব্যবস্থা। মেয়েদের সহজাত কোন ত্রুটি এর জন্য দায়ী নয়।

টেক্সাস, ফ্লোরিডা, নেভেডা, ক্যালিফোর্নিয়া প্রভৃতি আমেরিকার অনেকগুলি রাষ্ট্রে মেয়েদের সামাজিক, রাজনৈতিক, আথিক ও আইন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সুযোগ-সুবিধা ও ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত করে চুয়াল্লিশটি পীড়নমূলক আইন প্রচলিত আছে। (দ্রষ্টব্য ঃ নিউইয়র্ক টাইমস্, একাদশ সংখ্যা, ১৯৬১)

গত ১৯৬১ সাল পর্যন্ত ইতালি, রোম, জেনোয়া, টিউরিন প্রভৃতি সহরে শ্রমিক-মহিলাদের বিয়ে ক'রলেই চাকরিতে ছাঁটাই-এর নোটিশ দেওয়া হোত (নিউইয়র্ক টাইমস্, একাদশ সংখ্যা, ১৯৬১)। গত বছর থেকে এ-ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এটা সেখানকার নারী-সমাজের উন্নতির লক্ষণ।

লজ্জা, সংকোচ, অতিনমনীয়তা ইত্যাদি একদিন নারী-চরিত্রের বিশিষ্ট গুণ বলে স্বীকৃত হোত। কাব্যে, উপন্যাসে, গল্পে নারীকে তেমনি কমনীয়-রমণীয় করেই চিত্রিত করা হোত। পুরুষ নারীকে দেবী কল্পনা করে কাব্য-কুসুমের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছে। নয় তো নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব মনে করে অনুকম্পা করে প্রভুত্ব-স্থাপনে প্রয়াসী

হয়েছে। ছায়া-ছবি, রেডিও বা সাময়িক পত্র-পত্রিকায় মেয়েদের এই চিত্র হামেশাই নজরে পড়ে। তথাকথিত বাস্তববাদী সাহিত্যে আধুনিক মেয়ের যে ছবি আঁকা হয় এবং ব্যবসাদারী বিজ্ঞাপনে নারী-দেহকে যে ভাবে উপস্থাপিত করা হয় তা এতই ন্যক্কারজনক যে তার উল্লেখ পর্যন্ত সভ্য রুচির বিরোধী।

আজ উৎপাদনব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী আধুনিক মেয়েদের মধ্যে তথাকথিত 'নারীসুলভ' গুণের বদলে 'পৌরুষ'-এর উন্মেষ ঘটতে দেখা যাচ্ছে। সনাতনপন্থীরা এতে আতঙ্কিত। তবু পরিবর্তনের ঢেউ ঠেকানো যাচ্ছে না। পুরোনো মনস্তাত্ত্বিকরা নারী-পুরুষের মধ্যে সহজাত জৈবকারণ-সম্ভূত মানসিক বৈষম্যের যে সীমা টেনেছিলেন আজ তা' লুপ্তপ্রায়।

নারী-পুরুষের বৈষম্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন। উচ্চবিত্ত ও বস্তিবাসী শ্রমজীবী সমাজে নারীর মর্যাদা, দাবী ও প্রাধান্য মধ্যবিত্ত সমাজের নারীদের থেকে অনেক বেশী। আবার মধ্যবিত্ত সমাজে যেখানে স্ত্রীকে রুজি-রোজগারের জন্য বাইরে যেতে হয় ও পুরুষের সঙ্গে মিশতে হয়, সেখানে স্বামীর কর্তৃত্বাভিলাষ অনেকটা সঙ্কুচিত।

নৈতিক চরিত্রের মান নির্ণয়েও পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে ভিন্ন ব্যবস্থা। সতীত্ব নারীর বেলায় অপরিহার্য। মধ্যবিত্ত সমাজে যে কোন কারণে একবার পদস্খলন ঘটলে নারীকে তলিয়ে যেতে হয়। পতিতার সংখ্যা বাড়ে। পক্ষান্তরে পুরুষকে নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য কোন মূল্য দিতে হয় না। পুরুষ-প্রধান সমাজের এই ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের মধ্যে শোষক ও শোষিতের ভাব দেখা দেয়। তাদের সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকে না। তাই প্রেম ও বিশ্বাসের পাশাপাশি দেখা যায় ভয় ও অবিশ্বাসের ছায়া—সামাজিক বৈপরীত্যের মানসিক প্রতিফলন। সংবিধানের সংস্কার সাধন করে নারীসমাজের ন্যায্য প্রাপ্য দেওয়া যায় না। সমাজের আমূল পরিবর্তন ছাড়া এ রূপান্তর সম্ভব নয়। একদা লেলিন বলেছিলেন ঃ "দি প্রোলেতেরিয়েত ক্যান নট উইন কমপ্লিট ফ্রিডম আনলেস ইট এ্যাচিভস্ দি ফুল ইমানসিপেনসন অফ উইমেন। দিস উইল বি এ লং ষ্ট্রাগ্‌ল্, নেসেসিটেটিং রি-কন্‌স্ট্রাকসন অফ বোথ সোস্যাল টেকনিক্‌স্ এ্যাণ্ড মরালস্।"

সেই দীর্ঘ সংগ্রামের দিন বিশ শতকের এই পর্যায়ে সমাপ্তপ্রায়। এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় নারীর অন্তর্মুখীনতা বা ঐচ্ছিক পারিবারিক গণ্ডীবদ্ধতার মূলে রয়েছে পরিবেশ ও সংস্কারের প্রভাব। এ কথাও ঠিক যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই মনোজগতের পরিবর্তন হয় না। যে সব ধ্যান-ধারণা বদ্ধমূল ও অভ্যাসিক সংস্কার হয়ে ওঠে সেখানে মানসিক বিপ্লব সময়সাপেক্ষ।

রবীন্দ্রনাথ একদা চিত্রাঙ্গদার মুখ দিয়ে বলেছিলেন—

"নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।
পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে সে নহি নহি,
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সংকটে সম্পদে—
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হ'তে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।"

এ-কথার প্রমাণস্বরূপ এখন স্ত্রী-পুরুষকে শুধু সহধর্মিণী নয়, সহকর্মিণী রূপেও দেখ্‌তে পাচ্চি। নতুন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে মানিয়ে নেবার তাগিদে মেয়েদের চরিত্রে ও মানসিকতায় নবতর গুণের বিকাশ হচ্ছে। আপেক্ষিক বিচারে নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্রে সমকক্ষতা প্রমাণিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়।

মানব-সমাজের বিবর্তন ও পরিবর্তন নারী-সমাজকেও প্রভাবিত করেছে। বিবর্তনের ধারায় প্রভাবিত হয়ে নারী-সমাজ আজ বর্তমান পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। নারী-সমাজের নব-মূল্যায়নের ভিত্‌ সম্পূর্ণ। তাঁরা আজ ধ্রুপদী মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

●

রক্তকরবী নাটকের মুখ্য প্রতিপাদ্য

ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য

যদিও রক্তকরবী নাটকের প্রস্তাবনায় (১৩৩১ সালে লিখিত কবির একটি অভিভাষণ) নাট্যকার "পালাটার ভিতর থেকে একটা গূঢ় অর্থ খুঁটিয়ে বের করবার চেষ্টা" করতে—"গোপনে যে অর্থ আছে তার ঝুঁটি ধরে টানাটানি" করতে নিষেধ করেছেন, তবু,—কৌতুককর ব্যাপারই বলতে হবে,—নাটকখানি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই নাট্যকার স্বয়ং এবং প্রবীণ নবীন সমালোচকগণ ঐ গোপন অর্থের ঝুঁটি ধরে হদ্দমদ্দ টানাটানি করে এসেছেন। এখনও টানাটানি বন্ধ হয়নি—একাধিক সমালোচনা-গ্রন্থ ও প্রবন্ধ তার বড় প্রমাণ। এই সব সমালোচনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করবার কোন ইচ্ছা বা প্রয়োজন নেই, কারণ এই আলোচনার অধিকাংশই কবি-কৃত প্রস্তাবনারই অনুলেখন অথবা সম্প্রসারণ, অথবা কোন স্বাধীন চিন্তাশীল সমালোচকের মৌলিক চিন্তার চর্বিতচর্বণ এবং অনেক ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সমালোচকের নাম উল্লেখ না করেই অন্যের চিন্তাকে—'আমার মনে হয়' চালিয়ে দেওয়া। এই সমস্ত সমালোচনাকে শ্রেণী বিভক্ত করতে গেলে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে সেই সব সমালোচনা যাতে এই কথাই জোরের সঙ্গে প্রমাণ করা হয়েছে যে নাট্যকার রক্তকরবী নাটকে মানবাত্মার স্বাভাবিক সৌন্দর্য-তৃষ্ণার, আনন্দবোধের এবং প্রেমতৃষ্ণার ব্যাকুলতাকেই ব্যক্ত করেছেন—সৌন্দর্য-আনন্দ-প্রেমানুভূতিকেই মুক্তির আসল উপায় ব'লে প্রচার করেছেন। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে সেই সব সমালোচনা যাতে দেখানো হয়েছে যে রক্তকরবী নাটক মুখ্যতঃ একখানি সমাজ-সমস্যার নাটক—শোষণজীবী সভ্যতার বা পুঁজিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা।

প্রথম শ্রেণীর সমালোচকরা দেখাতে চেয়েছেন—রবীন্দ্রনাথ মানুষের মুক্তির সমস্যাকে মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে সমাধান করতে চেষ্টা করেছেন, দেখিয়েছেন—সৌন্দর্য-আনন্দ ও প্রেমের ভিতর দিয়ে প্রাণের যে মাধুর্য ব্যক্ত হয় সেই মাধুর্যের উপলব্ধিতেই মুক্তি এবং তার অভাবেই বন্দী দশা—স্বভাবের বিকৃতি। অন্য পক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর সমালোচকরা দেখাতে চেয়েছেন এই নাটকে নাট্যকার মানবের মুক্তি-সমস্যার সমাজনৈতিক

তথা বাস্তবিক সমাধান দিয়েছেন, বলতে চেয়েছেন—জীবনে সৌন্দর্য-আনন্দ-প্রেমকে অবাধ প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্যই পীড়ন ও মৃত্যু তুচ্ছ ক'রে শোষণ-পীড়নের বন্দিশালা ভাঙতে হবে এবং যে শক্তিমদমত্ত শোষক প্রাণের রস নিংড়ে নিয়ে মানুষকে অমানুষে পরিণত করেছে, সেই শোষকের শক্তিদম্ভের বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রাম ক'রেই তবে মুক্তি অর্জন করতে হবে এবং ঐ বিপ্লবের সাহায্যেই জীবনের হারানো সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রেমকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে।

এই দুই শিবিরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি রক্তকরবী-নাটকের মুখ্য প্রতিপাদ্য সম্বন্ধে নতুন করে আলোচনা করতে চাই এবং তা করতে চাই—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই। বাহ্যিক সাক্ষ্য বলতে আমি নাট্যকারের অভিভাষণ, প্রবন্ধ এবং মন্তব্যাদি এবং আভ্যন্তরিক সাক্ষ্য হিসাবে রক্তকরবী নাটকের বৃত্ত, চরিত্রকল্পনা এবং নাটকের উপসংহার বা 'রুট এ্যাকৃশন'কে গ্রহণ করছি।

এই প্রবন্ধে আমি প্রথমে নাট্যকারের নিজের মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করছি এবং পরে ঐ সব মন্তব্য রক্তকরবী নাটকের বৃত্তে কি পরিমাণে প্রযোজ্য তা' বিচার করতে চেষ্টা করছি। নাট্যকারের নিজের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়—রক্তকরবী নাটকের প্রস্তাবনায়, যাত্রী-গ্রন্থে রক্তকরবী প্রসঙ্গের আলোচনায় এবং "ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান" পত্রিকায় লেখা ইংরাজি প্রবন্ধে। প্রথমে দেখা যাক নাট্যকার রক্তকরবী নাটকের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে প্রস্তাবনায় কি কি কথা বলেছেন। প্রস্তাবনায় (১৯২৪) তিনি যে-সব কথা বলেছেন তা' থেকে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করতে পারি।

(ক) কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে যে বিষম দ্বন্দ্ব আছে, এই নাটকে সেই দ্বন্দ্বই উপস্থাপিত হ'য়েছে। আহরণ বা শোষণজীবী সভ্যতায় কি করে মানুষ শোষণে পীড়নে জর্জরিত ও লাঞ্ছিত হয়, শোষক এবং শোষিত উভয় শ্রেণীই কি ভাবে মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে এবং 'কলিযুগের রাক্ষসের' সঙ্গে 'কলিযুগের বানরের' যুদ্ধ ও রাক্ষসের পরাজয়ের ফলে মানবতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়—এই নাটকে তাই প্রতিপাদিত হয়েছে।

(খ) এই আকর্ষণজীবী বা শোষণজীবী সভ্যতারই প্রতীক হচ্ছে রক্তকরবী নাটকের রাজা। ত্রেতাযুগের বহুসংগ্রহী বহুগ্রাসী রাবণের মতোই সে অমিতশক্তির অধিকারী—বৈজ্ঞানিক শক্তিতে শক্তিমান্। বৈজ্ঞানিক শক্তিবলেই সে অবাধে শোষণ ও পীড়ন করে।

(গ) দশানন রাবণ নানা দেশের ধন হরণ করে এনে 'স্বর্ণলঙ্কা' গড়েছিলেন, এই রাজাও পাতালে সুড়ঙ্গ খোদাই করে মাটির-নীচে-পোঁতা ধন হরণ করতে নিযুক্ত। এই

রাজার স্বর্ণলঙ্কার চূড়া রাবণের স্বর্ণলঙ্কার চেয়েও উচ্চতর এবং 'হাজার জায়গায় তার হাজার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হয়ে আছে'। অর্থাৎ স্বর্ণলঙ্কা আজ আর একটি জায়গায় সীমাবদ্ধ হয়ে নেই, দেশে দেশে এই স্বর্ণলঙ্কা গড়ে উঠেছে। "বস্তুতঃ পৃথিবীর নানা স্থানে নানা স্তরেই স্বর্ণলঙ্কার চিহ্ন পাওয়া যায়।"

(ঘ) এই শোষণজীবী সভ্যতা চিরকাল টিঁকে থাকতে পারবে না, একদিন ধর্ম জেগে উঠবেই। মানুষ আপন মনুষ্যত্বের গৌরব ফিরে পেতে চেষ্টা করবেই। কলিযুগের রাক্ষস ভিতর-বাহিরের দ্বন্দ্বে একদিন ভেঙ্গে পড়বেই এবং মানবতা তার ভারসাম্য ফিরে পাবেই।

(ঙ) এই রাক্ষসের একদিকে অর্থাৎ ভিতরে চলবে অন্তর্দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে দেখা দেবে তীব্র বহির্দ্বন্দ্ব। কাল পূর্ণ হ'লে শোষিত-পীড়িতদের মরা প্রাণের গাঙে জোয়ার আসবে, মুক্তির জন্য তারা মরিয়া হ'য়ে উঠবে এবং শেষপর্যন্ত সব শক্তিকে এক করেও কলিযুগের রাক্ষস কলিযুগের বানরদের হাতে পরাস্ত হবে। শোষণ-পীড়নের অবসানে যক্ষপুরীর স্থানে লক্ষ্মীপুরী প্রতিষ্ঠিত হবে।

(চ) এই 'পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি'। চিত্রপটে যে দানবের পটভূমিকা রয়েছে তা' "মানবের মহিমা উজ্জ্বল করে ধরবার জন্যেই।" অর্থাৎ নাটকে নন্দিনীর দ্বন্দ্বই উপস্থাপিত হয়েছে। শোষণজীবী সভ্যতার কবল থেকে মানবতাকে উদ্ধার করবার জন্য মানবী নন্দিনী যে সংগ্রাম করেছে সেই সংগ্রামের মধ্যেই নাট্যরস রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, যাত্রী গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবী নাটকের প্রসঙ্গে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করা যাক্। সেখানে লিখেছেন—"নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায় তা'হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলই পীড়া দেয়, পীড়িত হয়। এই ভাবটা আমার রক্তকরবী নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশী, ভুলেছে—প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে। এমন সময় সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল। প্রাণের আবেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপরে, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার

বন্ধনজালকে।* তখন সেই নারী-শক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙ্গে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।"

তৃতীয়তঃ, "দি ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান" পত্রিকায় এবং "দি বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি" পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে নাট্যকার যা যা বলেছিলেন তা এখানে অনুবাদ করে সাজিয়ে-গুছিয়ে দেওয়া যাক।

(ক) এই নাটকের 'নির্দিষ্ট অর্থ' আছে এবং সে তত্ত্বকে অবশ্যই সাহিত্যে প্রকাশ করা চলে।

(খ) এমন সময় ছিল যখন প্রতিবেশীর সঙ্গে আমাদের অধিকাংশ ব্যবহার ব্যক্তিগত আচরণের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সমাজ-জীবনে ব্যক্তি ও সমাজসংস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল। ফলে সাহিত্যেও ব্যক্তি-সম্পর্কের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মুখ্য স্থান অধিকার করে ছিল। কিন্তু আজ জীবনে সংঘের বা দলের প্রাধান্য ঘটেছে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের চেয়ে প্রয়োজন সিদ্ধ করার দিকেই—স্বার্থসিদ্ধির দিকেই—সংঘের লক্ষ্য বেশী। সেই কারণে সংঘে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বিলুপ্ত করে দিয়ে, দলের সমস্ত সভ্যকে এক ছাঁচে ঢালাই করা হয়। কিন্তু ব্যক্তি-মানুষ কখনই মরে না, সংঘবদ্ধ মানুষের বা দলের চাপে কেবল আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। আজ পৃথিবী দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে; তার এক ভাগে রয়েছে—'জ্যাক'—ব্যক্তি-মানুষ, অন্য ভাগে রয়েছে—'জায়ান্ট'—সংঘবদ্ধ মানুষ—প্রকাণ্ড একটা প্রতিষ্ঠান বা তন্ত্র (জায়গান্টিক সিস্‌টেম্)।

(গ) ইয়োরোপীয় সমাজ-ব্যবস্থায় সংঘশক্তি যে আজ এত প্রাধান্যলাভ করেছে তার মূলে রয়েছে—বিজ্ঞান। জানি না ইয়োরোপ এ সম্বন্ধে কি ভাবছে। তবে এ কথা ঠিক তার সবলচিত্ত 'জ্যাক' সংঘশক্তির চাপের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে।

কিন্তু মূক এশিয়ার পক্ষ থেকে আমি বলতে পারি—পাশ্চাত্যের ভয়ংকর অস্তিত্ব আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। তাদের আচরণে মানবিকতার স্পর্শ কমই আছে; পারস্পরিক ব্যবহারে তার যেটুকু পরিচয় পাচ্ছি তাতে শুধু এই কথাই মনে হয়—সে হচ্ছে একটা বিরাট শক্তি যে শুধু বিশ্লেষণ করতে ও জানতে চায়, কিন্তু সহানুভূতি দিয়ে কিছু বুঝতে চায় না, যে অসংখ্য অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে শুধু পীড়ন করে এবং শোষণ করে কিন্তু প্রশান্ত চিত্তে উপলব্ধি ও আনন্দ করতে পারে না।

ইয়োরোপীয় সভ্যতার নামে এই সংঘবদ্ধ লোভের রিপুটিই আজ চারদিকে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। এই ধরনের সংঘবদ্ধ লোভের মধ্যে মানুষের প্রকৃত মহদ্ধর্ম কিছুই থাকে না, এ ভয়ংকর প্রকাণ্ড রূপ ধারণ করে, এর ব্যক্তিগত পরিচয়—জটিল জালের

আবরণে—বৈজ্ঞানিক বিধিব্যবস্থায় আচরণে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সে মানুষের স্পর্শ এড়িয়ে থাকতে চায়—জাতিগর্বের ও শক্তিদম্ভের প্রাচীর তুলে দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে থাকে। অদৃশ্য অশরীরী চাপে সে আমাদের প্রাণের রস শুষে নিচ্ছে, আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। একদিন আমাদের জনগণকে একজন আকবর বা একজন ঔরংজীবের সঙ্গে লড়তে হয়েছে, আজ লড়তে হচ্ছে একটি সংঘবদ্ধ লোভের বিরুদ্ধে—যে লোভের উদ্দেশ্য ভয়ংকর ও সরল, যার প্রক্রিয়া অতি জটিল। এর প্রতিনিধি তিনি লর্ড বার্কেনহেড বা লর্ড কার্জন যিনিই হোন, কখনও আমাদের রক্ত-মাংসে-গড়া প্রতিবেশী হ'তে পারে না, তাঁরা আমাদের কাছে কতকগুলি অশরীরী সত্তা—কাছে থেকেও দূরবর্তী, সুতরাং ভয়ংকর।

(ঘ) অতএব, যে মহাদেশ ইয়োরোপের এই ভয়ংকর কালোছায়ার করাল গ্রাসে পড়েছে সেই মহাদেশের কোন কবি যদি তাঁর নাটকে সেই ছায়াকে প্রধান চরিত্র করে রূপ দেন তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। এ লেডি ম্যাকবেথ প্রভৃতির মতো কোনো ব্যক্তি নয়, এ হচ্ছে নিয়তির মতো নৈর্ব্যক্তিক শক্তি। আমি মনে করি—যে লোভাতুর উদ্দেশ্য বিজ্ঞানকে বাহন ক'রে আমাদের জীবনের সমস্ত ফসল পদদলিত ক'রে অবাধে বিচরণ করছে সে এমন কোন তত্ত্ব নয় যাকে রসরূপ দেওয়া চলে না। এর তপ্ত নিশ্বাস আমাদের গায়ে এসে লাগছে, এর স্পর্শে আমাদের আত্মাকে সংকুচিত করে দিচ্ছে। মানব ইতিহাসের নাটকে আজ এই হচ্ছে প্রধান নায়ক। আমি মনে করি আমার নাটকে তাকে রূপ দেওয়ার অধিকার আমার আছে এবং সেই রূপ দিয়েছি আমি রাজনৈতিক কর্মীর অভিপ্রায় নিয়ে নয়, কবির বিশেষতঃ গীতিকবির অভিপ্রায় নিয়েই।

(ঙ) সমালোচকরা সকলেই স্বীকার করেছেন,—নন্দিনী ব্যক্তিরূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে এবং সে কোন নৈর্ব্যক্তিক শ্রেণী-প্রতীক নয়। সে নৈর্ব্যক্তিক শোষণ-শক্তির দ্বারা আক্রান্ত এবং সেই দ্বন্দ্বের মধ্যেই নাটকের প্রাণ নিহিত। নন্দিনী একজন খাঁটি নারী। সে জানে ঐশ্বর্য ও শক্তি মায়া, জীবনের চরম বিকাশ প্রেমে। নাটকে রঞ্জনের প্রতি অনুরাগে সেই প্রেমের অভিব্যক্তি। কিন্তু প্রেমের বন্ধন নিষ্ঠুরভাবে লোভাতুরদের উচ্চাশা দ্বারা পদদলিত হয়। প্রেমের রহস্য এরা বুদ্ধি দিয়ে জানতে চায়, হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারে না।

(চ) "আমি পাঠকদের জানাতে চাই—এই বইখানি আমি কোন কিছু প্রচার করবার জন্য লিখিনি। নৈরাশ্যের এক ঘন অন্ধকার-মুহূর্তে এই ধ্যানটি (ভিশান) আমার মনে প্রতিভাত হয়েছিল। সংঘশক্তির চেয়ে ব্যক্তি-মানুষের উপরে আমার আস্থা

বেশী। আমি মনে করি - ব্যক্তি-আত্মা অসীম দৈবসত্তারই সসীম প্রকাশ এবং নারী-হৃদয় তার পরম অবলম্বন। আমি বিশ্বাস করি—নারীর প্রভাবই একদিন পুরুষকে এই লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বিকার থেকে উদ্ধার করবে, দুর্বলচিত্ত হওয়া সত্ত্বেও নারী তার প্রেমের প্রভাবে লোভের এই অপবিত্র আধিপত্য থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করবে। এই বিশ্বাসের আনন্দই কালোছায়ার পটভূমিকায় – শয়তানী লোভের দুঃস্বপ্নের পটভূমিকায় মুক্তিপ্রাণা নন্দিনীর ছবি আঁকার প্রেরণা যুগিয়েছে।”

এবার এই তিনটি সাক্ষ্য পরীক্ষা করে দেখা যাক। প্রথম সাক্ষ্য অর্থাৎ প্রস্তাবনা বা অভিভাষণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—‘সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি’ এ কথা বলা হলেও, শোষক ও শোষিত এই দুই শ্রেণীর দ্বন্দ্বের কথাই, আকর্ষণজীবী বা শোষণজীবী সভ্যতার বিরুদ্ধে শোষিত-পীড়িত প্রাণের বিদ্রোহের সুর বড় স্থান অধিকার করেছে। আমরা দেখি—বিজ্ঞানসহায় শোষক শ্রেণীকে তিনি বলছেন—‘কলিযুগের রাক্ষস’ এবং শোষিত-পীড়িতদের বলছেন—‘কলিযুগের বানর’ এবং দেখিয়েছেন এই দুই শ্রেণীর দ্বন্দ্বে, শেষ পর্যন্ত রাক্ষসের পরাজয় ঘটছে, দানব শক্তির বিরুদ্ধে মানব জয়ী হচ্ছে। মোটকথা, এখানে আকর্ষণজীবী সভ্যতার বিরুদ্ধে শোষিতদের সংগ্রামের কথাটা বড় হয়ে উঠেছে। তবে এই দ্বন্দ্বের চেতনার সঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে আরো সব ধারণা মিশে আছে। যেমন (১) আকর্ষণজীবী সভ্যতা কৃষিকেন্দ্রিক পল্লী-জীবনকে নষ্ট করেছে, (২) আকর্ষণজীবী সভ্যতা বিজ্ঞানবলে বলীয়ান—যন্ত্রবলে দুর্জয়। (৩) মানুষের স্বধর্ম একেবারে মরে যেতে পারে না। মানুষ যতোই বিকৃত হোক, তার স্বধর্ম যতোই আচ্ছন্ন হো'ক, একদিন-না-একদিন সে প্রকৃতিস্থ হওয়ার জন্য ব্যাকুল হবেই, অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে শেষ পর্যন্ত ভারসাম্য ফিরে পাবেই। (৪) শোষণজীবী সভ্যতা শুধু যে শোষিতকেই মনুষ্যত্বহীন করে বা পীড়া দেয় তা নয়, শোষককেও অমানুষ করে, পীড়িত করে। (৫) এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে এবং তা ঘটবে শোষক-শোষিত উভয় শ্রেণীর জাগরণে অর্থাৎ শুধু শোষিতের বিদ্রোহের ফলেই পরিবর্তন ঘটবে না, তার সঙ্গে শোষকের মানবস্বভাবটির জাগরণও যুক্ত থাকবে।

এখানে ‘রাজা’ হচ্ছে ঐ শোষণজীবী সভ্যতার কেন্দ্রীয় সত্তার প্রতীক, সেই বিকৃত মানুষটি, বৈজ্ঞানিক শক্তিতে যার হাত পা মুণ্ড অদৃশ্যভাবে বেড়ে গেছে, যে প্রাণরস শোষণ করতে যেয়ে নিজের প্রাণ বা মনুষ্যত্ব হারিয়ে বসেছে, যে জীবনে প্রেমের চেয়ে প্রতাপকে, আনন্দের চেয়ে সোনাকে বেশী দামী মনে করেছে, যে স্বভাবকে হনন ক'রে অশান্ত ও অতৃপ্ত জীবন যাপন করছে। যার মধ্যে আনন্দ-সৌন্দর্য ও প্রেমের আবেগ শুকিয়ে গেলেও একেবারে মরে যায়নি এবং যায়নি বলেই সে অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ। যার

ভিতরে প্রতাপ ও প্রেমের দ্বন্দ্ব, এবং বাইরে, যাদের মনুষ্যত্ব সে লেহন করে নিয়েছে, শোষণে-পীড়নে যাদের জর্জরিত করেছে তাদের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ।

দ্বিতীয় সাক্ষ্য পরীক্ষা করলে দেখা যায়—এখানে 'নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনা'-কেই অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্বের কথা একবারও উল্লিখিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ যেন বলতে চান—পুরুষের সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে 'নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনার' অভাবেই। শেষ পর্যন্ত এই কথাই দাঁড়াচ্ছে যে আমাদের এই সভ্যতায় যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটেছে 'নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনা'র অভাবেই এবং নারীশক্তির প্রভাবই একদিন শোষণ-পীড়ন বন্ধ করবে। নারী জাগিয়ে তুলবে প্রাণের বেগকে এবং প্রেমের আবেগকে সেদিন যন্ত্রের চেয়ে প্রাণের মূল্য হবে বেশী এবং প্রেমের আবেগ লোভকে করবে বশীভূত। এই দিক থেকে দেখলে রক্তকরবী নাটকের মুখ্য বিষয়বস্তু—'নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনা'-তত্ত্ব। প্রতিপাদ্য হবে—নারীর প্রভাবেই প্রাণ জাগে, প্রেম জাগে; প্রাণের বেগ আঘাত করে যন্ত্রকে এবং প্রেমের আবেগ আঘাত করে 'লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে এবং "পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙ্গে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত" হয়।

তৃতীয় সাক্ষ্য পরীক্ষা করে দেখা যায়—প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথ আকর্ষণজীবী বা শোষণজীবী সভ্যতাকে আরো সুনির্দিষ্ট পরিচয় দিয়েছেন—'শোষণজীবী সভ্যতা' বলতে তিনি ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে ধরেছেন। ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে তিনি শুধু বিজ্ঞানবলদৃপ্ত 'সংঘবদ্ধ লোভ' (an organised passion of greed) বলেই ক্ষান্ত হ'ননি তাকে সাম্রাজ্যবাদী শোষক মূর্তি রূপেও কল্পনা করেছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—এই বিজ্ঞানবাহন সংঘবদ্ধ লোভ এশিয়ায় এবং অন্যান্য মহাদেশে তার হিংস্র লোভের থাবা বসিয়ে শোষণে-পীড়নে জর্জরিত করে মানুষকে অমানুষে পরিণত করেছে। এই নিষ্ঠুর শোষক ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ আজ ইতিহাসের প্রধান নায়ক; এই ইতিহাস-নাট্যের প্রধান নায়ককেই আমি আমার নাটকে উপস্থাপিত করেছি। এই সাম্রাজ্যভোগী শোষণজীবীকে ঘিরে রয়েছে জটিল জাল—'সায়েন্টিফিক সিস্টেম'। জাতিগর্বের ও শক্তিদম্ভের প্রাচীর তুলে সে সমস্ত মানুষের স্পর্শ এড়িয়ে যায়। এই অশরীরী সাম্রাজ্যবাদের শরীরী প্রতিনিধি হয়ে যে সব সর্দার আসেন—লর্ড বার্কেনহেড্ বা লর্ড কার্জন যিনিই আসুন—তাঁরা কখনই আমাদের আপনার লোক হন না, তাঁরা প্রাণহীন পীড়নযন্ত্রে পর্যবসিত।

দ্বিতীয়তঃ রবীন্দ্রনাথ এ কথা বলতে ভোলেননি যে তিনি মানুষের 'single personality'-র উপরেই অধিকতর আস্থা রাখেন এবং যে-যন্ত্র মানুষের ব্যক্তিত্বকে বিলোপ করে দেয় তার প্রতি তার আস্থা নেই। তিনি বিশ্বাস করেন—এই ব্যক্তিত্বের

শেষ 'treasure house' রয়েছে নারীর হৃদয়ে এবং নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনাই লুব্ধ দুশ্চেষ্টা থেকে একদিন পৃথিবীকে উদ্ধার করবে। এই বিশ্বাসের আনন্দেই তিনি কালো ছায়ার পটভূমিকায়—শয়তানী লোভের দুঃস্বপ্নের পটভূমিকায় মুক্তিপ্রাণা সত্যমূর্তি নন্দিনীর ছবি এঁকেছেন।

এই সব সাক্ষ্য পরীক্ষা করার পরে সহজেই মনে এ প্রশ্ন জাগবে—রক্তকরবী নাটকের মুখ্য প্রতিপাদ্য কি ? প্রশ্ন জাগে—এই নাটকে নাট্যকার কি মুখ্যতঃ ইয়োরোপীয় সভ্যতার সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-পীড়নের রূপ এবং তার বিরুদ্ধে শোষিত-পীড়িত জনগণের বিদ্রোহের বা মুক্তি সংগ্রামের চিত্র এঁকেছেন ? অথবা সাধারণভাবে আকর্ষণজীবী সভ্যতায় কি করে শোষক ও শোষিত উভয় শ্রেণীই মনুষ্যত্ব হারিয়ে দেউলে হয়ে যায়, স্বধর্মের প্রেরণায় উভয়েরই মধ্যে প্রতিক্রিয়া জাগে এবং উভয়ের দ্বন্দ্ব ও জাগরণের ভিতর দিয়ে শোষণ-পীড়নের অবসান ঘটে, সেই প্রতিপাদ্যই কি প্রতিপাদন করেছেন ? অথবা আকর্ষণজীবী সভ্যতার নতুনতর সংস্করণ পুঁজিতন্ত্রের শোষণ-পীড়নের রূপ এবং প্রাণের জাগরণের ফলে, মানবিক মূল্য ফিরে পাওয়ার জন্য, কি করে শোষিতরা বিদ্রোহের ভিতর দিয়ে মুক্তি অর্জন করবে তা দেখানোই কি নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য ? অথবা নাট্যকার পুরুষের উদ্যমে নারীশক্তির নিগূঢ় 'প্রবর্তনা' দেখানোর জন্যই কি এই নাটকখানি লিখেছেন ?

এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে রক্তকরবী নাটকের আভ্যন্তরিক সাক্ষ্য গ্রহণ করা দরকার। আমরা দেখি—যক্ষপুরীতে তিনটি পক্ষ রয়েছে। এক পক্ষে রাজা ও তার অধ্যাপক, গোঁসাই সর্দার মোড়লরা, অন্য পক্ষে রয়েছে—কিশোর, ফাগুলাল, গোকুল, প্রভৃতি খোদাইকররা এবং আর এক পক্ষে রয়েছে—নন্দিনী ও তার পাগল ভাই বিশু। প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যে শোষক-শোষিত শ্রেণী সম্পর্ক। রাজা ও সর্দারগণ শোষক শ্রেণী, খোদাইকররা শোষিত শ্রেণী। উভয়েই অমানুষ। শোষণ-পীড়ন করতে করতে শোষকশ্রেণী যেমন প্রাণহীন, শোষণ-পীড়ন সইতে সইতে শোষিতেরাও তেমনি প্রাণহীন—অসাড়। রাজা আছে জালের আড়ালে। মানুষের সবটুকু বাদ দিয়ে তার মধ্যে শুধু প্রতাপটুকু জেগে আছে। সে সব কিছু জানতে চায় কিন্তু অনুভব করতে পারে না। যা বুদ্ধি দিয়ে জানা যায় তার প্রতি তার আগ্রহ আছে, কিন্তু যাকে মর্ম দিয়ে উপলব্ধি করতে হয় তার প্রতি তার অনাসক্তি। অধ্যাপক নিয়োগ করে সে বস্তুতত্ত্ব জেনে নেয়, কিন্তু প্রেম, আনন্দ, সৌন্দর্যের সহজ অনুভূতির সম্পদ থেকে বঞ্চিত এবং বঞ্চিত বলেই—অন্তরে রিক্ত বলেই প্রেম-আনন্দ-সৌন্দর্যের উপর বিরক্ত। যক্ষপুরীর এই পরিস্থিতিতে প্রেম-আনন্দ-সৌন্দর্যময়ী নন্দিনী এসে উপস্থিত হয়। সে চায় সুড়ঙ্গের

অন্ধকার ডালাটা খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে এবং রাজার বিশ্রী জালটা ছিঁড়ে ফেলে মানুষটাকে উদ্ধার করতে। নন্দিনীকে নিয়ে দু' পক্ষেই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়—দু' পক্ষেই রসময় প্রাণের প্রবর্তনা সঞ্চারিত হয়। রাজার মধ্যে জাগে অন্তর্দ্বন্দ্ব—রাজসত্তা ও মানবসত্তার দ্বন্দ্ব, শোষিত শ্রমিকদের মধ্যে জাগে প্রাণাবেগ—মুক্তির আবেগ—বিক্ষোভের সাহস। মুক্তপ্রাণের প্রতীক রঞ্জনের প্রাণ নেওয়ার পরে রাজার অন্তর্দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়—রাজা চরম প্রাণের সন্ধান পান—আবার মানুষ হন তাঁর নিজেরই শক্তি প্রতাপাবশেষ সর্দার-শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি-পরীক্ষায় বিদ্রোহী শ্রমিকদের সঙ্গে হাত মেলান এবং সর্দার শক্তিকে পর্যুদস্ত করে 'শেষ মুক্তি'র লক্ষ্যে পৌঁছাতে নন্দিনীর সহচর হন।

বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক সাক্ষ্য পরীক্ষা করার পর এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে রক্তকরবী নাটকের নাট্যরস রয়েছে—মানবী নন্দিনীর মুক্তি সংগ্রামেরই মধ্যে এবং সে কথা নাট্যকার বার বার বলেছেন। বলেছেন—এর সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি—নন্দিনীই হচ্ছে—"the heroine of the play........She is not an abstraction, but is pursued by an abstraction, like one tormented by ghost. And this is the drama." বাস্তবিকই—নাটকের গোড়ায় নন্দিনী যে দু'টি ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে—(সুড়ঙ্গের অন্ধকার ডালাটা খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দেওয়ার ইচ্ছা এবং রাজার বিশ্রী জালটাকে ছিঁড়ে ফেলে মানুষটাকে উদ্ধার করার ইচ্ছা) নাটকে সেই দু'টি ইচ্ছাই কার্যে পরিণত হয়েছে। একদিকে নন্দিনী খোদাইকারদের মধ্যে প্রাণের বেগ সঞ্চার করেছে, প্রাণের আগুন জ্বালিয়েছে, অন্যদিকে রাজার ভিতরে যে মানুষটি আচ্ছন্ন হয়ে ছিল সেই মানুষটিকে জাগিয়েছে—মুক্তিযুদ্ধে নেত্রীর স্থান অধিকার করেছে। নন্দিনীর জয়ধ্বনিতেই নাটকের উপসংহার ঘটেছে—নন্দিনীর শেষদান - প্রেম ও প্রাণের প্রতীক 'রক্তকরবীর গুচ্ছ' বিশু হাতে তুলে নেওয়ার সঙ্গে এবং পৌষের আহ্বানে নাটক শেষ হয়েছে।

এখন প্রশ্ন এই যে নন্দিনীর এই প্রাধান্যে 'নারীর নিগূঢ় প্রবর্তনার তত্ত্বটি' নাটকে মুখ্য প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে কিনা অথবা নন্দিনী-রঞ্জনের প্রেমের সম্পর্কের ভিতর দিয়ে —"The highest expression of life is in the love" এই তত্ত্বটি প্রতিপাদন করাই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য কিনা। আরো সুনির্দিষ্টভাবে প্রশ্ন করলে, পুরুষের জীবনে নারীশক্তির প্রভাব দেখানো অথবা যন্ত্রপ্রাধান্য-পীড়িত বিকৃত ও শোষিত জীবনের মুক্তিতে নারীশক্তির কার্যকারিতা দেখানো এই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য কিনা? নন্দিনী ও রঞ্জনের প্রেমাবেগ এবং প্রেমের পরিণাম দেখানো এই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য

কিনা ? এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার সময় নাটকের 'root action'-এর দিকে বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং লক্ষ্য রাখলেই দেখা যাবে—নারীর নিগূঢ় প্রবর্তনার তত্ত্ব বা প্রেমতত্ত্ব এই নাটকে মুখ্য প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেনি। নারীর অভাবেই যক্ষপুরীতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটেছে—একথা কোনমতেই যুক্তিসহ নয়। যক্ষপুরী একেবারে নারীশূন্য একথা নিশ্চয়ই বলা যায় না। অবশ্য যদি এমন কথা বলা হয় যে আর যারা 'তারা সব স্ত্রীলোক বটে, কিন্তু একা নন্দিনীই একমাত্র নারী' তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা। তাছাড়া নাটকের 'রুট এ্যাক্‌শান' লক্ষ্য করলে দেখা যায়—নিগূঢ় প্রবর্তনা বা প্রেম নয়, মুক্তিই নন্দিনীর মুখ্য কাম্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। নন্দিনী সৌন্দর্যময়ী আনন্দময়ী রঞ্জনপ্রেয়সী বটে, কিন্তু তার সবচেয়ে বড় পরিচয় এই যে সে মুক্তিপ্রাণা। সে রাজাকে এবং খোদাইকরদের সমানভাবে মুক্ত করতে চায়। রঞ্জনের সঙ্গে মিলনের কামনা তার যত উদগ্র, তার চেয়ে শোষিত-পীড়িতদের মুক্ত করার ইচ্ছা কম ঐকান্তিক নয়। নন্দিনী নিরাপদের নির্বাসনে যেতে চায়নি, মুক্তিযুদ্ধে আত্মাহুতি দিয়েছে।

এই নাটকের শেষে মৃত্যুপণ সংগ্রামের আবেগই তীব্র উচ্ছ্বাসে ব্যক্ত হয়েছে। রঞ্জনের মৃত্যুতেই সে সংগ্রাম শেষ হয়নি, রঞ্জনের মৃত্যুতেই নন্দিনী মরেনি—সে বেঁচে ছিল—ফাগুলালের দলকে নিয়ে সর্দারের সঙ্গে শেষ সংগ্রাম করবার জন্য। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে এই নাটকের মুখ্য প্রতিপাদ্য—নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনা বা প্রেমতত্ত্ব নয়, মুখ্য প্রতিপাদ্য—শোষণজীবী সভ্যতার বিরুদ্ধে মানবতার মৃত্যুপণ সংগ্রাম—এককথায় মুক্তিতত্ত্ব। এই সংগ্রামের একপক্ষ 'কলিযুগের রাক্ষসরাজ, অন্য-পক্ষে মানবতার বিগ্রহ নন্দিনী ও তার সহযাত্রীরা।' নায়ক বা নায়িকা নন্দিনী এবং প্রতিনায়ক রাজা ও তার অনুচর সর্দারগণ।

এখন যে প্রশ্নটি আসছে সেইটি সবচেয়ে জটিল—যে শোষণজীবী সভ্যতাকে রবীন্দ্রনাথ প্রতিনায়ক করে মানবতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন, তার প্রকৃতিটি কি? সে ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ অথবা পুঁজিবাদ ? প্রস্তাবনায় আমরা দেখেছি—রবীন্দ্রনাথ সাধারণভাবে শোষণজীবী সভ্যতার কথা বলেছেন এবং ইংরেজী প্রবন্ধে ইয়োরোপীয় সভ্যতা তথা সাম্রাজ্যবাদের কথা বলেছেন।

প্রশ্ন—দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য কল্পনা করার প্রয়োজন আছে কি? প্রয়োজন আছে, কারণ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। শোষণজীবী সভ্যতার আমরা দুই মূর্তি কল্পনা করতে পারি: একটি—সাম্রাজ্যবাদী মূর্তি, অন্যটি—পুঁজিতন্ত্রের মূর্তি। সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে পুঁজিতন্ত্রীর ঐক্য এখানেই যে উভয়েই শোষণজীবী। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ করে—বিজিত দেশগুলিকে আর পুঁজিতন্ত্রী শোষণ করে—নিজেরই দেশের

শ্রমিকদের। দুই ক্ষেত্রেই—ছোটদের খেয়ে খেয়ে বড়রা বড় হয়—"ছোটগুলো হতে থাকে ছাই আর ঐ বড়োটা জ্বলতে থাকে শিখাই"। রক্তকরবীর রাজা কি ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক? অথবা সাধারণভাবে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতীক?—এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে হলে, আমাদের আগে বিচার করে দেখতে হবে—রাজার চরিত্রে সাম্রাজ্যবাদীর প্রকৃতি অথবা পুঁজিতন্ত্রীর প্রকৃতি—কোন প্রকৃতি কি পরিমাণে প্রতিফলিত হয়েছে। রাজার চরিত্র পর্যালোচনা ক'রে আমরা দেখি—(১) রাজা আছেন একটা জটিল জালের আড়ালে। (২) রাজা সব কিছু জানতে চান, মর্ম দিয়ে বুঝতে চান না। (৩) রাজা যক্ষপুরীর রাজা, সেখানে সর্দারদের শাসনাধীনে খোদাইকররা সুড়ঙ্গ খুদে তাল তাল সোনা তুলছে। (৪) রাজার মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে। বাইরের ঐশ্বর্য ও প্রতাপ থাকা সত্ত্বেও অন্তরে অন্তরে সে রিক্ত ও ক্লান্ত। ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার প্রকৃতিতে আমরা দেখি—বিজ্ঞানের শক্তিতে সে শক্তিমান, তার চারদিকে বৈজ্ঞানিক শক্তির, জাতিগর্বের ও শক্তিদম্ভের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। বিজিতের সঙ্গে তার হৃদয়ের সম্পর্ক নেই, আছে শুধু শোষণের সম্পর্ক। বিজিত দেশের ধন সম্পদ হরণ করে সে তার ঐশ্বর্যের চূড়াকে গগনস্পর্শী করে তুলেছে। সে সব দেশের সবকিছু জানতে চায়, কিন্তু মানুষের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্কে যুক্ত হয় না। সে শোষণ-পীড়নের প্রাণহীন যন্ত্র বিশেষ। এই সাদৃশ্যটুকু থাকা সত্ত্বেও এই প্রশ্ন মনে জাগে এবং জাগে এই কারণেই যে সাম্রাজ্য-বাদীর মুখ্য লক্ষণটি এই যে সে যে দেশের ধন হরণ করে সে সেই দেশের অধিবাসী নয়।

এই নাটকের কোন জায়গাতেই এমন কথা নেই, বিশেষ ক'রে শোষিতরা কখনই এ কথা বলেনি যে রাজা বা সর্দাররা ভিন্ন দেশের লোক। তবে বিভিন্ন গড়কে বিভিন্ন দেশ কল্পনা করলে জোড়াতালি দিয়ে এক রকম সমাধান করা যায় বটে কিন্তু তা জোর করে করাই হবে। এই কারণে রাজাকে য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক বলতে আপত্তি উঠতে পারে। অন্যপক্ষে যেহেতু যক্ষ-পুরীর পরিবেশ একটা খনির পরিবেশ এবং শোষিতরা শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি, রক্তকরবীর রাজাকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রতীক ব'লে মনে হ'তে পারে। রাজার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মিল এই ভাবে দেখানো যেতে পারে। য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ যেমন বিজ্ঞানবাহন, পুঁজিবাদও তেমনি বিজ্ঞানাশ্রয়ী—বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান—বিজ্ঞানের শক্তিবাহুল্যের জোরেই সে হরণ করে, পীড়ন করে। বস্তুতত্ত্ববিদ্‌রা তার দ্বারে বাঁধা। সেও সব কিছু জানতে তথ্য আয়ত্তে আনতে চায়। তারও চারিদিকে শ্রেণীগর্বের, শক্তিদম্ভের প্রাচীর ঘিরে রয়েছে। সেও হৃদয়হীন—নিষ্প্রাণ শোষক বিশেষ। তার কাছে—একমাত্র মূল্য শ্রম-মূল্য—প্রেম সৌন্দর্য প্রভৃতি মূল্যের আদর সে করে না। সে-ও অদৃশ্য থেকে সর্দার-শক্তির

সাহায্যে হরণ-পীড়নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। গোসাঞি অধ্যাপক মোড়ল এই সব শ্রেণীকে সে শোষণের হাতিয়ারে পরিণত করেছে।

কিন্তু এই সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, রাজার পরিকল্পনায় য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বা পুঁজিবাদের সব লক্ষণ পরিস্ফুট হয়নি। যৌবনকে বা প্রেমকে ফিরে পাওয়ার জন্য তার মধ্যে যে ব্যাকুলতা দেওয়া হয়েছে, নন্দিনীকে পাওয়ার জন্য যে নির্জ্জান আবেগ দেওয়া হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদের বা পুঁজিবাদের প্রকৃতিতে তার কোন স্থান নেই।

সুতরাং এ কথা বলা চলে না যে রক্তকরবীর রাজা সর্বতোভাবে য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার অথবা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রতীক। রাজার পরিকল্পনায় এরা বড় অংশ অধিকার করেছে বটে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ বা পুঁজিবাদের সংস্কারের সঙ্গে আরো অনেক ভাব মিশে তবে রক্তকরবীর 'রাজা' তৈরী হয়েছে। ভাববাদী রবীন্দ্রনাথের চেতনায়—সাম্রাজ্যবাদ বা পুঁজিবাদ মানব-বিকৃতিরই বাহ্য লক্ষণ, আসল ব্যাধি—অখণ্ড মানবতার মধ্যে একাংশের বিকৃতি। আহরণজীবী বা শোষণজীবী সভ্যতা সেই বিকৃতিরই অভিব্যক্তি। মানুষের বিকৃতিই সাম্রাজ্যবাদী বা পুঁজিবাদী লোভের মূর্তি ধরে শোষণ-পীড়নের নিষ্ঠুর আচরণে ব্যক্ত হয়ে থাকে। বাহ্যতঃ যা সাম্রাজ্যবাদ বা পুঁজিবাদ, আসলে তা' মানবতারই বিকৃতি। অর্থাৎ বিকৃতি ভিত্তিহীন কিছু নয়। মানবতার ভূমিতেই তার জন্ম—বিকৃতি মানেই আচ্ছন্ন মানবতা। এই কারণে কোন বিকৃতিই নিরবচ্ছিন্ন বিকৃতি নয় —মানবতা এবং তদ্‌বিপরীত অমানবতার দ্বন্দ্বক্ষেত্র। প্রত্যেক বিকৃতির মধ্যে একদিকে থাকে—অন্তর্দ্বন্দ্বের, অন্যদিকে থাকে বহির্দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা। এই চেতনা থেকেই রাজার ধ্যানটি (ভিশান) রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং করেছে বলেই—রাজা বহিঃপ্রকৃতিতে সাম্রাজ্যবাদী বা পুঁজিবাদী হওয়া সত্ত্বেও, অন্তঃপ্রকৃতিতে—'মানুষ'—আচ্ছন্ন মানুষ রূপে কল্পিত হয়েছে।

এই দিক থেকে রক্তকরবীর মুখ্য প্রতিপাদ্য খুঁজতে গেলে দেখা যাবে—রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদের ও পুঁজিবাদের বিকৃতি থেকে মানুষকে উদ্ধার করবার সংকল্প নিয়েই এই নাটকখানি লিখেছিলেন। শোষণ-পীড়ন মুক্ত একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা—তথা মানবতার ভারসাম্য ফিরিয়ে আনাই—এই নাটক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

●

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম প্রতিজ্ঞাপত্র

কুলপ্রসাদ সেন

রবীন্দ্র ভারতীর সংগ্রহশালা সমৃদ্ধ করেছে স্বর্গত আচার্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সারাজীবনের সঞ্চিত কয়েক হাজার পুস্তক, পুঁথি, চিঠিপত্র, সংবাদ পত্রের কাটিং এবং নানাবিধ কাগজপত্র। এই নানা বিষয়ে অনুরাগসম্পন্ন একজন মনীষীর সমগ্র গ্রন্থাগারটি রবীন্দ্র ভারতীকে দান করেছেন ক্ষিতীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ, স্বর্গত ক্ষেমেন্দ্রনাথের পত্নী শ্রীমতী মেনকা দেবী। এই বহুমূল্য—এক হিসেবে অমূল্যও বলা যেতে পারে—দানের জন্য রবীন্দ্র ভারতী শ্রীমতী মেনকা দেবীর নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

নানারকম কাগজের মধ্যে পাওয়া একটি বিশিষ্ট কাগজের প্রতিকৃতি পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হোলো যেটি ব্রাহ্মসমাজের প্রথম যুগের একটি পর্বের স্মৃতি আমাদের মনে সমুজ্জ্বল করে দেয়। এই পর্বটি হোলো রাজা রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী একটি গোষ্ঠীকে সমাজরূপে সংঘবদ্ধ করা এবং ব্রাহ্মধর্মকে একটি বিশিষ্টরূপ দেওয়া।

১৭৫০ শকের ভাদ্রমাসে (১৮২৮ খৃষ্টাব্দে) জোড়াসাঁকোর একটি বাড়ীতে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন এবং তার এগার বৎসর পরে ১৭৬১ শকের ২১শে আশ্বিন (১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্বোধন করেন। এই সভা স্থাপনের প্রেরণার উৎস ছিল সহসা ঈশোপনিষদের একটি পাতা বাতাসে উড়ে দেবেন্দ্রনাথের হাতে এসে পড়া এবং এই পাতায় সংস্কৃত অক্ষরে লেখা ব্যাখ্যানের সূত্রে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সহিত মহর্ষির ঘনিষ্ঠতা। এই আখ্যানটি সর্বজন-বিদিত। তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপনের ৩ বৎসর পর দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহে তাঁর তত্ত্ব-বোধিনী সভা ও রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ একসূত্রে আবদ্ধ হয়। মহর্ষির আত্মজীবনীতে তিনি বলেছেন "একদিন যন্ত্রালয়ে বসিয়া ভাবিতেছি যে, ব্রাহ্মসমাজের কেহ কোন একটা ধর্মভাবে বদ্ধ নাই। সমাজে জোয়ার ভাঁটার ন্যায় কত লোক আসিতেছে, চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু কেহই এক ধর্মসূত্রে গ্রথিত নাই।" এই চিন্তাধারা থেকে এসে পড়লো ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার নিমিত্ত একটি প্রতিজ্ঞাপত্র এবং এই প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রবর্তন করলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "কোন কার্যই বিধিপূর্বক না

করিলে তাহার কোন ফল হয় না, এইজন্য ব্রাহ্মধর্ম যাহাতে বিধিপূর্বক গৃহীত হয়, যাহাতে পৌত্তলিকতার পরিবর্তে ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্তিত হয়, আমি তাহার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের একটি প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করিয়াছিলাম, তাহাতে প্রতিদিন গায়ত্রীমন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করিবার কথা ছিল। রামমোহন রায়ের গায়ত্রীর দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা বিধান দেখিয়াই আমার মনে এইটি উদ্দীপিত হয়।"

এরপর ১৭৬৫ শকের ৭ই পৌষ (১৮৪৩ খৃঃ) দেবেন্দ্রনাথ এবং আরও ২০ জন সাধক বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট ব্রাহ্মধর্ম ব্রত গ্রহণ করেন। এই ব্রত গ্রহণের অনুষ্ঠানটি ব্রাহ্মসমাজের গৃহে অনুষ্ঠিত হয় এবং বেদীতে উপবিষ্ট ছিলেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। ব্রত গ্রহণের পর দেবেন্দ্রনাথ একটি বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতাটি শুনে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অভিভূত হয়ে অশ্রুপাত করে বলেছিলেন, "রামমোহন রায়ের এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তিনি তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। এতদিন পরে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল।" সেইদিন যাঁরা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ, শ্রীধর ভট্টাচার্য, শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য, ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য, তারকনাথ ভট্টাচার্য, হরদেব চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, হরিশ্চন্দ্র নন্দী, লালা হাজারী লাল, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ভবানীচরণ সেন, চন্দ্রনাথ রায়, রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, জগৎ চন্দ্র রায়, লোকনাথ রায় প্রভৃতি।

যখন দেবেন্দ্রনাথ ২০টি সাধকসহ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন, তখন যে প্রতিজ্ঞাপত্র রচিত হয় তা' মুদ্রিত হয়েছিল কিনা জানা নেই। যে প্রতিজ্ঞাপত্রটি আমরা রবীন্দ্র ভারতী 'সংগ্রহশালায় পেয়েছি' সেটির তারিখ ১৭৬৬ শক, ১২ই চৈত্র—অর্থাৎ যে সময় দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মব্রত গ্রহণ করেন তার ১ বৎসর ৩ মাস পরে। দেখা যায় ইত্যবসরে প্রতিজ্ঞাপত্রটি ছাপা হয়ে গিয়েছে। যে প্রতিজ্ঞাপত্রটি রবীন্দ্র ভারতীর সংগ্রহশালায় পাওয়া গেছে তাতে স্বাক্ষর দিয়েছেন নন্দ কিশোর বসু এবং সাক্ষী হয়েছেন স্বয়ং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।

নন্দকিশোর বসু ছিলেন রাজনারায়ণ বসুর পিতা। প্রতিজ্ঞাপত্রের দুইটি সর্ত নন্দকিশোর স্বহস্তে সংযুক্ত করেছেন। চতুর্থ সর্তে প্রতিদিন প্রাতে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করার কথা আছে। সেটিকে বসু মহাশয় এইভাবে বর্ধিত করেছেন—"কোন দিবস নিয়মিত সময় মধ্যে কোন ব্যাঘাত প্রযুক্ত যদি দশবার জপ না করিতে পারি তবে তদ্দিবসে অন্য সময়ে কিংবা তৎপর দিবসে চিত্ত একাগ্র হইলে জপ যে বক্রী থাকিবেক তাহা সম্পূর্ণ করিব।" দশম সর্তে আছে বিপদগ্রস্ত ব্রাহ্মপরিবারকে সাহায্য করার কথা। এই সর্তটিতে তিনি যোগ করেছেন "এবং ব্রাহ্ম ভিন্ন অন্য ব্যক্তির দিগেরও

যথাসাধ্য উপকার করিব।" এই স্বহস্তে বর্ধিত সর্ত দুইটি নন্দকিশোরের সত্যনিষ্ঠা ও উদার চরিত্রের পরিচায়ক।

যে প্রতিজ্ঞাপত্রটি দেবেন্দ্রনাথ গোড়ায় প্রবর্তিত করেছিলেন, পরে সেটি বদল হয়ে যে আকার গ্রহণ করে তা ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থের বর্তমান সংস্করণের পুরোভাগে দ্রষ্টব্য।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের আত্মজীবনী থেকে জানা যায় তাঁর পিতা নন্দকিশোর কিছুকাল রাজা রামমোহন রায়ের স্কুলে ইংরাজী পড়িয়ে ছিলেন। ইংরাজী ভাষার উপর তাঁর প্রচুর দখল ছিল কিন্তু ইংরাজী উচ্চারণ ভালো ছিল না। নন্দকিশোর রামমোহনের একজন প্রাথমিক শিষ্য ছিলেন এবং কিছুকাল তাঁর সেক্রেটারীর কাজ করেছিলেন। পরে তিনি কিছুদিন বিভিন্ন সংবাদপত্রে কাজ করে ইংরাজ সরকারের অধীনে দেবত্র জমি বাজেয়াপ্ত করার একটি special commission office-এর প্রধান করণিকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৪৫ খৃঃ ৭ই ডিসেম্বর, অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্মব্রত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করার এক বৎসরের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। রাজনারায়ণ বসু আত্মজীবনীতে পিতা সম্বন্ধে বলেছেন, "ইনি বেদান্ত ধর্মে বিশ্বাস করিতেন। যখন ইঁহার মৃত্যু হয়, তখন শঙ্করভাষ্য আনাইয়া পড়িতে বলেন এবং ওংকার জপ করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পর দেখা গেল, তাঁহার বুড়া আঙ্গুল অন্য আঙ্গুলের উপর রহিয়াছে। রামমোহন রায়ের সকল শিষ্যেরা বেদান্ত প্রতিপাদ্যধর্মে বিশ্বাস করিতেন। পিতাঠাকুর বেদান্ত প্রতিপাদ্য নিরাকার বাদে বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু তাঁহার এই মত ছিল যে ভিতরে যাহা মত থাকুক না কেন, 'তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ'—মনেতেও লৌকিকতা উল্লঙ্ঘন করিবে না।"

নন্দকিশোর বসু মহাশয়ের জীবনী হতে তৎকালীন সমাজের একটি ছবি পাওয়া যায়—নন্দকিশোর ও রাজনারায়ণের পিতা-পুত্র সম্পর্কে। রাজনারায়ণ তাঁর আত্ম-জীবনীতে প্রকাশ করেছেন যে ছাত্রাবস্থায় ইনি অত্যধিক মদ্যপান করতেন। বস্তুতঃ মদ্যপান করাটাকে তখনকার ছাত্রেরা সভ্যতার চিহ্ন বলেই মনে করতো। পুত্রের মদ্যপান ত্যাগ করাবার জন্য নন্দকিশোর যে ব্যবস্থা করেছিলেন তা রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত থেকে উদ্ধৃত করা হোলো—"একদিন সন্ধ্যার পর আমাকে পিতাঠাকুর তাঁহার লিখিবার ঘরে ডাকিলেন। ডাকিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি বুঝিতে পারিলাম না যে ব্যাপারটা কি। তাহার পর দেখিলাম, তিনি একটি দেরাজ খুলিয়া একটি কর্কস্ক্রু ও একটি সেরীর বোতল ও একটি ওয়াইন গ্লাস বাহির করিলেন। তৎপরে প্রকাণ্ড টিনের বাক্সটি খুলিলেন। টিনের বাক্স খোলা হইলে আমি দেখিলাম যে, তাহাতে সদর দেওয়ানীর কাগজ নাই, পোলাও, কালিয়া, কোপ্তা রহিয়াছে।

পিতাঠাকুর আমাকে বলিলেন, 'তুমি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে এই সকল উত্তম দ্রব্য আহার করিবে, কিন্তু মদ (সেরী) দুই গ্লাসের অধিক পাইবে না ; যখনি শুনিব অন্যত্র মদ খাও, সেই দিন অবধি এই খাওয়া বন্ধ করিয়া দিব।" উপরোক্ত টিনের বাক্সটি তাঁহার মুসলমান বন্ধু মুন্সী আমীর আলি পাঠাতেন এবং তাতে হিন্দুর অখাদ্য খাবার থাকতো সন্দেহ নেই।

●

সনেট ঃ পঁচিশে বৈশাখ

তুষার চট্টোপাধ্যায়

একটি জন্মের উৎসে অবিচ্ছিন্ন সহস্র প্রকাশ।
ঘুরছে ফিরছে নাম লিখছে আনন্দের দ্যুতি
অধরে ধারণ করে অন্ধকার আলোর আভাস
মৃত্তিকার সন্নিকটে ঐকতান দীপ্ত অনুভূতি।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। সূর্যস্নাত হরিৎ প্রান্তরে
অবীক্ষিত আবির্ভাব। ঝরে দ্রুত স্নিগ্ধ স্রোতোধারা।
পথের আহ্বানে পথ প্রসারিত দূরে দূরান্তরে
গানের ওপারে নিত্য দীপ্যমান স্থিতির পাহারা।

সুন্দর সমীপে বহু আত্মদান। বিবিধ বারতা
সক্ষম স্রোতের টানে লগ্নে আঁকে সৃজনের ছবি।
কুসুমের সম্ভাবনা আত্মদানে ভাঙে নীরবতা
আনন্দের অন্য নামে ডাকে নিত্য রক্তকরবী।

নগ্ন চিত্ত মগ্ন হয় আত্মদানে সমস্তের মাঝে।
একটি জন্মের উৎসে আবির্ভাব সর্বত্র বিরাজে॥

নাটকের উৎস সন্ধানে ঃ ভারতবর্ষে

(পূর্বানুবৃত্তি)

রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়

সতর্ক অনুধাবন ও গবেষণা থেকে ইতিহাস জানায় প্রায় সমস্ত আদিম উৎসব অনুষ্ঠানগুলো সৌরকেন্দ্রিক। প্রথম দিকে সভ্যতায় কৃষি আর সৌরবিদ্যা আগে এসেছিল বলেই হয়ত। বাঙলাদেশের চণ্ডীযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা, উত্তর-ভারতের রামলীলা ও রামযাত্রার সঙ্গে উদাহরণ হিসাবে মিশর ও গ্রীসের কথা মনে পড়ে। মিশরে Deir-el-Bahri-র মন্দির থেকে নীলনদ পর্যন্ত প্রশস্ত পথে শোভাযাত্রা হ'ত। সে শোভাযাত্রায় অঙ্গভঙ্গীসহ অভিনয় অনুষ্ঠান যেমন হ'ত, গ্রীসেও তেমনি করে ডায়োনিসাস নগরের পথ পরিক্রমা করতেন। সেখানেও জাঁক-জমকের শোভাযাত্রায় নাট্যাভিনয়ের বীজ লুকিয়েছিল। ভারতে নাটক ও ধর্ম যে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কবিধৃত তার আর একটি প্রমাণ কেরালাতে নাটক ও নাটকীয় দৃশ্য দেবী ভগবতীর সম্মানে প্রযোজিত হয়। ভগবতী হ'লেন মহীয়সী মাতৃদেবী—কৃষিদেবতা ভগবানের পত্নী।

হিন্দু দেবসংঘের ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ভারতীয় নাট্য-সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত। কৃষ্ণযাত্রা, রাসযাত্রার ভূমিকা বিষ্ণু ও তাঁর অবতারের। শিব তাঁর অমার্জিত চরিত্র-বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিয়ম ও পূজাবিধির চেয়ে নাচগান অভিনয়ে বেশি সন্তোষ লাভ করেন। মহাভারতে উল্লেখিত পশুপতি-সমাজ উৎসবে দেখা যায় শিবের সম্মানে তা' অনুষ্ঠিত হয় আর তাতে পান, নৃত্য ও সংগীতের বিশেষ প্রাধান্য। ব্রহ্মা নাট্যবেদ রচনার মূল ভূমিকাচারী। তিনিই ভরতকে নাট্য-প্রযোজনা ক'রতে বলেন ও সে সম্বন্ধে উপদেশ দেন।

হিন্দু-নাটক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য মিলে নাট্যশাস্ত্রকে পঞ্চমবেদের মর্যাদা দিয়াছে। সে ক্ষেত্রে ভারতীয় নাটকের ভিত্তি যে ধর্মীয় উৎসবানুষ্ঠান সে বিষয়ে কোন সংশয় থাকতে পারে না। নাট্যবেদও নিজের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছে—"He who always hears the reading of this (sastra) which is auspicious, sportful, originating from Brahman's mouth very holy, pure, good, destructive of sins, and who puts this into practice or witness the performance (of a drama) will attain the same (blessed) goal which the master of the

vedic path and the master of the vedic lore, the performers of sacrifices, or the givers of gifts will (in the end) attain.

Ibid, XXX VI, 77-79

ভারতের নাট্যসংস্কৃতি ধর্মবিযুক্ত প্রেরণা থেকে জন্ম নিয়েছে এ যুক্তি অনেক দুর্বল। কীথ মহাশয় তা প্রমাণ করে গেছেন। বিশেষ করে প্রাচীনকালে ধর্মসংঘের সম্ভাবনা এত প্রবল ছিল যে এ জাতীয় অনুমান সমর্থন করা যায় না।

এখন কোন্ ধর্মীয় উৎসব বা অনুষ্ঠানকে আমরা হিন্দুনাটকের গঙ্গোত্রী বলতে পারি? এ প্রশ্নের উত্তরে শিবোৎসবকে নির্দেশ করা সত্যসঙ্গত। এ বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রাচুর্য যেমন নেই, তেমনি উৎসবের ক্রমবিবর্তনের রূপ, পূজারীদের ভূমিকা নাটকের জন্যে কতখানি দায়ী ছিল তারও প্রাচীন তথ্য অপরিচিত। কিন্তু একটি কথা যদি স্বীকার করে নেওয়া হয়—আর স্বীকার করতে কোন বাধাও নেই—যে, হিন্দুদের বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় আচারঅনুষ্ঠানগুলো দীর্ঘায়ু, বিশেষতঃ বহু প্রাচীনকাল থেকে অবিচ্ছিন্ন ধারায় যুগে যুগে সঞ্চারিত হয়ে গেছে। তার পেছনে এক অতি কার্যকরী শক্তি ছিল। প্রমাণ না থাকলেও দেবতা বিচারে সেকথা আজ স্বীকৃত সত্য।

অন্যান্যদেশে বিশেষকরে গ্রীসে লিঙ্গদেবতার উৎসবকে কেন্দ্র করে phallic-নৃত্যানুষ্ঠানের আসরেই নাটকের জন্ম। ভারতে শিবের সেই phallic-বৈশিষ্ট্যের কথা এ প্রসঙ্গে সহজেই আমাদের মনে আসে। সেই দেবতা বহুপ্রাচীন—আর্যদের ভারতে প্রবেশ করার অনেক আগের দিনের। সিন্ধু-সভ্যতায় যে পশুপতিমূর্তি পাওয়া গেছে সে সম্বন্ধে ডঃ মনোমোহন ঘোষ মন্তব্য করেছেন যে তার—"phallic connection" may be assumed from the emblems of this kind found in abundance in Harappa and Mohenjo-dora." সিন্ধু-সভ্যতায় সম্ভবতঃ শিবের মত লিঙ্গ-দেবতা ছিল। এখানে নৃত্যপরা নারীমূর্তিও পাওয়া গেছে। অতএব নৃত্যের প্রচলন ছিল। নৃত্য ও নাটক ঘনিষ্ঠ বন্ধনে বিধৃত। সেক্ষেত্রে তাদের নাট্যসংস্কৃতি ছিল কিনা এবং থাকলেও তা ওই দেবতার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত কিনা, তা হলপ করে বলা সহজ নয়।

ঋগ্বেদের মধ্যে একজাতীয় লোকের উল্লেখ আছে, যাদের পরিচয় শিশ্ন-উপাসক। শিশ্নদেব লিঙ্গদেবতা। কিন্তু সেখানেও কোন নাট্যসম্পর্কের উল্লেখ নেই। অবশ্য প্রমাণ নেই বলে তার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। শিবকাহিনীর মধ্যে এই phallic বিশেষত্ব অনেক আছে। কালীতন্ত্রে দেবীর শিবসহ রতিক্রীড়া, কুলার্ণবে মৈথুন, যোগিনীতন্ত্রে সৃষ্টির প্রাক্পর্বে যোনিধ্যান, নীলমতপুরাণে শিবচতুর্দশীতে নৃত্যগীত মিথুনের নির্দেশ, তৈত্তিরীয় সংহিতায় 'সোমারৌদ্র' চরুতে শিবের দেবত্বকে স্বীকার মহাভারতে

পুত্রদরূপে মরুৎদের জন্মদানের সঙ্গে—আজকের দিনের কুমারীদের শিবপূজা ইত্যাদিকে স্মরণ করা যেতে পারে। এ সত্ত্বেও জোর করে এর সঙ্গে নাটকের জন্মসূত্রকে প্রত্যক্ষ-ভাবে যুক্ত করা চলে না। নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে, শিব তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্যকে নাটকের সঙ্গে যোগ করে দেন। ডঃ কুমারস্বামী মনে করেন, নটরাজের এই তাণ্ডবনৃত্য আর্যদের আগে যে প্রমথরা ছিল, তাদের নৃত্য থেকে অনুকরণ করা হয়েছে।* তবু পরবর্তীকালে শিবের এ বৈশিষ্ট্য আর্যপ্রভাবে ক্ষয়িষ্ণু। বলা যেতে পারে বুদ্ধদেবের প্রভাবে তা লুপ্ত হয়, যার ফলে সংস্কৃত নাটকে শিবের রূপ (বন্দনা অংশে) পরমসুন্দর—সূক্ষ্মসৌন্দর্যমণ্ডিত—ভয়ংকর নয়, স্থূল নয়। গিরনার পাহাড়ের অশোকলিপিতে'সমাজে'র উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ জাতকের (কনব) মধ্যেও 'সমাজ' দেখা যায়। উভয়ক্ষেত্রেই নাট্যপ্রদর্শনের কথা আছে। ভিক্ষুদের 'পেক্‌খা' (পেক্‌খা < প্রেক্ষা) দেখতে নিষেধ করেছিলেন বুদ্ধদেব। জাতকে তার নিদর্শন আছে। নাট্যশাস্ত্রেও চব্বিশ অধ্যায়ে 'অদর্শনীয়' সম্বন্ধে নির্দেশ আছে। অনেকের মতে এই অদর্শনীয় সম্ভবতঃ অনার্য লিঙ্গদেবতা কেন্দ্রী—যাকে পরে পরিমার্জনা করে আর্যরা গ্রহণ করেছিল।

অনার্য লিঙ্গদেবতা শিব, বা আর্যদেবতা রুদ্র অথবা মিশ্রণজাত দেবতা রুদ্রশিব — যে দেবতাই হোক না কেন নাটকের জন্মলগ্নে শিবের নায়ক-ভূমিকা সংশয়হীন। কৃষ্ণ-যাত্রা, রামযাত্রায় বিষ্ণুর প্রাধান্য। শিব কেন্দ্রিক গাজন বা গম্ভীরা উৎসবে সঙ্‌ রঙ-তামাশা ও মুখোস ব্যবহার অন্যতম প্রধান অংগ। প্রাচীনকালে বিভিন্ন পুরাণ ও সংহিতায় নৃত্যগীত সহযোগে শিবশক্তি উৎসবের কথা জানা যায়। ফাল্‌গুনে মহোৎসব, বৈশাখের পুষ্পমহালয় উৎসবে শোভাযাত্রা প্রচলিত ছিল। ধর্মসংহিতা, শিবের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্যে নৃত্যগীত ও হাস্যকৌতুকের বর্ণনা দিয়েছে। বিষ্ণুর ক্ষেত্রে এমন নজীর দেখা যায় না। নাট্যশাস্ত্রের প্রবক্তা হয়েও ব্রহ্মা প্রাধান্য পান নি। ইন্দ্রবিজয় উপলক্ষে নাটকের প্রযোজনা হলেও নাট্যশাস্ত্রে শিবের প্রতিষ্ঠা সম্মানজনক। ভরত যে নাট্য-প্রযোজনা করেছিলেন তার সঙ্গে শিবই তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্য যোগ করে দেন। কাহিনীবর্ণিত ঘটনা হ'ল—নাট্য-সম্পর্কিত নির্দেশ দান করে ব্রহ্মা ভরতকে আদেশ দিলেন,—'অমৃতমন্থন' নাটকের প্রযোজনা কর। প্রথম প্রযোজিত নাটক প্রদর্শন করা হল ইন্দ্রসভায় নয়—হিমালয়ের শিবালয়ে। সমাগত দেবমণ্ডলী তার দর্শক। প্রযোজনায় উৎকর্ষ সাধনের জন্যে শিব পরামর্শ দিলেন লাস্য ও তাণ্ডব নৃত্য যোগ করতে। ব্রহ্মার অনুরোধে নটরাজ এ বিষয়ে ভরতকে সাহায্য করার জন্যে নৃত্যবিশারদ তণ্ডুকে (তণ্ডু > তাণ্ডব) নির্দেশ দিলেন। তাঁর কাছ থেকে ভরত বহু রকম 'করণ' ও অংগহারসহ

* The Dance of Shiva. p. 84.

নির্দেশিত নৃত্য শিক্ষা করলেন। এ গল্পের লক্ষণীয় বিশেষত্ব—শিবের সম্মান সব থেকে বেশি। প্রথম প্রযোজনা হচ্ছে দেবসভায় নয়, শিবগৃহে—দ্বিতীয়তঃ, নিয়ম নির্ধারিত করে দেবার পরেও শিবনির্দেশ শিরোধার্য। আশ্চর্যের ব্যাপার এখানে বিষ্ণুর কোন ভূমিকা নেই। পরে অবশ্য বিভিন্ন অংশে বিষ্ণুর উল্লেখ আছে। ব্রহ্মা যেমন ক্রমে লুপ্ত হয়েছেন—তেমনি বিপরীতে বিষ্ণু হয়ত নাটকের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে প্রাধান্য পেয়ে কৃষ্ণযাত্রা, রামলীলার উৎসরূপে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু শিবের স্থান অনড়, শ্রেষ্ঠ। নাটকের সঙ্গে শিবের মূলগত সম্পর্কের সিদ্ধান্ত সংশয়হীন।

ভারতে শিবের দুটি বিশেষত্ব—লিঙ্গদেবতা ও ঝড়ের (ধ্বংসের) দেবতা। প্রথমক্ষেত্রে প্রাক্-আর্যযুগ থেকে সমৃদ্ধির দেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, আর দ্বিতীয়ক্ষেত্রে মধ্যএশিয়া থেকে আর্যদের সঙ্গে আগত রূপ। এদের মিশ্রণ ও পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রভাব, বিশেষতঃ বৌদ্ধপ্রভাবে শিব শান্তসুন্দর, সমাহিত। শিবের কোন একটি বিশেষ রূপ অথবা মিশ্রিতরূপ-কে নাটকের সূচনায় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তা বলা সহজ নয়।

॥ তিন ॥

ভারতীয় নাটকের উৎসপর্বে ধর্মীয় সংস্কার ও শিব ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এখন তার জন্মকাল সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করতে পারলে আলোচনা পূর্ণতর হবে, বলাই বাহুল্য। ভারতীয় নাটকের জন্ম হয়েছিল কবে? সে কি প্রাগার্য অবিমিশ্র দ্রাবিড় সংস্কৃতির অথবা তার সঙ্গে আদি অষ্ট্রেলীয়দের মিশ্রিত সংস্কৃতির কালে? কিংবা আর্য সংস্কৃতির দান—অথবা আর্য-অন্-আর্য মিলনের স্বর্ণফসল?

এক্ষেত্রে সমাজ বিজ্ঞানীদের ওপর নির্ভর করাই বিধেয়। ভারতবর্ষে প্রাচীনতম অধিবাসী ছিল নিগ্রোবটু গোষ্ঠী। তাদের বৃক্ষপূজা, মৃতের অবিনশ্বর আত্মার ধারণার সঙ্গে তাদের পরবর্তী গোষ্ঠী আদি অষ্ট্রেলীয়দের জীবপূজা, প্রাণিপূজা, লিঙ্গ উপাসনা, ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে জ্ঞান, পশুপতিরূপে দেবতার পরিকল্পনা, গ্রামীণ উৎসব ইত্যাদি ভারতীয় সংস্কৃতিতে নিজের স্থান করে নিয়েছে। সেইসঙ্গে আছে দ্রাবিড় সংস্কৃতির প্রভাব। তাদের কাছ থেকে পেয়েছি, মন্দির, লৌকিক দেবতা, কলাবিদ্যা ও নাগরিক সংস্কৃতি। এই সামগ্রিক বস্তুভূমিকে ভিত্তি করে আর্য-অনুপ্রবেশের পর একটী আলোকিত পর্বের শুরু হল। সে আলো দর্শনগত—জীবন ও জগতের। মহামিলনের ভারততীর্থে ঐকতান-চরিত্রের সংস্কৃতির নবজন্ম। নতুন ধারারথে সে প্রবহমান।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে আর্যপূর্ব ভারতভূমির সাংস্কৃতিক দান স্মরণীয়। অনেক

বিবর্তনের পথে সে ধর্মে ও কৃষ্টিতে প্রাধান্য বজায় রেখে এসেছে, সে কথা ভাষাবিজ্ঞানীরা ও নৃতত্ত্ববিদেরা জোর দিয়েই বলেছেন। ইন্দো-য়ুরোপীয় গোষ্ঠীর মানুষ ও সর্বপ্রাচীন রচনা ঋগ্বেদের জন্য যেমন আমাদের গর্ব, সমভাবে প্রাগার্য ভারতের সংস্কৃতির উৎকর্ষ স্বীকার করে আমরা সুখী। আর্য ও অন্-আর্য চিন্তা এবং অভ্যাসের মহামিলনে আমাদের সংস্কৃতির সামগ্রিক পরিচয়। সবকিছুর সঙ্গে নাট্যশিল্পের মূল সেই অন্-আর্য জীবনধারা থেকে জন্ম দিয়েছে—আর্যদের নতুন দীপ্তি তাকে অনেকখানি পরিণত করেছে। নাট্যশাস্ত্রের জন্মকাহিনী বিশ্লেষণ করলে এই সিদ্ধান্ত করা অনেক সহজ। যে শিবত্বের ওপর ভারতীয় নাটকের উৎসবিচার করতে হবে—মূলতঃ তা আর্যপূর্ব জীবনধারার দান। ব্রহ্মা নাট্যবেদের জন্ম দিয়েছেন, অথচ তিনি প্রকৃতপক্ষে পুরাণযুগে হিন্দু ত্রিদেবের একজন হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছেন। ব্রহ্মচিন্তা বেদপরবর্তী-যুগের। বিষ্ণুকে বেদের মধ্যে পাওয়া গেলেও পুরাণ-যুগে তাঁর যে দীপ্তি তা বেদপর্বে অনুপস্থিত। নাট্যকলার সঙ্গে তারও সম্পর্ক স্মরণীয়। এই পরিচিত বিষ্ণুর উপাসনায় আর্য বৈদিক প্রভাবের তুলনায় অন্-আর্য রীতিনীতির প্রাধান্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞমহল নিঃসংশয়। নাট্যশাস্ত্রে যে পূজাবিধি পাওয়া যায়, তার মধ্যে অন্-আর্য চরিত্র স্বতঃই আভাসিত। প্রকৃতপক্ষে শিব ও বিষ্ণু নাট্যশিল্পের জন্মলগ্নে সব থেকে সক্রিয় উপাস্য এবং তাদের মধ্যে অন-আর্য বৈশিষ্ট্য প্রধান হয়ে উঠেছে। ভারতীয় নাট্যকলার জন্মদাতা মানুষের পরিচয় দিতে বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেন, very old predecessors of the Aryans.

পৃথিবীর সমস্ত দেশেই নাটকের মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে মানুষের অনুকরণবৃত্তি থেকেই তার জন্ম। কৃষিসভ্যতা মানুষকে এটি উপহার দিয়েছিল। রূপারোপ করার সূত্রেই অনুকরণমূলক-নৃত্য (mimetic dance) জন্ম নেয়। এ নৃত্য যত চর্চাসাপেক্ষ হয়ে উঠল, তত বৃত্তির রূপ নিলে ও আচার অনুষ্ঠানে তার প্রয়োগ ঘটতে দেখা গেল। মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মতই এরও পরিচালনা করতেন পুরোহিত সম্প্রদায়।

বাইবেলে জীবসৃষ্টি করে ঈশ্বর নির্দেশ দিয়েছিলেন—Be fruitful and multiply. সমাজে পুরুষের বৃত্তি ছিল যুদ্ধ-অধিকারে ও আত্মরক্ষায়। আর নারী ছিল পালনে ও বলবৃদ্ধির দায়িত্ব নিয়ে—When the woman plants maize, the stalk produces two or three cars. Why ? Because women know how to produce children. They only know how plant corns to ensure its germinating.* অতএব সুফলনের জন্যে সমস্ত চেষ্টার পরেও ছিল শুভকামনা। তার

* Encyclopaedia of Religion and Ethics, vol. I, P. 227

মধ্যেও ছিল অতিপ্রাকৃত চেতনা—যে মানসিকতা মানুষকে তার আপন সীমা ছাড়িয়ে যেতে দেয় নি। যাযাবর বৃত্তিতে সমভাবে কৃষি-জীবনেও সন্তান ছিল কাম্য। সে দিন লোকবল (man-power) ছিল সব থেকে বেশি প্রয়োজনীয়। সেই সন্তান কামনা সঞ্চারিত হ'ল শস্যকামনায়। তাই মাটি হ'ল মা—সূর্যের রৌদ্র-ঔরসে জন্ম সম্ভব হ'ল শস্য-সন্তানের। এই কাব্যময় পরিকল্পনা তাদের নৃত্যে ও আচারে রূপপরিগ্রহ করে পালনীয় হয়ে উঠল দেবতার তুষ্টির জন্য। সে অনুষ্ঠানে অনুকরণ স্বাভাবিক ভাবে সবকিছুর উপরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। যেদিন এর অবলুপ্তি ঘটল সেদিন তার স্মৃতি অবলম্বন করে অনুষ্ঠানগুলো বিবর্তনের পথে বেঁচে থাকতে চাইল। কৃষিদম্পতি পরিণত হ'ল দেবদম্পতিতে। ব্যবিলনের তামুজ-ঈশ্‌তার, মিশরের ওসিরিস-আইসিস, ফিনিশিয়াতে আদেনিস্‌-আস্‌তারতা, এশিয়া মাইনরে অ্যাত্তিস্‌-সিবেনে, গ্রীসে ডায়োনিসাস-সেমিলি, সেই রূপান্তরিত কৃষিদম্পতি। তাদের কেন্দ্র করে এই অনুকরণমূলক আচার-অনুষ্ঠান উৎসবে পরিণত হয়। নাটকের জন্ম সেই উৎসব-প্রাংগণেই। ভারতে এই পর্ব নিঃসন্দেহে আর্য-পূর্ব যুগে। সব থেকে বড় কথা আর্যরা মূলত কৃষিজীবী নয়—যাযাবর গোষ্ঠী। ভারতে এসে তারা কৃষির সঙ্গে অনেককিছু গ্রহণ করে। নাট্য-চেতনা তার মধ্যে অন্যতম। নাটক না হ'লেও তার ভ্রূণকে জন্ম দিয়েছে অন্‌-আর্য সংস্কৃতি—সে বিষয়ে দ্বিধার অবকাশ নেই।

প্রাগার্য-যুগে নাটকের সূত্রপাত হ'লেও আর্যদের দান অসামান্য। যে প্রাচীন নাটক আমরা পেয়েছি, ইন্দো-আর্য ভাষার সেই সংস্কৃত ও প্রাকৃত নাট্য-সাহিত্যই তার প্রমাণ। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় নাট্য ঐতিহ্য সেই পর্বেই সমুজ্জ্বল। শুধু সাহিত্য নয়, শিল্পপ্রয়োগের দিক থেকে ভারতীয় নাট্য-সংস্কৃতির প্রতিনিধি স্বরূপ ভরতের নাট্যশাস্ত্র আর্য প্রভাবেরই দৃষ্টান্ত। বৃত্তিগুলোর বিশেষত্ব বিশ্লেষণ করলে তা সহজেই বোঝা যাবে। ভারতীবৃত্তি ভরত নামে পরিচিত এক গোষ্ঠী থেকে এসেছে। সংস্কৃতে এই বৃত্তির বহুল প্রয়োগ লক্ষণীয়। এই বিশেষত্ব বেদ-সমকালীন। পরে ভরত শব্দের অর্থ হয়েছিল—অভিনেতা। নাট্য-কুশলীদেরও অনেক সময় ভরতপুত্র নামে পরিচিত হ'তে দেখা যায়। সাত্বতীবৃত্তি সম্ভবতঃ সাত্বতীগোষ্ঠী থেকেই এসেছিল। দু'টিই ইন্দো-আর্য গোষ্ঠী। আর্ভোটি ও কৈশিকী বৃত্তির মূল হিসেবে অর্ভট ও কেশিক নামে কোন গোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া না গেলেও অনেকে তাদের ক্রম-অবলুপ্তি, অথবা অন্যগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশ্রণের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। বৃত্তিগত এই বিশেষত্ব, আজও ধারাপথে প্রবহমান। বৃত্তিগত শ্রেণীর দিক থেকে ইতালীর অপেরা, ইংরেজের শেক্‌সপীয়র, নরওয়ের ইবসেন সেই গুরুত্ব নিয়ে দেশীয় সংস্কৃতির চিহ্নবিশেষ।

এ আলোচনার উপসংহারে হিন্দু-নাটকের প্রথম জন্ম কোন সময় হয়েছিল সে সম্বন্ধে একটি সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করা ভাল। এ বিষয়ে কয়েকটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন।

এক ॥ নাট্যশাস্ত্রের জন্ম সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক। এমন হ'তে পারে এই ভাবে সংকলিত হ'বার অনেক আগে খৃষ্টপূর্ব প্রথম-দ্বিতীয় শতকে প্রচলিত ছিল—হয়ত ভরত নামে কোন নাট্যবিদ এটি সংকলন করেন। সূত্র উদ্গাতা এই সময়ের নন—অনেক আগের।

ছুই ॥ নাট্যশাস্ত্রের জন্ম-শতকের আগে খৃষ্টীয় প্রথম শতকে অশ্বঘোষ ছিলেন কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের সভাসদ। তাঁর রচনার মধ্যে 'সারিপুত্র-প্রকরণ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মধ্য-এশিয়ায় তুরফান অঞ্চলে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে হাতে-লেখা পুঁথির মধ্যে এই রচনা আবিষ্কৃত হয়। নয়টি অংকে রচিত এ প্রকরণের উপজীব্য কেমন করে মৌদ্‌গল্যায়ন ও সারিপুত্র বুদ্ধের করুণা লাভ করলেন তারই ইতিবৃত্ত। প্রকরণটিতে নাট্যশাস্ত্রের সমস্ত নির্দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রতিপালিত হয়েছে বলে পণ্ডিতমহলের ধারণা। এই সঙ্গে আরো ছুটি রচনা পাওয়া গেছে যাদের পরিচয় উদ্ধার করা যায় নি।

তিন ॥ পতঞ্জলির সময় আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ১৪০ অব্দ। তাঁর মহাভাষ্যে নাট্যপ্রদর্শনীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

চার ॥ পাণিনির গ্রন্থে নটসূত্রের উল্লেখ আছে। নটসূত্রকার হিসেবে কৃশাশ্ব ও শিলাদিত্যের নাম পাওয়া যায়। পাণিনির সময় আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ-পঞ্চম শতক। মহামতি তিলকের মতে খৃষ্টপূর্ব ২,০০০ অব্দ—গোল্ডষ্টুকারের ও ভাণ্ডারকারের মতে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে পাণিনি জীবিত ছিলেন।

পাঁচ ॥ খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে গিরনারের অশোকলিপিতে রঙ্গশালার আভাস দেখতে পাওয়া যায়। ডঃ ভাণ্ডারকার প্রমুখ বিশেষজ্ঞ মনে করেন—'প্রভু হিতভ্যাম্ ন চ সমাজো কতব্যো বহুকম' অংশের উল্লিখিত সমাজ বলতে এমন এক স্থান বোঝানো হয়েছে, যেখানে জনসাধারণ একত্র হয়ে সংগীত, নৃত্য ও অন্যান্য প্রমোদ উপভোগ করতে পারে। বাৎসায়নের কামসূত্রেও* সমাজ বলতে নাটকের প্রযোজনা-উপযোগী মঞ্চকে নির্দেশ করা হয়েছে।

ছয় ॥ ১৯১০ সালের মে মাসে শ্রদ্ধেয় গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় ত্রিবাঙ্কুরের এক প্রাচীন গ্রন্থশালা থেকে ভাস-নামাঙ্কিত দশখানি পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন। পরে

* **Chowkhamba Sanskrit series, Pp. 49-51**

অন্যান্য জায়গা থেকেও অনুরূপ কয়েকখানি রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। এই রচনার অনবদ্য শৈলীর সঙ্গে নাট্যশাস্ত্রের কোন মিল নেই। তাঁর সময় সম্বন্ধে কেউ কেউ খৃষ্টীয় প্রথম শতকের কথা বলেছেন। কিন্তু অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনে করেন, সে রচনার ভাষাবিচার করলে ভাস খৃষ্টপূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতকে জীবিত ছিলেন বলা চলে। তাঁর ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ বিচার করে বলা হয়েছে—সম্ভবতঃ পাণিনির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না।

এখন বিচার্য ভরতের নাট্যশাস্ত্র কি যথার্থ খৃষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের গ্রন্থ, না তার পূর্বেও প্রচলিত ছিল? অশ্বঘোষের রচনা ভরতকে খৃষ্টের জন্মের আগের যুগে স্থাপন করে। আবার এদিকে পতঞ্জলি, পাণিনি বা ভাসের রচনায় ভরতের কোন উল্লেখ নেই। অতএব এদের মধ্যবর্তী যুগে খৃষ্টপূর্ব প্রথম-দ্বিতীয় শতকের মানুষ ভরত অথবা নাট্যশাস্ত্র এই সময়ের রচনা বলা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সূত্রগুলো অনেক আগে থেকেই, বিভিন্ন রচনা ও প্রযোজনার ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠতে শুরু করেছে। এ সিদ্ধান্ত করা মোটেই অসমীচীন হবে না। তাই যদি হয়, তাহলে সে প্রযোজনা কখন হয়েছিল? পাণিনিকে যদি খৃষ্টপূর্ব দু'হাজার বছর আগে ধরা হয়, তাহলে তার পূর্ববর্তী নটসূত্রের কথা মনে রাখা প্রয়োজন। তাহলে মোটামুটি ভাবে প্রথম নাটকের জন্ম খৃষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর আগে হয়েছে বলা যেতে পারে। কিন্তু পাণিনি যদি খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মানুষ হন, তাহলে ঐ সময় হবে খৃষ্টপূর্ব হাজার বছরের কিছু বেশী। প্রকৃতপক্ষে নটসূত্রকে নাটক ও নাট্যতত্ত্বের ভ্রূণাবস্থা বলা উচিত। সেকথা নিয়ে Weber, Sten konow প্রমুখ বলেন, পাণিনি সম্ভবতঃ নৃত্যশিল্পী ও মূকাভিনেতাদের সম্পর্কে নটসূত্র শব্দটি ব্যবহার করেন। Sylvain Levi ও Hillebrandt বলেছেন সূত্রগুলো নাটক ও অভিনেতা সম্পর্কীয়। এই মতটি স্বীকার্য, তাছাড়া হিন্দু নাটকের শ্রেণীগত বিবর্তনের ধারাটি লক্ষ্য করলে তার যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে। এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় মনোমোহন ঘোষ তাঁর 'The History of Hindu Drama' গ্রন্থে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেছেন। বলা বাহুল্য সে পর্ব উৎসপ্রসঙ্গের বিষয় নয়।

●

হিন্দু নৃত্য

ব্রজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সংগীতের ন্যায় হিন্দু নৃত্যকলা স্বতঃস্ফূর্ত কলাশাস্ত্র। সাধকের অন্তরের ভাব বাণী হতে সংগীতে রূপায়িত হয় এবং সংগীতেও যখন ঈপ্সিত বস্তুর সম্যক্ উপলব্ধি ঘটে না, তখন সংগীত রূপায়িত হয় অঙ্গভঙ্গিমার রহস্যময় ছন্দে।

সকল শিল্পসৃষ্টির মূলে আছে নতুন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা, অন্তরের সুগভীর আবেগ ও আকৃতিকে প্রকাশের সুতীব্র তাড়না। হিন্দুনৃত্যের জন্ম-ইতিহাসও এ আবেগ ও আকাঙ্ক্ষায় বিধৃত। সৃজনধর্মী নৃত্যশিল্পে তাই বিষয়বস্তু বা কাহিনীর সম্প্রাসরণ ও পরিবর্তনকে প্রয়োজনবোধে স্বাগত জানাতে কুণ্ঠা দেখি না। রূপসজ্জা, বর্ণবহুল পরিচ্ছদ ও আলোকের বর্ণাঢ্য ধারায় নর্তক ও নর্তকী মধুর স্বপ্নের অপরূপ মায়াজাল রচনা করে। সেই সংগে লহরেখা ও অঙ্গভঙ্গিমা এনে দেয় সংগতি।

এই নৃত্যশিল্পকে লঘু আমোদের উপকরণ হিসাবে দেখলে কিন্তু ভুল হবে। একনিষ্ঠ সাধনায় এ শিল্পকে আয়ত্ত করা সম্ভব।

বৈদিক যুগ থেকে নৃত্যকে সাধনার অঙ্গ হিসাবে দেখা হয়েছে। দেখা যায় বৈদিক যুগে হোতারা হোমকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে নৃত্য করতেন, সাথে উদাত্ত কণ্ঠে বেদের মন্ত্র পাঠ করা হোত। সেই মন্ত্রের সাথে অঙ্গ সঞ্চালন, মুখের ভাব পরিবর্তন দ্বারা মনের বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করা হোত। এই নৃত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল স্বর্গের দেবদেবীদের যজ্ঞস্থলে আহ্বান করা।

বিভিন্ন শাস্ত্র হতে জানতে পারা যায় নটরাজ কর্তৃক প্রথম নৃত্যসৃষ্টির বর্ণনা; এ থেকে সহজেই বোঝা যায় নৃত্য কিরূপ আবেগময়, চিত্তহারী ও মনোহর। ঊষার কিছু আগে শিব-শরীরে 'ওজরস' সঞ্চারিত হয় এবং সেই ওজরসের উন্মাদনায় শিব নৃত্য আরম্ভ করেন, সেই নৃত্য দেখার জন্য, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, অপ্সরা, গন্ধর্ব ও কিন্নরীবৃন্দ সমবেত হন ও আত্মহারা হয়ে পড়েন। নৃত্যের ভেতর যেন কি এক মায়ার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি হয় যার ফলে স্বর্গবাসীরা সম্মোহিত হয়ে পড়েন। নটরাজ ক্ষান্ত হন কিন্তু স্বর্গবাসীদের সম্মোহিত ভাব দূর হয়না; তখন নটরাজ তাদের এই অবস্থা লক্ষ্য করে পুনরায় আরম্ভ ক'রলেন আর এক নৃত্য। এই নৃত্যে তাঁদের মোহ ভঙ্গ হোল বটে, কিন্তু

তাঁরা নটরাজের সাথে সমতালে ও লয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সঞ্চালন করতে লাগলেন। নটরাজ পুনরায় থামেন তাঁর নৃত্য হতে, স্বর্গবাসীরাও নিবৃত্ত হন। এই হো'ল হিন্দু নৃত্য — যে নৃত্যের দ্বারা নিজেকে ভরিয়ে তোলা যায় ও অপরকে সম্মোহিত করা যায়। শিবের সেই নৃত্য আজও স্বর্গ, মর্ত ও অন্তরীক্ষে ব্যাপৃত হয়ে আছে; সমস্ত মানবগোষ্ঠীকে স্বর্গবাসী দেবতার ন্যায় আজও ছন্দায়িত করছে। তাইতো মানুষের প্রাণের চঞ্চলতা, আকুলতা ও উচ্ছ্বাস আজও প্রকাশ পায় অজানিত ভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সঞ্চালনে এবং তা প্রকৃতিকেও ছন্দায়িত করছে প্রতি তৃণে তৃণে ও প্রাণীজগতের ভেতর দিয়ে। ছন্দ-মধুর লাস্যময় মৌন কলা এই হিন্দু নৃত্য। এই হিন্দু নৃত্যের মধ্যে আর্য ঋষিগণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন এক বিশাল অধ্যাত্মজগৎ। ভরত-শাস্ত্রে সেই দর্শনকে উপলব্ধি করে প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে।

হিন্দু নৃত্যের তিনটি বিভাগ—১। নাট্য ২। নৃত্ত ৩। নৃত্য।

নাট্য—ইহা রসাশ্রিত; ভাষাপ্রয়োগের সাথে অঙ্গবিক্ষেপ করে কোন বিষয়বস্তুকে ব্যক্ত করাই নাট্য।

নৃত্ত—ইহা তালাশ্রিত; শুধুমাত্র তাল-লয় সহযোগে অঙ্গবিক্ষেপ করাই নৃত্ত।

নৃত্য—ইহা ভাবাশ্রিত; ভাষাপ্রয়োগ ব্যতিরেকে কেবলমাত্র সুকুমার অঙ্গ-ভঙ্গিমার সাহায্যে লীলায়িত ছন্দে, তাল-লয় সহযোগে কোন বিষয়কে ব্যক্ত করাই নৃত্য।

নৃত্যের চারিটি প্রধান অংশ—করণ, অঙ্গহার, মাত্রিকা ও রেচক।

করণ— হস্তচালনা ও পদচালনার সমন্বয় বা একীকরণের নাম 'করণ'।

মাত্রিকা—একাধিক অক্ষর সংযুক্ত করে যেমন এক একটি 'শব্দ' বা 'কথার' জন্ম হয় এবং একাধিক শব্দকে যথাযোগ্যভাবে সাজিয়ে যেমন মৌখিক ভাষার সমস্ত বাক্য (sentence) প্রস্তুত হয়, সেইরূপ নৃত্যবিদ্যার দুই করণ একত্র করে একটি 'মাত্রিকা' বা নৃত্যভঙ্গি গণনায় এক সংখ্যা (unit) হয়।

অঙ্গহার—দুই, তিন কিংবা চার 'মাত্রিকা'র দ্বারা একটি অঙ্গহার বা অঙ্গচালনার মালা প্রস্তুত হয়।

রেচক—ইহা অঙ্গ-বিক্ষেপের লক্ষণ। রেচক চার জায়গায় প্রয়োগ হয়। পদে পাদ-রেচক, কটিতে কটিরেচক, হস্তে হস্তরেচক ও কণ্ঠে কণ্ঠরেচক।

সমগ্র নৃত্যকলাকে চারিটি অভিনয়ের দ্বারা বিভক্ত করা হয়েছে—

(১) আঙ্গিক (২) বাচিক (৩) আহার্য (৪) সাত্ত্বিক।

১। যে অভিনয়ে অঙ্গ, উপাঙ্গ ও প্রত্যঙ্গাদির ব্যবহার দ্বারা ভাব প্রকাশ করা হয় তাই 'আঙ্গিকাভিনয়'।

২। কাব্য-নাটকাদিতে বাক্যের দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করাই 'বাচিকাভিনয়'।

৩। যাহা শরীরের স্বাভাবিক নয়, পরন্তু বেশভূষা প্রভৃতি কৃত্রিম উপায়ের সাহায্যে সম্পাদন করতে হয়, তাকে আহার্যাভিনয় বলে।

৪। মনের বিবিধ পরিস্থিতির উদ্রেক করে (যথা, রোমাঞ্চ, অশ্রু প্রভৃতি) দৃষ্টির দ্বারা সম্পাদন করা ও ফুটিয়ে তোলাই 'সাত্ত্বিকাভিনয়'।

সাধারণভাবে হিন্দু নৃত্যের মূলতত্ত্ব এই। একাধারে জটিলতা, অন্যধারে ভাব ও ধর্মের সমন্বয়ই হিন্দু নৃত্যের বিশেষত্ব। হিন্দু নৃত্যশাস্ত্র এমন সুকৌশলে রচিত যার নিয়মিত অভ্যাসের ফলে লাভ করা যায় দেহের নমনীয়তা, সাবলীল ভঙ্গিমা, অঙ্গের কমনীয়তা, ছন্দোময় গতি, নীরোগ স্বাস্থ্য, নীরব ভাষাময় সঞ্চালন আর রহস্যময় আঁখি। এদেরই সমন্বয়ে সৃষ্ট হয় এক ঐন্দ্রজালিক পরিবেশ।

●

নাট্যশাস্ত্রে নাট্যোৎপত্তি কথা

(পূর্বানুবৃত্তি)

আরতি মৈত্র

মহামুনি ভরত নাট্যশাস্ত্রের প্রবক্তা। ইহার প্রথম অধ্যায়ে নাটকের উৎপত্তি, বৈশিষ্ট্য ও প্রথম নাটকের প্রযোজনার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে ভরতমুনির মুখে উত্তম-পুরুষে। সম্পূর্ণ নাট্যশাস্ত্রখানিই আচার্য ভরত তাঁহার দিব্য প্রতিভার মাধ্যমে কখনও গদ্য-ছন্দে এবং কখনও পদ্য-ছন্দে উত্তম-পুরুষে বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়টি অনুবাদাকারে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা গেল।

এক অনধ্যায় দিবসে ভরতমুনি সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষে শতপুত্রসহ বসিয়াছিলেন। এমন সময়ে আত্রেয় প্রমুখ ধী-সম্পন্ন ও সংযতেন্দ্রিয় মুনিগণ সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁহার নিকট নাট্যবেদ সম্বন্ধে জানিতে চাহিলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবান ব্রহ্মা কাহার নিমিত্ত এবং কিরূপে এই বেদ সৃষ্টি করিয়াছেন—নাট্যবেদের কতগুলি অঙ্গ এবং ইহার প্রয়োগতত্ত্ব কিরূপ, তাহাও তাঁহারা ভরতমুনিকে বলিতে অনুরোধ করিলেন।

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রাজ্ঞ ভরতমুনি নাট্যবেদের উৎপত্তির কারণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন ঃ

"বহু যুগ পূর্বে স্বয়ম্ভুব মনুর কালাবসানের সঙ্গে সঙ্গে সত্যযুগের পরিসমাপ্তি এবং বৈবস্বত মনুর কালের সহিত ত্রেতাযুগের আগমে মানুষ গ্রাম্য ধর্মের প্রভাবে কাম, ক্রোধ, লোভ ও ঈর্ষার বশীভূত হইয়া সুখ ও দুঃখে অভিভূত হইল।"

ইহাতে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"আমরা এমন একটি ক্রীড়নীয়ক চাই যাহা দৃশ্য ও শ্রব্য হইবে।"

মহেন্দ্র প্রমুখৈর্দেবৈরুক্তঃ কিল পিতামহঃ।
ক্রীড়নীয়কমিচ্ছামো দৃশ্যং শ্রব্যং চ যদ্ভবেৎ॥ ১১

যেহেতু শূদ্রজাতির চতুর্বেদ ব্যবহারের বা শ্রবণ করিবার অধিকার নাই, সেই হেতু আপনি সর্ববর্ণিক পঞ্চম বেদ সৃজন করুন।

ন বেদ ব্যবহারোঽয়ং সংশ্রাব্যঃ শূদ্রজাতিষু।
তস্মাৎ-সৃজাপরং বেদং পঞ্চমং সর্ববর্ণিকম্॥

ব্রহ্মা সর্বকর্ম-সমন্বিত, সর্বশাস্ত্র ও সর্বশিল্পের পথপ্রদর্শক নাট্যবেদ রচনা করিবেন এইরূপ সংকল্প করিয়া সর্ববেদের অনুসরণে চতুর্বেদ হইতে নাট্যবেদ (পঞ্চম বেদ) রচনা করিলেন।

ঋগ্বেদ হইতে পাঠ্যভাগ, সামবেদ হইতে সঙ্গীত, যজুর্বেদ হইতে অভিনয় ও অথর্ববেদ হইতে রস চয়ন করিয়া নাট্যশাস্ত্র রচিত হইল।

জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্বণাদপি॥ ১৭

পিতামহ ব্রহ্মা এই বেদ দেবগণকে সমর্পণ করিতে বলিলেন। এইরূপ নির্দেশ দিলেন যে যাঁহারা কুশলী, বিদগ্ধ, প্রগল্‌ভ ও শ্রমজয়ী কেবলমাত্র তাঁহাদিগকেই ইন্দ্র এই নাট্য-সংজ্ঞক বেদ দান করিবেন।

কুশলা যে বিদগ্ধাশ্চ প্রগল্‌ভাশ্চ জিতশ্রমাঃ।
তেম্বয়ং নাট্যসংজ্ঞো হি বেদঃ সক্রাম্যতাং ত্বয়া॥ ২০

দেবগণ এই পঞ্চম বেদ গ্রহণে, ধারণে, প্রয়োগে ও নাট্যকর্মে অশক্ত ও অযোগ্য এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া ইন্দ্র ইহা ঋষিগণকে দান করিতে অনুরোধ করিলেন, কারণ ঋষিগণ বেদজ্ঞ ও ব্রতপালনকারী এবং সেই হেতু ইহা গ্রহণে, ধারণে ও প্রয়োগে সমর্থ।

গ্রহণে, ধারণে, জ্ঞানে প্রয়োগে চাস্য সত্তম।
অশক্তা ভগবন্ দেবা অযোগ্যা নাট্যকর্মণি॥ ২২
য ইমে বেদগুহ্যজ্ঞা ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
এতেঽস্য গ্রহণে শক্তা প্রয়োগে ধারণে তথা॥ ২৩

ইন্দ্রের অনুরোধে পিতামহ এই নাট্যবেদ শতপুত্রসহ আমাকে দান করিলেন। আমি ব্রহ্মার নিকট হইতে নাট্যশাস্ত্র গ্রহণ করিলাম। (এইখানে নাট্যাচার্য তাঁহার শতপুত্রের নামোল্লেখ করিয়াছেন) এই নাট্যবেদের প্রয়োগ আরম্ভ হইবে তিনটি বৃত্তির (style) সাহায্যে—ভারতী, সাত্বতী ও আরভটী।

ভারতীং সাত্বতীং চৈব বৃত্তিমারভটীং তথা।
সমাশ্রিতঃ প্রয়োগস্তু প্রযুক্তো বৈ ময়া দ্বিজাঃ॥ ৪১

ব্রহ্মার অনুজ্ঞা পরিগ্রহণ করিয়া প্রণাম করিবার পর সুরগুরু আমাকে কৈশিকী বৃত্তিতে (Graceful Style) প্রযোজনা করিতে আদেশ করিলেন।

এই বৃত্তির জন্য সুন্দর পরিচ্ছদ, অঙ্গহার ও রস, ভাব ইত্যাদির প্রয়োজন। ভগবান নীলকণ্ঠের নৃত্যকালে দেখিয়াছি যে সূক্ষ্ম শৃঙ্গার রস হইতে কৈশিকী বৃত্তির উদ্ভব হয়। পুরুষ এই সূক্ষ্ম রস সৃষ্টি করিতে অশক্ত, সেই হেতু আমি নারীগণকে এই প্রয়োগকর্মে নিযুক্ত করিলাম এবং ব্রহ্মা মন হইতে অপ্সরাদিগকে ধ্যানযোগে সৃজন করিলেন।

দৃষ্ট্বা ময়া ভগবতো নীলকণ্ঠস্য নৃত্যতঃ।
কৈশিকী শ্লক্ষ্ণনৈপথ্যা শৃঙ্গাররসসম্ভবা॥ ৪৫

অশক্যা পুরুষৈঃ সা তু প্রযোক্তুং স্ত্রীজনাদৃতে।
ততোঽসৃজন্মহাতেজা মনসাঽপ্সরসো বিভুঃ॥ ৪৬

যন্ত্রসঙ্গীতবাদনের নিমিত্ত সশিষ্য স্বাতীকে এবং সঙ্গীত পরিবেশনের নিমিত্ত দেবর্ষি নারদ ও অন্য কয়েকজন নিযুক্ত হইলেন।

নন্দাং সপুষ্কলাং চৈব কলমাং চৈব মে দদৌ।
স্বাতীর্ভাস্তনিযুক্তস্তু সহ শিষ্যৈঃ স্বয়ম্ভুবা॥ ৫০
নারদাদ্যাশ্চ গন্ধর্বা গানযোগে নিয়োজিতাঃ।
এবং নাট্যমিদং সম্যগ্ বুধ্বা সর্বৈঃ সুতৈঃ সহ॥

এইরূপে নাট্যকলা করায়ত্ত করিবার পর সপুত্র আমি, নারদ ও স্বাতী পিতামহের নিকট পরবর্তী নির্দেশ প্রার্থনা করিলাম। ব্রহ্মা বলিলেন, "নাট্য প্রয়োগের সময় উপস্থিত। মহেন্দ্রবিজয় উপলক্ষে ধ্বজা-উৎসব উপলক্ষে এই নাট্যশাস্ত্রের প্রয়োগ কর।"

মহানয়ং প্রয়োগস্য সময়ঃ প্রত্যুপস্থিতঃ।
অয়ং ধ্বজমহঃ শ্রীমান্ মহেন্দ্রস্য প্রবর্ততে॥ ৫৪

পিতামহের আদেশে "মহেন্দ্রবিজয়" উৎসব উপলক্ষে আমি প্রথম নাটকটির প্রযোজনার আয়োজন করিলাম। অসুর-নিধনে আনন্দিত দেবগণের সন্তোষের নিমিত্ত প্রথমে অষ্টাঙ্গ-ভাষায় আশীর্বচনসমন্বিত নান্দী রচনা করিবার পরে দেবগণ কর্তৃক অসুরগণের পরাজয়ের কাহিনী অবলম্বন করিয়া নাটকাভিনয় করি। অভিনয়ে প্রীত দেবগণ সসম্প্রদায় আমাকে সন্তুষ্টির নিদর্শনস্বরূপ নাটকের উপকরণসমূহ দ্বারা পুরস্কৃত করিলেন। ইন্দ্র দান করিলেন জর্জরদণ্ড, ব্রহ্মা কুটিলক, বরুণ স্বর্ণকলস, সূর্যদেব ছত্র, শিব সাফল্য, বায়ু ব্যজন, বিষ্ণু সিংহাসন, কুবের কিরীটি এবং সরস্বতী দর্শন ও শ্রবণশক্তি (visuality and audibility)।

অভিনয়ের আরম্ভেই সমুপস্থিত দৈত্যসকল দানবকুলের নাশ দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

বিরূপাক্ষের নেতৃত্বে দুষ্ট আত্মাসকল (বিঘ্ন) মায়াবলে অভিনেতৃবৃন্দের বাক্, স্মৃতি এবং গতি স্তব্ধ করিয়া দিল। ইন্দ্র ধ্যানযোগে এই সংবাদ অবগত হইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ধ্বজদণ্ডের সাহায্যে বিঘ্নদিগকে আঘাতে জর্জরিত করিয়া রঙ্গপীঠ হইতে অপসারিত করিলেন। তাহারা নিহত হইল। বিঘ্নসকলকে জর্জরিত করার জন্য ইন্দ্রের ধ্বজদণ্ডটি দেবগণ কর্তৃক "জর্জরদণ্ড"—এই নূতন নামে নামাঙ্কিত হইল। ইন্দ্র এইরূপে ঘোষণা করিলেন যে এই জর্জরদণ্ড সমস্ত অভিনেতার রক্ষাকর্তা হইবে। তৎপরে নাটকের অবশিষ্টাংশ অভিনয় হয়। কিন্তু এই সময় অপর বিঘ্নসকল অধ্যবসায়ের সহিত আমাকে

হত্যা করিবার এবং অভিনয়ে ব্যাঘাত ঘটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আমি সপুত্র ব্রহ্মাকে সমস্ত নিবেদন করিয়া আত্মরক্ষার উপায় জিজ্ঞাসা করিলাম। পিতামহ তখন বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করিয়া অতি যত্নের সহিত শ্রেষ্ঠ নাট্যগৃহ নির্মাণের আদেশ দিলেন। অচিরাৎ বিশ্বকর্মা সর্বলক্ষণসম্পন্ন নাট্যগৃহ নির্মাণ করিলেন।

ততশ্চ বিশ্বকর্মণঃ ব্রহ্মোবাচ প্রযত্নতঃ
কুরু লক্ষণসম্পন্নং নাট্যবেশম্ মহামতে॥ ৭৯
ততোঽচিরেণ কালেন বিশ্বকর্মা মহচ্ছুভম্।
সর্বলক্ষণসম্পন্নং কৃত্বা নাট্যগৃহং তু স॥ ৮০

ব্রহ্মা এবং দেবতাগণ নাট্যগৃহ পরিদর্শন করিলেন। ব্রহ্মা দেবগণকে সমবেতভাবে নাট্যগৃহ রক্ষা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন। দেবগণ নাট্যগৃহের বিভিন্ন অংশ রক্ষা করিবার দায়িত্ব নিজ নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন। চন্দ্র প্রধান অট্টালিকার, যম প্রবেশদ্বারের; অনন্ত ও বাসুকী প্রবেশদ্বারের, দুইটি কবাটের ও মেঘ বাদ্যযন্ত্রগুলি রক্ষার ভার নিলেন। ব্রহ্মা মঞ্চের মধ্যভাগে অধিষ্ঠিত হইলেন কারণ নাটকাভিনয়ের পূর্বে মঞ্চোপরি পুষ্পবর্ষণের বিধি ছিল। মহেন্দ্র নায়কের, সরস্বতী নায়িকার, ওঙ্কার বিদূষকের এবং শিব অবশিষ্ট সকল অভিনেতার রক্ষাকর্তা হইলেন।

কিছুকাল পরে দেবগণ ব্রহ্মা সমীপে উপস্থিত হইয়া দৈত্যগণকে শান্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। ইহাতে ব্রহ্মা নাটকের বৈশিষ্ট্যসকল বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দৈত্যগণকে বলিলেন—"ইহাতে কেবল দেবতা ও আপনাদের কথাই নাই; ইহাতে ত্রিলোকের সকলের ভাব বর্ণিত হইয়াছে।

নৈকান্ততোঽত্র ভবতাং দেবানাং চানুভাবনম্।
ত্রৈলোকস্যাস্য সর্বস্য নাট্যং ভাবানুকীর্ত্তনম্॥ ১০৭

ইহাতে কখনও ধর্ম, কখনও ক্রীড়া, কখনও অর্থ, কখনও শ্রম, কখনও হাস্য, কখনও যুদ্ধ, কখনও কাম এবং কখনও বধের কথা আছে।

ক্বচিদ্ধর্ম ক্বচিৎ ক্রীড়া ক্বচিদর্থ ক্বচিচ্ছ্রম।
ক্বচিৎ হাস্যং ক্বচিৎ যুদ্ধ ক্বচিৎ কামঃ ক্বচিৎ বধঃ॥ ১০৮

ইহাতে ধার্মিক ব্যক্তির ধর্ম, কামসেবিদিগের কাম, দুর্বৃত্তের নিপীড়ন এবং বিনয়ীর সংযমের কথা আছে।

ধর্মো ধর্মপ্রবৃত্তানাং কামঃ কামোপসেবিনম্।
নিগ্রহো দুর্বিনীতানাং বিনীতানাং দমক্রিয়া॥ ১০৯

ইহাতে ক্লীবের ধৃষ্টতা, বীর ও মানী ব্যক্তিদিগের উৎসাহ, মূর্খের প্রতি উপদেশ ও বিদ্বান্ ব্যক্তির জ্ঞানের কথা আছে।

ক্লীবানাং ধাষ্টর্যজননমুৎসাহঃ শূরমানিনাম্।
অবুধানাং বিবোধশ্চ বৈদুষ্যং বিদুষামপি ॥ ১১০

ইহাতে নৃপতির (কিম্বা ধনীর) বিলাসিতা, দুঃখীর স্থৈর্য, অর্থোপার্জনেচ্ছুর অর্থপ্রাপ্তি এবং উগ্রচেতার আত্মগ্লানির কথা আছে।

ঈশ্বরাণাং বিলাসশ্চ স্থৈর্যং দুঃখার্দিতস্য চ।
অর্থোপজীবিনামর্থো ধৃতিরুদ্বিগ্রচেতসাম ॥ ১১১

লোকবৃত্তির অনুকরণে মানুষের নানা ভাব এবং অবস্থান্তর সমন্বিত এই নাট্য আমা দ্বারা সৃষ্ট।

নানা ভাবোপসম্পন্নং নানাবস্থান্তরাত্মকম্।
লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতন্ময়া কৃতম্ ॥ ১১২

ইহাতে উত্তম, মধ্যম ও অধম মানুষের কর্মসংস্থানের কথা, মানুষের প্রতি হিতোপদেশ, সংযম, ক্রীড়া ও সুখাদির কথা আছে।

উত্তমাধমমধ্যানাং নরাণাং কর্মসংশ্রয়ম।
হিতোপদেশজননং ধৃতিক্রীড়াসুখাদিকৃৎ ॥ ১১৩

এই নাট্যশিল্প দুঃখী, শ্রমক্লান্ত ও শোকার্ত মানুষের ও তপস্বীদিগের বিশ্রান্তিজনক হইবে।

দুঃখার্তানাং শ্রমার্তানাং শোকার্তানাং তপস্বিনাম্।
বিশ্রান্তিজননং কালে নাট্যমেতদ্ভবিষ্যতি ॥ ১১৪

এই নাট্যশিল্পের দ্বারা ধর্ম, যশ, আয়ু, হিত ও বুদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহা হইতে মানুষ উপদেশ লাভ করিবে।

ধর্ম্যং যশস্যমায়ুষ্যং হিতং বুদ্ধিবিবর্দ্ধনম্।
লোকোপদেশজননং নাট্যমেতদ্ভবিষ্যতি ॥ ১১৫

এমন কোন জ্ঞান, শিল্প, বিদ্যা, কলা, যোগ এবং কর্ম নাই যাহা এই নাট্যে দেখা যায় না।

ন তৎ জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
নাসৌ যোগো ন তৎ কর্ম নাট্যেহস্মিন্ যন্ন দৃশ্যতে ॥ ১১৬

এই নাট্যশিল্প সপ্তদ্বীপাধিবাসীর অনুকৃতি।

সপ্তদ্বীপানুকরণং নাট্যমেতদ্ভবিষ্যতি। ১১৭

শ্রুতি, স্মৃতি ও সদাচারের সমন্বয় এই নাট্যশিল্প মানুষের মনোরঞ্জন করিবে।"

শ্রুতিস্মৃতিসদাচারপরিশেষার্থকল্পনম্।
বিনোদজননং লোকে নাট্যমেতদ্ভবিষ্যতি ॥ ১২০

নাট্যশিল্পের বৈশিষ্ট্যাদি শ্রবণ করিয়া দৈত্যগণ শান্ত হইল। পিতামহ দেবগণকে বলি, হোম, মন্ত্র, ভোজ্য এবং পানীয় সহযোগে পূজা অর্পণ করিতে নির্দেশ দান করিলেন।

ব্রহ্মা এইরূপ নির্দেশ দিলেন যে নাট্যাভিনয়ের পূর্বে নাটকসংশ্লিষ্ট সকলকে মঞ্চোপরি অধিষ্ঠিত দেবগণের উদ্দেশ্যে পূজা দিতে হইবে, অন্যথায় প্রভূত ক্ষতি হইবে এবং লোকান্তরিত হইবার পর নিম্ন শ্রেণীর পশুকুলে পুনর্জন্ম হইবে। যে শিল্পী বিধি-সম্মতরূপে দেবগণকে পূজা করিবেন, তিনি জীবিতকালে প্রচুর সম্পদ লাভ করিবেন এবং দেহান্ত ঘটিবার পর স্বর্গাসীন হইবেন। এইরূপ বলিয়া ব্রহ্মা আমাকে মঞ্চে পূজা অর্পণ করিতে বলিলেন।

এইখানেই নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তি।

ইতি ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে নাট্যোৎপত্তির্নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

১। নাট্যশাস্ত্রম্—(vol. I) শ্রীমদভিনবগুপ্তাচার্যবিরচিত বিবৃতিসমেতম্।
Gaekwad's Oriental series ....No. XXXVI
২। Masters of Drama—John Gassner.
৩। নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার (১ম ভাগ)—ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য।
৪। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস (২য় খণ্ড)—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ।
৫। The Sanskrit Drama—A. B. Keith.
৬। Yatra : Old and Modern—Amar Nath Pathak.
৭। The Natya Sastra (Tr.)—Dr. Mano Mohan Ghosh.
(Royal Asiatic Society Ed.)

মোন্‌পা বোন আমার

চিত্তপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

সে এক উজ্জ্বল মুহূর্তে তোমার সাথে দেখা,
মোন্‌পা বোন আমার !
স্বামীর মৃতদেহের পাশে বসে
অগ্নিঝরা দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলে সীমান্তের পানে ;
চারিদিকে পোড়া বারুদের গন্ধ।
ড্রাগনের নিঃশ্বাস। তোমার চোখে জল ছিল না।
সেই সে উজ্জ্বল মুহূর্তে তোমার সাথে দেখা॥

তোমাদের শান্তি, তোমাদের আশার নীড়
যাদের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে পুড়েছে, তাদের
আমরা ক্ষমা করব না।
ড্রাগনের মুখে আর চুমু খাব না।
তোমরা ভয় পেও না॥

তোমরা ভয় পেও না,
মোন্‌পা বোন আমার !
অমৃত কুম্ভের সন্ধান আমরা পেয়েছি,
অমৃতের পুত্র আমরা।
মোন্‌পা বোন আমার !
তোমরা ভয় পেও না॥

মোন্‌পা বোন আমার !
তোমাদের শান্তি, তোমাদের আশার নীড়
আমরা আবার গড়ে তু'লব,
হাতিয়ার তু'লে নিয়ে হাতে হাত দাও
শত্রুর শেষ রাখব না।
তোমরা ভয় পেও না,
মোন্‌পা বোন আমার !
শান্তি সূর্য আবার উঠবে॥

আমাদের আঙ্গিনায়

গত দু'মাসে আমাদের রবীন্দ্র ভারতী-আঙ্গিনায় অনেক ছোট বড় উৎসব হয়ে গেছে, অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির শুভাগমন ঘটেছে এখানে। সেই সব উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত-গুলি দিয়ে এবার আমাদের আঙ্গিনার পসরা সাজান হল।

এবার প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ১লা ফেব্রুয়ারী বেলা তিন ঘটিকায় বিশ্ব-ভারতী সঙ্গীত ভবনের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের "সঙ্গীত সাধনায় রবীন্দ্রনাথ" সম্পর্কে উদাহরণ সহযোগে বক্তৃতার কথা।

* * * *

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩ তারিখে জার্মাণ সাধারণতন্ত্রের অধ্যাপক এমিল লিওনার্ট ও শ্রীমতী লিওনার্ট এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

* * * *

৫ই ফেব্রুয়ারী বেলা একটায় কম্বোডিয়ার মহামান্য যুবরাজ নরোদম সিহানুক সদলবলে তাঁর রাজকীয় সফরকালে জোড়াসাঁকো মহর্ষি ভবন পরিদর্শন করেন। এই উপলক্ষে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য অভিনীত হয়।

এই দিনই বিকালে মালয় ও সিঙ্গাপুর থেকে আগত দশজন সদস্যযুক্ত এক সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানানো হয়। তাঁরা সকলেই বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহের সংগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত ও নৃত্যের ক্লাশ ও সংগ্রহশালা পরিদর্শন করেন।

* * * *

১৪ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৯-৪০ মিনিটে গ্রীসের মহামান্য সম্রাটদম্পতি ঐতিহাসিক জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ী ও রবীন্দ্র ভারতী প্রদর্শশালা পরিদর্শন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ মহামান্য রাজ-অতিথিগণকে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের কয়েকটি নির্বাচিত দৃশ্য অভিনয় করে দেখান।

* * * *

১৬ই ফেব্রুয়ারী বিকাল ২-৩০ মিনিটে যশস্বী নাট্যকার ও অভিনেতা শ্রীশম্ভু মিত্র নাটক সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ উপভোগ্য আলোচনা করেন।

এইদিন সকালেই ফ্রান্সের লিঁয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি

বিভাগের প্রধান, সংস্কৃত, প্রাকৃত ও হিন্দী ভাষায় সুপণ্ডিত শ্রীমতী কঁলেৎ কেলার্ট বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন।

* * * *

১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩ নাইজিরিয়া সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় দর্শনে আগমন করেন। এই উপলক্ষে মণিপুরী নৃত্যকক্ষে নৃত্যে রাসলীলা ও দোললীলা এবং সংগীতের আয়োজন করা হয়।

২০শে ফেব্রুয়ারী একটি ঘরোয়া সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন হয়। এই উৎসবে বিশিষ্ট অতিথিবর্গ এবং সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন।

* * * *

২১শে ফেব্রুয়ারী জাতীয় প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারের সাহায্যার্থে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে সংগৃহীত সমুদয় অর্থ উপাচার্য মহোদয়ের নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীবৃন্দ রাজ্যপালের হস্তে অর্পণ করেন।

* * * *

২রা মার্চ তারিখে সঙ্গীতাচার্য শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী 'অভিজাত সঙ্গীতের ক্রম-বিবর্তন' সম্পর্কে বক্তৃতা দেন।

* * * *

৬ই মার্চ সকাল দশটায় বিশ্ববিদ্যালয়মঞ্চে আমেরিকার প্রখ্যাত ব্যালেশিল্পী রবার্ট জিওফ্রে তাঁর নিজস্ব সম্প্রদায়ের ব্যালে প্রশিক্ষণপ্রণালী প্রদর্শন করেন। ইন্দো-আমেরিকান সোসাইটি ও ইউ. এস. আই. এস.-এর মিলিত উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল।

* * * *

২৬শে মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়-মঞ্চে নাটক-বিভাগীয় প্রধান নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর 'পদ্মশ্রী' প্রাপ্তি উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। নৃত্য-শাখার ছাত্রীদের 'নটরাজ বন্দনা' নৃত্যানুষ্ঠানের পর রবীন্দ্র-সাহিত্য বিভাগের ছাত্রী শ্রীমতী সবিতা মুখোপাধ্যায় অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। এই উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রীরা শ্রীযুক্ত চৌধুরীকে কিছু শিল্পসামগ্রী উপহার দেন। উপাচার্য মহোদয়, নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় এবং লেডী রাণু মুখার্জী সভায় ভাষণ দেন।

ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীকে মানপত্র ও শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করছেন
সবিতা মুখোপাধ্যায়
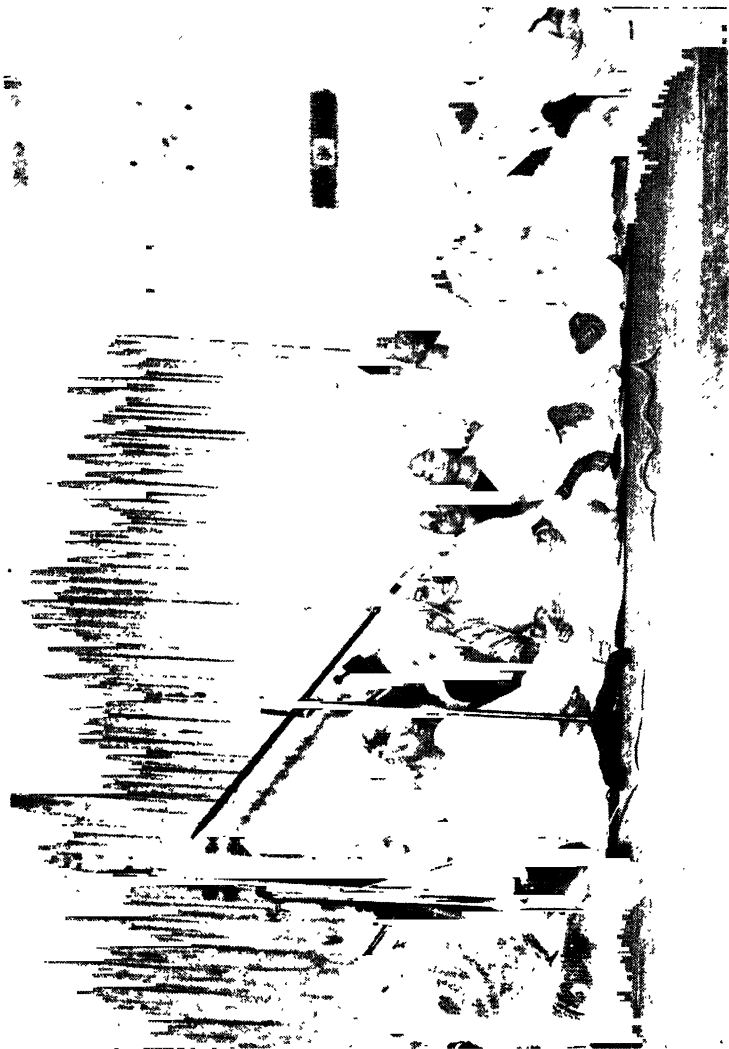
বসন্তোৎসবে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী মায়া সেন ও ছাত্রীবৃন্দ

২৭শে মার্চ, ১৯৬৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ কর্তৃক বসন্তোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। উপাচার্য মহোদয়ের স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপনের পর কালিদাসের ঋতুসংহার থেকে বসন্ত-বন্দনা গেয়ে শোনান সঙ্গীত-বিভাগের প্রধান সঙ্গীতাচার্য শ্রীরমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সঙ্গীত-বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতী মায়া সেন। এই অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরাও অংশ গ্রহণ করেন।

*　　*　　*　　*

২৮শে মার্চ প্রখ্যাত সরোদ-বাদক শ্রীশ্যাম গঙ্গোপাধ্যায় যন্ত্রসঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই উপলক্ষে বহু শিল্পরসিকের সমাগম ঘটেছিল।

*　　*　　*　　*

২৯শে মার্চ সন্ধ্যায় পোল্যাণ্ড সাধারণতন্ত্রের বিদ্যুৎ ও খনি দপ্তরের মন্ত্রী জে, মিট্রেগা ও ভারতে পোল্যাণ্ডের রাষ্ট্রদূত রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও সংগ্রহশালা পরিদর্শন করেন। 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের নির্বাচিত অংশ এই উপলক্ষে অভিনীত হয়। এই অনুষ্ঠান দেখে তাঁরা অত্যন্ত প্রীত হ'ন।

*　　*　　*　　*　　*

২রা এপ্রিল, ১৯৬৩ কলিকাতা, পাকিস্থান, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের মাননীয় ধর্মযাজক কবির জন্মভবনে পদার্পণ করেন। তিনি দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যার্থে ৫০০৲ টাকা দান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে কৃতজ্ঞচিত্তে আমরা তাঁর এই বদান্যতা ও মহানুভবতা স্মরণ করছি।

*　　*　　*　　*　　*

২০শে এপ্রিল অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের উত্তর পর্ব'-সম্পর্কে আকর্ষণীয় আলোচনা করেন।

●

প্রখ্যাত ধ্রুপদ-সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীতানসেন পাণ্ডে দীর্ঘকাল অসুস্থ থাকার পর গত ২রা মে সকালে ইসলামিয়া হাসপাতালে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বৎসর।

আলোয়ারের বিখ্যাত ধ্রুপদী আল্লা বন্দে খাঁ-র কনিষ্ঠ পুত্র হোসেনুদ্দীন খাঁ ধর্মান্তর গ্রহণ করেন এবং তানসেন পাণ্ডে নামেই মার্গ-সঙ্গীত জগতে পরিচিত হ'ন। প্রাচীন পদ্ধতির ধ্রুপদ-সঙ্গীতে বিশেষ পাণ্ডিত্য ছাড়াও ধ্রুপদ-সঙ্গীতে তাঁর ব্যক্তিগত বিশিষ্ট অবদান রয়েছে।

শ্রীতানসেন পাণ্ডে ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত-নৃত্য-নাটক একাডেমীতে যোগ দেন এবং পরে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হ'ন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন।

তাঁর মৃত্যুতে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েরই নয়, সমগ্র ধ্রুপদ-সঙ্গীত জগতেরই অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

আমরা তাঁর আত্মার সদ্‌গতি কামনা করি।

English Section

AN ETERNAL NIGHTINGALE *

ABDUL HAKIM

Poet, Philosopher and Guide !
India's Pride !
"Christ of the East", Europe says,
O Seer and Sage !

We know not who Orpheus was,
Grecian Bards plead his cause,
His music built Thebes old,
Of Eurydice, we are told,
Conditional release did he hold,
His lyre pleased Pluto cold !

Vaisnab Legends sweep before us,
Let Joydev and Vidyapati pass !
Eternal Krishna and his flute
Did charm beast and brute,
On the flowery bank of Jamuna
With many a Diana !
The Cow ! What ails thee ?
Beneath the Tamal tree,
Did she leave the grass where it was ?
The crystal waves did cause
Their natural course to turn,
By divine minstrelsy drawn !
Bool-Bool-e-Shiraz
Doth come away :
Let us to him our fealty pay !
He sang of Asheq,
He sang of Mashuq,
His Eternal Saqi, his cup of wine,
Gaveth unto the world songs divine !

So they come !
Let them come !
Musicians old
Of love untold,

---

* The writer of this poem, Mr. Abdul Hakim, is the former speaker of the Provincial Assembly, East Pakistan.

Orpheus with his lyre,
Joydev, Vidyapati seer !
One and all !
Make room for all !
For whom they come ?
Born in Maharshi's Aryasthan,
Fed on Shirazi's Gool-e-stan,
The Bard of Santi-niketan
Home hath gone !

Japan and China,
Germany and Britannia,
Russia and Italia,
Turkistan and Persia,
And who claimeth not kindred here,
And follow the Bier !
For it is the seer,
Who gaveth Truth,
Philosophic numbers smooth
Of Heaven and its mysteries,
Earth and her histories !
His 'magic hand of chance'
Did trace a high romance,
In the cloudy symbols of Moon and Star,
From dewy ground far afar !

Made a Heaven of Earth,
Our common Home and Hearth,
Where hand-in-hand
Love and anguish stand,
In Mother's fears,
And Beloved's tears,
And when to son and lover they
did bid "Adieu",
Such Heaven of Heavens Heaven never knew !
Urbashi from Heaven did descend
The low-roofed house to attend !
Not as a Mother, nor a Daughter fair,
Nor a Beloved either !
But in the storm's majesty,
In the seasons' beauty,
In the Dreams of Lovers
Near rivulets and bowers !
And by the incantation of the Poet's songs,
Eternally doth she dance !

O follow the Bier !
For it is the seer,
Who did lift the veil
That on the face of Nature fell !
"Beauty is Truth, Truth Beauty"
This his life's divine philosophy !
Truth in Nature, Truth in Man,
Truth alike in a fallen woman !
Truth in the East, Truth in the West,
Truth in the worst, Truth in the best !
Truth in the Crown, Truth in the spade,
Trugh in Light, Truth in shade !
Truth in sorrow, Truth in Mirth,
Truth in Heaven, Truth in Hearth !
The Seer ! He goes !

His testament he leaves,
Beauty, that was, abides !
His Beloved he did meet
In the stormy night,
In the thunder's might,
In the spring's delight !
The temple's heaven kissing dome,
It is not his Beloved's home !
Who doth dwell in the struggling crowd,
Remote from the rich and proud !

At the stone-breaker's door,
In the untouchable poor !
Immortal Yaksha ! In thy exile
Weary hours didst thou beguile,
Sang of Aloka's Queen of Beauty
And Love's melancholy majesty !
The ban is lifted !
Anon meet thy heart's Beloved !
In the land of all fulfilment,
Quite set free from curse of banishment !

Prophet of Liberty ! Thy Mother's bondage
Stirred thy Orphean lyre through the age !
Tears of blood magic verses run,
Singing of Bharat's restoration !
If fault of ours
Delay the hours,
O Organ Voice of India !
Thou hast become Saviour of Britannia !

Knight-hood's thraldom weighed on thee,
Before a martyred Draupady !
Then thy lyre did prophesy
A race that power defy !
Upon Jalian-walla's bloody soil,
Nymph Liberty doth dwell,
Bathed in the spring,
She doth sing,
Not sole Redeemer of her own door,
But of the world's vast human shore !
High-Priest of Visva-Bharati,
That holds East and West in fee !

Transcending Time and Space,
Dost thou ever bless
Mankind with a Home of all,
In Santi's universal Hall !
Proud Europe pays homage,
Where doth stand thy hermitage !
A symbol of love for pilgrims all,
Christendom and Heathenesse alike call !
Mighty Prophet ! Seer blest !
With us thy song doth rest !
Thy immortality will Nature preach,
Clouds of Heaven thy message teach !
Thy love-laden soul
Will reach her goal,
Through the Deathless Song thou hast given,
In the golden Aloka of love divine !
In the golden Aloka of love divine !
Thy Urbashi will haunt
Meadow, grove and murmuring fount !
Sweet Malakar on his Rani's errand,
Nightly upon her sleep will sweetly stand !
Whilst the world is wrought to ecstasy,
By my Eternal Nightingale's minstrelsy !

●

VIVEKANANDA'S THOUGHTS ON INDIA

HIRANMAY BANERJEE

We occasionally come across men who are the repository of contrary virtues. Swami Vivekananda is a fine example of this. Ordinarily an ascetic would not feel interested in mundane affairs but Vivekananda was an ascetic among ascetics and an ascetic preaching Vedanta at that. The world of senses was to him an illusion, as unsubstantial as a dream. Direct contact with the Absolute Brahman through Samadhi was life's summum bonum to him. This attitude to life has been brought out very nicely in one of his songs as follows :—

> The Atman is the only bondless knower,
> It is nameless, formless and untainted ;
> Under its umbrage this wily Maya
> Is perceiving all this shadow cast by dreams.

A person used to such an attitude to life should naturally remain indifferent to his community or country. But Vivekananda proved to be an exception to this rule.

His strong attachment to the doctrine of Maya did not prevent him from bearing for his motherland the deepest love of a patriot. His patriotism bears comparison with the greatest of political leaders or poets. His patriotism again had a distinctive quality of its own. He did not love his country for any particular virtue. But he loved it just because it happened to be his motherland just as one loves one's parents regardless of their virtues or vices. He would argue like this : I was brought up in my country, I spent my youth here and hope to pass my last days here too and consequently I have developed a strong attachment for it. It is my motherland and so is dearer to me than heaven itself. Thus he teaches us to say, "Say, India is my nursery in childhood, my pleasure garden in youth and will be like the holy city of Baranasi in old age. So, say, the soil of India is my heaven." (Vartaman Bharat)

His patriotism had another distinctive quality. It often heppens that under inspiration of patriotic feelings a man takes up an unrealistic attitude and attributes to his country qualities which it does not possess. Such effusion is an agreeable emotion no doubt but does not contribute to the welfare of the country. Some patriotic poet would claim that the trees of his own land wear the greenest garb. Another poet would vie with him to say that his motherland is endowed with the choicest gifts of God and she is the queen of all lands. Such outbursts of emotion lead to no tangible result. They do not inspire men to service of the country. It is here that Vivekananda showed us a new approach. He wanted us to love our country regardless of its faults. He wanted us to acquaint ourselves with its shortcomings. He knew better than any body else that we are a poor people and we maintain a miserable existence. He had full information that very few of us could claim to be learned and

the vast majority of us are illiterate. He knew that our people are divided up into many castes from Brahmins at one extreme to Chandals at the other. Inspite of all these defects it can rightfully claim our love and service by virtue of being our motherland. The man without letters, the beggar, the low-caste man are all his country men and, therefore, closely bound to him in a bond of love as to a brother. These are the premises on basis of which he advises us as follows :

"Say with pride, I am an Indian, every Indian is my brother. Say—the illiterate Indian, the poor Indian, the Brahmin Indian, the Chandal Indian are all my brothers". (Vartaman Bharat)

This type of patriotism does not end merely in an out-burst of feeling but inspires people to activities conducive to social welfare, A desire is born to help the poor, the illiterate and neglected groups among our people and works as an incentive to activities conducive to their welfare. To a patriot wedded to such an attitude the conditions of poverty prevailing in our country are a constant source of pain. This consequently provokes thinking seriously on our problems with a view to finding a solution for them and working for them.

This is exactly what happened to Swami Vivekananda. He was a patriot with a realistic attitude. Instead of taking pride in imaginary virtues of our country, he took full note of our shocking condition and devoted a good deal of his thoughts to the problem of its solution. This was the inspiration behind his writings and speeches about India. This enabled him to leave behind for us some valuable contributions towards the solution of our problem coming as they do from an intellect of his calibre. An effort will be made in this essay to present them to the reader in a systematic form.

Vivekananda belonged to the second half of the nineteenth century. It was during this period that our country struck the lowest level of degeneration in all aspects of life. In the political field we find that the East India Company had been ousted and the Queen's Government directly has assumed charge of the administration of the country after the so-called Sepoy Mutiny had been crushed. The position was equally bad in the field of religion. The Western people by that time had made considerable progress in technology and caught the eye of the world by bringing out new inventions. Steamships were now plying across seas, railways were working on the plains of India and communication by telegraph had been introduced. This considerably enhanced the prestige of Western culture in the eyes of the people of our country. Their opinions would now carry more weight than opinions of other people. To the Western eye the Hindu form of worship by installation of a deity was rank idolatry. Macaulay passed opinion that our scriptures contained nothing but rules for expiation of imaginary sins. Consequently, the Hindu lost regard for his own religion. In the economic field his position became equally bad. The economic pattern of the country was reoriented to serve the needs of the master who had conquered it. The Indian handloom industry fell a victim to it. For the same reason Indian agriculture came to be dominated by the British farmers. Indigo plantation was taken up in large scale by them in the rural areas. They felt no scruples to introduce forced labour. Their oppressive activities were reflected in contemporary literature. We may refer to Iswar Gupta's poems on this. Dinabhandhu Mitra's drama on the

subject created a good deal of commotion and would bear comparison to Booker. T, Washington's Uncle Tom's Cabin. Indeed, Indian society had touched the lowest depth of degradation at that period of our history.

Vivekananda was fully conversant with this low condition of our life. He has painted a word picture of this in his writings. There is a saying that poverty kills all virtues. Indeed in that dark age of India our extreme poverty in all fields of life destroyed most of our noble qualities. Our people developed such an abject slave mentality that licking the master's feet like a dog became a regular habit with them, so to say. Thus he observes,

"We now lack enthusiasm in our efforts, courage in our ventures, strength in our mind, sensitivity to insult, dislike for slavery, love in our heart, light in our life ; we entertain strong envy, hatred for our own people, a keen desire to bring about the ruin of the weak by any fair or foul means and a desire to lick the feet of the strong like a dog." (Vartaman Bharat ; p. 35)

This extreme picture of gloom, however, did not prevent this great son of the country to discover a ray of hope. He fully understood that India could never go back to her old ways of life. The establishment of the British Empire in India was a historical fact which had given her history a new direction. This is because the British occupation of India was quite different from conquest of India by other powers in the period before them. The British wielded a different kind of power which stemmed from development of technological skill based on scientific knowledge. Consequently, its impact on Indian culture was bound to bring about revolutionary changes which would take us altogether to a new course. He said,

"The Flag of England is represented by the chimney, the military power, the merchant ship, the battle field and the lines of commerce across the world and the Queen represents the gold-hued goddess of wealth.

That is why I said before, that this conquest of India by England is altogether a new event. Neither the nature of the new revolution that will take place in India as a result of the impact with this great new force, nor the changes that this will lead to can be inferred from the facts of the earlier history of India." (Vartaman Bharat)

He also foresaw that the British occupation of India would not in the long run prove to be an unmitigated evil. Incidentally, it has brought for us two good things each of which has great significance. For one thing, the establishment of the British Empire in India has imposed on us a political and geographical unity which is comparable to a similar unity brought about only once before during India's long history, by the Mauryas. Secondly, the spread of British trade and commerce has brought different parts of India in close contact with a very potent culture. An altogether new set of ideas has been forcibly released in the country which is slowly spreading its influence over us. The following observations quoted from his writings will confirm this.

"In the current administrative system obtaining in India there are certain defects as well as strong points. The greatest point in its favour is that since the break up of the Empire of Pataliputra never has such a powerful and omnipotent administra-

tive system been in operation in India. The commercial enterprise which transports commodities from one end of the country to the other is also transporting forcibly ideas from foreign countries into the interior parts of India." (Vartaman Bharat)

Subjection to one uniform system of administration under the British rule opened out the possibilities of the growth of a feeling of unity. His penetrating insight anticipated that in consequence, what could not be achieved in Europe was possible here. He visualised the possibility of a super-nation taking shape based on a feeling of an overall unity demolishing the barriers of race, language, and habits of life. That is why he said that the most significant change as a result of the impact was this possibility of unification.

He also foresaw that the over-powering stupor which pervaded our life in all spheres called for a radical treatment. That treatment could conveniently come in the form of the impact of Western culture on our life. That would be one of the most significant results of our contact with the British. He observes as follows :

"But towering above all virtues and vices is visible a strong indication of future well-being, namely, that the clash of ideas between our own ancient culture and this foreign culture is slowly awakening this pro-crastinating nation from its sleep."

(Vartman Bharat, p. 42)

Vivekananda gave serious thoughts to the question of the direction in which India should develop after reawakening. He has some concrete suggestions to give, which deserve one's serious consideration. He had no love for the British Empire in India but his patriotism did not prevent him from appreciating the good points in Western culture. His impartial outlook made it possible for him to discern between the good as well as bad qualities of the men of the West. He wanted us to adopt what is good in them. But it would not be proper, he warned us to imitate them in respect of those points blindly. Our culture has some fine qualities also which we should not give up. In imibing western ideas our own distinctive qualities should not be sacrificed. They should be blended together in such manner as to provide for us the best of both cultures.

To develop the point he has made use of an analogy. He observes that many of the courses of food served by the English housewife are nutritive and palatable. We should certainly adopt them, he says, but that does not necessarily mean that we should also eat their food in their own way. The manner of taking food is immaterial and so we can retain our own custom of taking food by sitting on the floor. That should not make the dishes any the less palatable. Thus he observes,

"Therefore, we should enjoy their dishes bending our feet and sitting on the floor. Similarly, whatever Western practice we adopt, we should do it in our own way without sacrificing the characteristic pattern of our own life". (Prachya O Paschatya, p. 26)

The question arises which features of Western culture should be adopted by us. He gave serious thought to this point also. His penetrating intellect helped him to go into the fundamental issues. It was in the nineteenth century that in a resurgence of vitality the West developed technical skill based on the newly acquired

scientific knowledge to be able to capture the imagination of the entire world by its scientific inventions. He traced its very origin to the ancient Greek learning, the revival of which ushered in the age of new learning specialising in growth of scientific knowledge. The characteristic features of Greek culture were their capacity for hard work, scientific bent of mind and concern for material well being. This potent culture remained buried under the orthodoxy of the Scholastic Age for long years, marked out in history by labelling it as the dark age. When it was rediscovered its dormant forces infused new vitality to Western culture which culuminated in industrial revolution brought about by technological development. That is the reason why Vivekananda entertained profound admiration for Greek culture.

He noted that our ancient culture developed altogether in a different direction. The contrast in the qualities of these two ancient cultures has been very nicely described in the following passage from his works :

"The Indian is peace-loving, the Greek has exuberant vitality ; one is given to deep meditation and the other is endowed with matchless efficiency ; one advises renunciation and the other enjoyment..............
one aspires for emancipation, while the other aspires for freedom ; one is indifferent to prosperity in life, while the other is determined to convert the earth into heaven."
(Bhavbar Katha, p. 18)

On the whole Indian culture is dominated by spiritual qualities. It values renunciation, it is more interested in life after death. The Greek culture is wedded to the life on earth, it loves the good things of life and is determined to work for material prosperity, it is full of vitality. It wants to gain scientific knowledge of the principles that work in nature so that it can utilise them for technological development to serve the needs of life. On the other hand, the spiritual qualities in our ancient culture appear to have been undermined under the influence of our current degeneration. The dominant spirit influencing our life at present is a spirit of escapism. We fight shy of hard work, we do not feel enthused over creative activities. We have reached the lowest level of degradation. Vivekananda, therefore, thought that this situation called for very radical treatment. What was wanted, therefore, was contact with Western culture which has stemmed from the ancient Greek culture. Unless we can imbibe some of the intense vitality of the West taking delight in the joy of living, it is not possible to initiate a programme of development in our country. So he says,

"What the Greeks had, the heart-throbs of which spread over the world as a vital force emanating from the European nerve centre, is what we need. We need that same exuberance, love of freedom, self-reliance, unshakable patience, bond of unity and craving for improvement. We should stop looking backwards for sometime and look forward deep in front. Lastly, we need an infusion of vitality to pervade the body from head to foot and penetrate into every vein." (Bhavbar Katha)

IN SEARCH OF THE MISSING LINKS IN OUR THEATRICAL TRADITION

AHINDRA CHOUDHURY

It is the considered opinion of many dramatic critics in this country that we have no original dramatic culture of our own and in their opinion whatever traditions we might have in the realm of the drama is nothing but the remote remnant of a Sanskritic culture and after a lapse of many centuries is nothing but an achievement resulting from our fusion with the West, particularly with Britain and her vast dramatic literature. They, therefore, hold that Bengal's dramatic culture is more or less anglicised and dates back from the days of the East India Company and its suzerainty over the land. These opinions are not completely incorrect and are partially true. The Britishers influenced to a great extent the indigenous dramatic culture of the land and as a result of this, our traditions have undergone considerable metamorphosis in the process of time.

Our present theatrical achievement, therefore, owes its origin to the indigenous local culture influenced by western ideas and after the vicissitudes of many changes took the present form.

From time immemorial Bengal had a dramatic tradition of its own. It was just like a living organ ever developing, mixing with its own, the traditions of others in its continuous sojourn. True, there was no stage as conceived in the western sense of the term or as was contemplated by the ancient masters of the Natya Shastra. There was a place just in front of the idol of the temple a pillared circular hall called the Nata Mandir where people used to perform various sorts of performing arts with profuse songs, pantomime and dances depicting the glories of the god of the temple as was found in the Kartikeya Temple in northern Bengal at the time of Lalitaditya in the first half of the eighth century. The audience used to sit around this arena in a circular way. This was the method of our indigenous yatra which dates back from the hoary past, whose actual date of origin is not known.

The immortal version of the ancient Sanskrit epic Ramayana was translated into Bengali by various composers, most important being Kirtibasa of Fulia before the advent of Lord Gouranga. He was very popular in the lower Gangetic plains of Bengal and was known to almost everyone in the land, far and wide. Episodes from the Ramayana were frequently being dramatised and used to be presented to the local people on the occasion of any festivity or marriage, which attracted a large number of audience from far off places. These were extremely popular and were presented in the traditional Yatra style. Ram Yatra as it was popularly known, on any episode from the life history of Ramchandra was a great theme of the indigenous theatre and was presented in this manner. People used to witness the performance sitting around

the arena of acting. The play was crudely composed in the traditional rhyming verse of the land namely in Payar, Tripadi and Laghu Tripadi. This was the vehicle of the dialogue and was the only way of expression in the dramatic literature of the time as prose was little known and was used only in documents etc. and in the everyday spoken language of the people. Such a prose was considered unfit for use in literary writings, in which verses were more frequently used. It was sure that Bengali prose did not develop then in such a way that it could effectively become the medium of expression in the drama. Sri Krishna Kirtan was another very popular theme of the indigenous drama. Three to five small songs put together depicting one complete episode from the life of Lord Krishna were shaped as a dramatic piece to be followed by another one and presented as one continuous whole, before a large audience consisting of men and women, old and young alike, sitted around the acting arena in mute admiration and listening with rapt attention to the musical chantings of the performers.

At the time of the advent of Lord Chaitanya, the yatra, the only popular amusement to the people became almost a perfect and accomplished art. The Mahaprabhu, a great Sanskritic scholar, well-versed in the traditional Sanskritic drama rhetoric, injected those ideas into Bengali culture and thus embellished the crude yatra into one of perfect artistry. He renovated again and again the existing local forms in the classical manners and gave it an entirely new outlook. He introduced the ideas of the division of acts and the costumes and make-ups in the drama. It should be remembered here that theatrical dresses and costumes were not considered to be so very important before him. Sri Chaitanya himself was a good actor with great emotional power and his sweet voice enabled him to sing songs in a splendid manner when he appeared in female roles. It is mentioned in many of his poetic biographies that he used make-ups in such a skilful and perfect manner that people thought that they had never seen such a beautiful lady in their lives before. He was a great renovator of our culture in many ways ; practically he was the creator of a new Bengali nation. Chaitanya thus was a towering landmark in the long history of the dramatic culture in our land and a supreme figure in the histrionic arts of his times. As an actor, however, he could not bring any of his portrayals into a fitting close as he was frequently being overwhelmed with emotional trances and had to be taken away from the acting arena to his house by his companions. He took many hours to regain his consciousness.

After him the yatras became professional troupes and they vied with each other to introduce new ideas, new songs, even imported songs from up-countries and new musical instruments etc. The then 'Adhikaris' or proprietors were mostly known to the common villagers and earned a lot of money from them. Songs and dances were thus predominantly used in the yatra even in the time of Chaitanya Deva, save and except in few places a spoken extempore prose language was sparingly used. This Krishna Yatra held Bengal in sway for many years till the land was invaded by the Marhatas, when performing yatra parties went off to eastern Bengal by country boats and presented their skilful art there to the great amusement of the people. There was hardly any yatra party in West Bengal then until after the battle of Plassey

till the great famine of 1770, when Calcutta became the capital of the Britishers and people in West Bengal settled down in peace. They used to live here and the city soon throbbed with humming life. This evergrowing population of Calcutta wanted to have its own form of amusement and was satisfied with an improved form of yatra from 1780 onwards, when a completely new variety of entertainment was presented to the Calcutta public by the inauguration of the first Bengali theatre in the city by Heresim Lebedeff, the Russian adventurer, in 1795.

This theatre, though constructed in the western style, presented for the first time a play in Bengali language with a variety of songs in local settings arranged in European style, performed by Indian actors and actresses. A large number of its audience apart from European visitors included well-to-do Indians known to the foreigners. After this, the history of the Bengali theatre became very easy to grow. Many wealthy Indians installed in their garden houses a stage for their own private audience with the help of European experts till the foundation of the professional stage in 1872. Later history is well known to students of Bengali literature.

I think that the advancement of the theatre in Bengal today is no less due to the advancement of the indigenous amusement form of the soil, namely the Yatras. This indigenous dramatic form has contributed to a great extent towards the development of the present dramatic culture of the land. The gradual evolution of this culture may well be compared to a river which originating in a misty mountainous range, passes through many unaccountable regions, moves on the meet the thundering sea, but falls on a vast stretch of water which forms into a stagnant lake out of which the current can not emerge out. But the dormant energy of the stream (of our dramatic traditions) is trying to burst out of its captivity and to resume its eternal journey in continuation of its onward march far from its ancient origin which is marked by continuous development in later years. We discern with certainty that our present theatrical traditions are the result of a mixture of the yatras, classical Sanskritic theatre along with the British ones ; we can see the misty beginning and its mighty growth in the process of evolution but the intermediate stages of development are unknown to us. Undoubtedly there are many missing links which I can not prove adequately by citing sufficient documentary evidences, as these are not available. It would be a marvellous achievement in the realm of the Bengali drama to re-discover them. This will be the task of a future student of the drama.

●

REVIVAL OF INDIAN CLASSICAL MUSIC AND BENGAL'S ROLE

RAMESH CHANDRA BANERJEE

The cultural history of Bengal bespeaks that she has not only absorbed in herself the Classical Music that has been nurtured and enriched in Northern India for several centuries, but has represented it with a new lustre and originality. So far as Vocal Music is concerned, it became more impressive and aesthetically rich due to concordance of Music and Literature.

Just for an introduction we are to retrospect to the 16th century—the period famous for the culture and development of Music and other fine arts. Indian culture had been liberal from time immemorial and absorbed in itself whatever was best in others. The tradition of Indian Music as we still possess is mainly the contribution of Tansen, the immortal singer and composer. Tansen was moulded into a great musician by Haridas Swami. He followed his master's footsteps and his creative genius brought a fresh outlook in the art of Indian Music. Tansen followed the great tradition of Indian culture, which goes on enriching itself through exchange of ideas. In fact, Tansen's trend has been the ideal in Classical Music throughout the country excepting South India which devoted exclusively to the culture and development of its indigenous Music.

The age of Tansen may be called the golden age of Indian Music. The Mughal empire was at the zenith of its power and prosperity and under Akbar's hearty patronage Indian Music attained fuller development and flourish.

History tells us that all the creative artists uphold the doctrine that Music and other fine arts should never lag behind or keep themselves isolated from the progressive march of time.

During this period the literary horizon of Eastern India particularly that of Bengal dazzled with the brilliance of Vaishnava Mahajan Padabali. Here it must be mentioned that Bengal had developed a tradition of Music which had found a broad synthesis with the literary creations of great humanitarian poets like Chandidas and Vidyapati. Besides this, the various folk elements in rural songs, which had given rise to a noble literature known as 'Mangala-Kavya', were waiting for a new upsurge. This was the culmination of a long musical tradition of Bengal which developed into the 'Charya-Giti' of the 10th century. When Tansen proclaimed the glory not only of Dhrupad but also of his new creations in the field of melodies, the musical heart of Bengal which had been saturated with the Kirton Padabali and finest literary sentiments of Vaishanva poets, was just waiting for such a Music in which the aesthetic aspect was predominant. Before Tansen, the type of Classical Music

prevailing in India was more or less unprogressive. Tansen's cosmopolitan views opened a new vista, which laid more and more emphasis on the Art form and less on Science or Grammar in Music and this paved the way for future evolution of Khyal, Tappa and Thumri.

But the progressive march of Music got a rude set-back when Mughal dynasty came to the verge of its decay and there was a long period of political unrest and instability in Delhi and votaries of art ran helter-skelter to find out new patrons in far off provinces. Bengal, that takes pride in her wonderful adaptability and absorbing in herself, whatever is best in the field of culture and education, got a new source of inspiration from Tansen's Music at that time. In this connection it may be mentioned that Vishnupur, an ancient Kingdom in West Bengal, and Calcutta, the new city under the East India Company became famous seats of Classical Music, approximately from the middle of the eighteenth century. Bahadur Sen—a direct descendant of Tansen and a scion of that family settled at Vishnupur as the court musician of Raja Raghunath Singh II. Calcutta was also fortunate enough in welcoming and patronising many famous musicians from Delhi and different centres of India, whose contributions in form of training up the musical talents of Bengal are noteworthy.

So, we find that even though the Mughal empire crumbled, the art of music did survive and began to flow through various undercurrents like the river 'Falgu' in different states of India and in famous 'Gharanas' or schools. Here due compliments should be given to the then feudatory chiefs and representatives of 'Gharanas' who did not allow music to die.

Indian Music, however, faced another critical phase due to political and social changes with the advent of the British in India. During the last part of 18th and the earlier part of 19th century the educated and the aristocrats developed a mentality not of national pride and honour but a mentality subservient to the western ideas for which Indian culture got a set-back. One of the main reasons for this was that common people had no easy access to music and other arts which were solely restricted within the four walls of the Court and 'Gharanas'. Excepting a few stalwarts, the representatives of Gharanas tried to reserve the art in their own family and to the Emperors, kings and the rich it was mostly a luxury.

Another reason for the set-back was that very few thought of the educative value of Music and other arts and considered them as best accomplishments. Music as the best means of cultivation of good taste acquiring a sense of decency and helping towards development of character, has been realised very little by the then intelligentsia of our country. At this moment Raja Ram Mohon Roy, the embodiment of the soul of India, gave a clarion call to the nation and turned the tide so as to give a sense of dignity and honour to our national art without undermining the value of what was best in Western education and culture. The Raja amidst his multifarious reforms tried his utmost to re-instate Indian Classical Music to its pristine glory and at the same time adjusting it to the demand of the age. Time changes and with it everything changes and Raja Ram Mohon Roy's reforms upheld before his countrymen the sublime forms of Indian art and culture. In his composition of 'Brahma-Sangeet',

the pure melody and rhythm of Classical Music was introduced and this helped to a great extent towards the revival and popularity of Indian music. In fact these compositions wedded to the classical melody stirred the music mind not only of Bengal but of the whole of India. Without disowning the past tradition, Bengal's creative genius revitalised Indian music and thus we see from Ram Mohon the great poets and composers of 19th and 20th centuries contributing substantially towards gradual evolution of music. Bengal may proudly call herself a worthy successor of the glorious tradition of Tansen's Music, having nurtured it for more than two centuries and preserving most of them through notation. India is also indebted to Kshetromohon Goswmi of hallowed memory, who for the first time invented and introduced the notation system —thus preserving the golden treasures of our music—a major portion of which had been lost in oblivion for want of scientific system of notation.

Posterity would ever remember Jadu Bhatta, the enchanting warbler ofBengal, who was unanimously acclaimed by the whole music circle of India as the greatest composer and artist of the 19th century and whom Rabindranath paid compliment as "an artist of God's own creation". He was a music teacher of Rabindranath, and his songs inspired the Poet's early compositions.

Bengal also anticipated that no art can flourish without people's support and without forming a part of general education. The great music composers and poets of Bengal tried to bring a synthesis between Melody and Poetry *i.e.* the melody which would be vibrating the sense of the words and thus to make the songs more expressive. The sweetest classical melodies were adopted by our poets and composers who flourished during the 18th, 19th and 20th centuries.

Tagore's songs which give ease and grace to our everyday existence and bring us in close kinship with nature are the best lyrics, set to both traditional tunes and tunes of his own creation and his songs have added a glorious chapter to our music. The great traditions of Indian classical music, folk, regional, provincial and even western tunes have found a finer and newer interpretation in Gurudeva Rabindranath's Music which has enhanced the prestige of Indian culture in international sphere.

In a democratic age the arts also need democratisation and this can be achieved, if a thorough all round training in different subjects of music which are closely linked with one another is imparted, of course keeping in view, sufficient scope for specialisation.

Art is the emblem of peace and amity. The world may be devastated by war, greed and evil, but Art is imperishable and the eternal torch-bearer of a Nation's culture and spirit.

TAGORE'S CHITRA

ANIL KUMAR ROY CHOUDHURY

If we read between the lines, sometimes a single poem by Gurudeva Rabindranath Tagore may throw a good deal of light on a particular aspect of his entire philosophy of life. It is well-known that one of the principal features of Tagore philosophy centres round the poet's attitude to God who has been variously termed as Jivandevata (the Lord of one's life), Nataraja (the Eternal Dancer) and so on. Inspite of some differences between them, these various conceptions do not necessarily run counter to each other. They are rather like two strings to the same bow. Gurudeva's poem 'Chitra' (the chequered one) enlightens much of our darkness in this respect and gives us a clear insight into his faith and philosophy. In this poem there is more than what meets the eye. It contains much promise regarding the channel along which the poet's philosophy would flow in the future. It marks a turning point in the poet's career. Hence, more than ordinary importance has to be attached to it.

The poet has just completed the Prabhat Sangit (Songs of the Dawn) chapter of his life. He has found the clue to a new path. He is going to change his tune. The philosopher's stone is soon to be in his possession. Here begins a new stage of communion with Nature. The first clear indication of Tagore as the poet-priest of Nature is the chief characteristic of this chapter in the poet's life.

The poet has realised the presence of a hidden power. Who or what is this power ? The answer to this question is not far to seek. In the poem Alokdhenu (the rays of light are like cattle) the poet calls this power the cowboy—the prince of cowboys. In the present poem (Chitra) we find — this power pervades the entire universe as well as the poet's mind. Variegated is the manifestation of this power. It is perhaps to hint at this clue that the poet has named the present poem Chitra (the chequered or variegated one).

The poem has two parts —the first part relates to the outward manifestation of the Universal power which may be seen in broad day light, and the second part refers to the presence of the same power within the mind or heart of the poet which holds him spell-bound and which he alone can see with his mind's eye. The external manifestation of the Universal power is to be found in the sky above and on the earth below. With one foot in the sky he touches the earth with the other. The power which resides in Nature is no other than Nataraja (the prince of dancers)—the burden of his music is twofold : May and December : Life and Death. He is the destroyer of all, and it is again He who brings life back into the universe. His place is in Nature's varied gallery. Like the rainbow with all its colours he is many-hued. He is ever restless. He really is the Sarveshwara (the Universal Lord or the Lord of all) of the Upanishads.

But within the heart of the poet the Sarveshwara (the Universal Lord) becomes the Jivandevata (the Lord of the poet's own life). He is, as it were, the playwright, with the poet as his actor. He is the beloved God of the devotee, the dearest one of the Bauls, the one perennial source of joy. In the heart of the poet there is the sphere of 'having', and not the one of 'knowing'. Keeping all dialectics at arm's length, the poet here possesses his soul in patience and has direct communion with his personal God. Pinning his faith on the dearest one, his heart, in dim religious light, goes deep into the meeting with the Lord of his 'here and hereafter'. This faith — this love — keeps the poet green even in his old age.

The one who externally is many and the other who, in the heart of the poet, is alone, the one who outwardly is the restless Nataraja engaged in ceaseless dancing and the other who internally is the Jivandevata at rest and in hiding — the poet has brought these two apparently contradictory forces into perfect agreement. Herein lies the extraordinary quality of this poem.

The one who has been called Vichitrarupini (the variegated one) in this poem is none but the all-pervading God. He manifests Himself in all Nature. That Nature with its changing colours is the playhouse of this force. He is many in one. He is never at rest. He is the dancing Nataraja. The expression of this force is noticed in the sense-perceptible world of ours. The numerous tales of this power are told in countless songs and in countless measures.

Coming into the heart of the poet this force is no longer plural — it becomes singular. He becomes the Lord of the poet's life, the God of his heart and soul. The poet has the perfect realization of His oneness. The power which in the external features of the universe is impersonal and superhuman expresses itself in the shape of a person in the heart of the poet. Here He is the beloved God, the one after the poet's heart. So the poet says —"there reigns eternal peace, the expanse of rest is vast — just one devotee is constantly worshipping you". It is about this tranquil, unwavering, resident of the poet's heart, the Jivandevata that the poet has sung —"In my heart of hearts you are alone — alone do you abide with me."

NOTE

This article is mainly based on a lecture by Shri Hiranmoy Banerji, Vice-Chancellor, Rabindra Bharati University.

OUR ALUMNI

We are happy to announce that in this new section of our journal we propose to publish the names of those ex-students of the Rabindra Bharati University and of the Academy of Dance, Drama and Music (since merged in the University), who have won distinction in their own fields. Interested ex-students are requested to contact their respective Departmental Heads in this University.

In the present issue we are publishing the names of some of our ex-students about whom we have received the necessary particulars.

Music Demaptment

1. Shri Nemai Chand Boral —Lecturer, Sangeet-Bhavana, Visva-Bharati University, Santiniketan.

Shri Boral stood first in DHRUPAD in the All India Competition under the auspices of the Ministry of Scientific Research and Cultural Affairs and was awarded the Govt. of India Scholarship of Rs. 250/- per month from 1956 to 1958. He is a regular artist of the All India Radio, Calcutta. He was sometime a Music Trainer in David Hare Training College, Calcutta.

2. Shri Amaresh Chaudhury — Head of the Department, Music Academy, Ramkrishna Mission Institution, Narendrapur, 24-Parganas.

Shri Choudhury is a regular Artist of the All India Radio, Calcutta.

3. Shri Monilal Nag — Shri Nag is a first grade Artist of the All India Radio. He broadcast in the National Programme, Delhi, and from other centres of the All India Radio. He was invited by the Saurastra Sangeet Natak Academy for giving Sitar recital which was highly appreciated.

4. Shri Barun Sen Gupta — Shri Sen Gupta was appointed trainer of Tagore song and dance-drama by the Andhra Pradesh Sangeet Natak Academy on the occasion of the opening of the Rabindra Bharati National Theatre and inauguration of the Tagore Centenary celebration at Hyderabad. He was there from November, 1961 to May, 1962 and his performances were highly appreciated.

5. Shri Mohan Lal Khanna — Shri Khanna stood first in the All India Competition in DHRUPAD under the auspices of the Ministry of Scientific Research and Cultural Affairs, New Delhi, in 1958 and was awarded the Govt. of India Scholarship of Rs. 250/- per month for two years.

6. Shri Birendra K. Rangong — Shri Rangong was the recipient of the Govt. of India Scholarship for blind boys for training in Instrumental music from 1958 to 1960.

7. Sm. Mani Manjusha Bose — Sm. Bose stood first in DHRUPAD & DHAMAR in 1960, first in THUMRI in 1961 and first in KHEYAL in 1962. She is a regular artist of the All India Radio, Calcutta.

8. Sm. Roma Ghosh (Purakayastha) — Sm. Ghosh was awarded the India Govt. scholarship in Rabindra Sangeet in 1962. She has since been enjoying the scholarship.

9. Shri Tarun Ganguly
10. Shri Sushangshu Ranjan Majumdar } —Shri Ganguly and Shri Majumdar were selected by Shri Uday shankar to accompany him in his recent European Tour andt heir demonstrations in Percussion Instruments and String instruments were highly appreciated.

Dance Department

1. Shri Suresh Dutta — Shri Dutta secured the highest position in the All India Competition under the auspices of the Ministry of Scientific Research and Cultural Affairs. He was awarded the USSR Scholarship for training in Puppet Dance in 1961. He had his training in Moscow and after the successful completion of his course he has come back and has joined the C.L.T. as Director of the Puppet Dance section.

2. Sm. Snigdha Paul — Appointed trainer of Tagore's Dance and Dance -Drama by the Andhra Pradesh Sangeet Natak Academy on the occasion of the opening of the Rabindra Bharati National Theatre and inauguration of the Tagore Centenary celebration at Hyderabad. She was there from November, 1961 to May, 1962 and her performances had wide appreciation.

3. Shri Asit Chatterjee
4. Shri Amarendra Bose } Shri Chatterjee and Shri Bose were selected by Shri Uday Shankar to accompany him in his recent European tour and their Dance Performances were highly appreciated.

Drama Department

Two of the former students of our Drama Department — Shrimati Nibedita Das and Shri Bireswar Mukherjee—have organised a Drama Group under the banner of "Shouvanik". They are some of the pioneers in the open-air theatre movement in our country. They have started one such theatre called 'Mukta-Angan' in South Calcutta. They have been successfully staging there a number of plays including Tagore's "Gora", "Taser-Desh", "Bansari" etc. and have earned wide reputation as producers. They have been writing plays and staging these under their own direction.

Particulars about the Rabindra Bharati Patrika

1. Title of the newspaper	RABINDRA BHARATI PATRIKA
2. Date of establishment and the date from which the newspaper is being regularly published.	11. 1. 63 First issue published on 20. 2. 63.
3. The latest declaration under which the newspaper is published.	Declaration no. 13/63 dated 11.1.63, before the Chief Presidency Magistrate, Calcutta. (It is a new publication).
4. Language (s) in which the newspaper is published.	Bengali and English
5. Periodicity of its publication :	
(a) Whether daily, tri-weekly, bi-weekly weekly, fortnightly.	(a) Quarterly.
(b) In case of a daily publication, indicate whether it is a morning or evening newspaper, and	(b) Does not arise.
(c) In case of publication other than a daily, indicate the day (s) /date (s) on which it is published.	(c) 30th January, 30th April, 30th July, 30th October.
6. Retail selling price per copy	Re. 1/-
7. Publisher's Name Nationality Address	BHABA RANJAN DE INDIAN 6/4, Dwarkanath Tagore Lane Calcutta-7
8. Place of publication	Rabindra Bharati 6/4, Dwarkanath Tagore Lane. Calcutta-7
9. Printer's Name Nationality Address	BHABA RANJAN DE INDIAN 6/4, Dwarkanath Tagore Lane, Calcutta-7
10. Name (s) of the printing press (es) where printing is conducted and the true and precise account of the premises.	M/s. Sadhana Press (Private) Ltd. 76, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-12.

11.	Editor's Name Nationality Address	DHIRENDRA DEBNATH INDIAN 6/4, Dwarkanath Tagore Lane, Calcutta-7
12.	Owner's Name (s)	RABINDRA BHARATI
	(a) Particulars need be given of individual(s) or of the firm, joint stock company, trust, co-operative society etc. which owns the newspaper.	[a University established under the Rabindra Bharati Act, 1961 (West Bengal Act XXIX of 1961)]
	(b) Indicate whether the owner owns any other newspaper (s) and, if so, its name, periodicity, language and place of publication.	Nil

I, *BHABA RANJAN DE*, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Date :———————————.

Signature of the publisher

Sd/- B. R. De
21.2.63

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা

প্রথম বর্ষ ★ তৃতীয় সংখ্যা

শ্রাবণ-আশ্বিন ★ তের শ' সত্তর

জুলাই-সেপ্টেম্বর ★ উনিশ শ' তেষট্টি

সম্পাদক : ধীরেন্দ্র দেবনাথ

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নব জাগরণের ইতিহাসকে বিষয় করে একটি প্রদর্শভবন স্থাপন করা। তাতে তিনটি বিভাগ থাকবে: ১। রবীন্দ্রনাথ, ২। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার এবং ৩। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মনীষিগণের কীর্তি। রবীন্দ্র ভারতীর কর্তৃপক্ষ এঁদের সম্পর্কিত প্রদর্শনের উপযুক্ত দ্রব্যসংগ্রহে আগ্রহশীল। এই মহৎকার্যে সাফল্যের জন্য সকলের সহযোগিতা এবং সক্রিয় সাহায্য কামনীয়। যিনি এই আবেদনে সাড়া দিতে ইচ্ছা করেন, তিনি অনুগ্রহ করে রবীন্দ্র ভারতী প্রদর্শভবনের অধ্যক্ষ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সহিত যেন সংযোগ স্থাপন করেন।

সূচীপত্র

ENGLISH SECTION

- রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রৈমাসিক দ্বি-ভাষিক মুখপত্ররূপে রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা প্রতি জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসের ৩০শে প্রকাশিত হবে।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা তিন টাকা। ডাকব্যয় অতিরিক্ত এক টাকা।
- শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হবে। এতৎসংক্রান্ত যাবতীয় খবর সম্পাদকের কাছে পাওয়া যাবে।

'রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা' কার্যালয়

৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন

কলিকাতা-৭

ফোন ঃ ৩৪-২৭৪৯

৩৪-৫৩১৬

সম্পাদকীয়

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হোল নানা জায়গায়। বন্ধুরা প্রীতি জানালেন, ভক্তেরা নিবেদন করলেন শ্রদ্ধাঞ্জলি। নিবিড় বেদনায় হয়ত কখনও ভেবেছি, এই প্রীতি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি তাঁর কাছে পৌঁছেছে কি? পরক্ষণেই মনে হয়েছে—আমাদের একান্ত চাওয়ার যদি কিছুমাত্র মূল্য থাকে, তবে এ অঞ্জলি নিবেদন ব্যর্থ হবে না।

নজরুল ইসলাম এককালে বাংলাদেশের উত্তেজনাকে আহার্য যুগিয়েছেন তাঁর 'বিদ্রোহী' প্রমুখ কবিতায়। অতীতের প্রতি নির্মোহ দৃষ্টিপাতে, বর্তমানের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুগভীর আশা-পোষণে সেদিনের যৌবন পথ খুঁজে নেবার চেষ্টা করেছে তাঁর মধ্যে। একথা মনে রাখবার প্রয়োজন আছে যে নজরুল শুধুমাত্র রাজনৈতিক পরাধীনতার বিরুদ্ধেই তাঁর লেখনী উদ্যত করেন নি। অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্য, ধর্মভিত্তিক বিভেদ, সামাজিক অসাম্য ও চিরাগত কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও তিনি জেহাদ ঘোষণা করেছেন। নজরুল 'বিদ্রোহী কবি'—এই অভিধায় বন্দিত। 'বিদ্রোহ' শব্দটিকে যদি সংকীর্ণ অর্থে কেবলমাত্র রাজনীতির সাথে যুক্ত করে দেখা হয়, তা'হলে এ অভিধা নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ। কারণ নজরুল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে, তাঁর সাহিত্যকৃতির মধ্য দিয়ে সামগ্রিক বিপ্লবকেই স্বাগত জানিয়েছেন। কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা-অর্জনেই যে সকল সমস্যার সমাধান ঘটে না, এ সত্যে তিনি বিশ্বাস করেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর মিল বিশেষ লক্ষণীয়।

সর্ববিধ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অসাম্য দূরীকরণে তিনি অন্তরাত্মার উদ্‌বোধনের প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করেছেন সর্বাগ্রে। লাঞ্ছিত মানবাত্মার মুক্তিঘোষণায় তিনি চঞ্চল হয়ে ফিরেছেন। মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় সে মানুষ—এ কথাটাই তিনি নানাভাবে বলতে চেয়েছেন।

হিন্দু না মুসলিম্, ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী, বল ডুবিছে মানুষ—

এই মানুষের কথাই তিনি তাঁর কবিতা, প্রবন্ধ, গান ও পত্রাদির মধ্য দিয়ে সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন। প্রত্যেকেই অমৃতের পুত্র—অযুত সম্ভাবনার অধিকারী। মানুষের

মধ্যে সেই পরম সত্তার অস্তিত্বকে তিনি জেনেছেন কোনো শাস্ত্রের অনুশাসন বা ধর্মের বিধান থেকে নয়। আপন অনুভূতির তীব্রতায়, প্রেমের আকুলতায় সত্যকে তিনি অনায়াসে স্পর্শ করেছেন।

নজরুল বিপ্লবী, নজরুল রোমান্টিক! বিপ্লবী বলেই গণজীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছেন, রোমান্টিক বলেই বিপ্লবোত্তর আদর্শ পৃথিবীসৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর সেই আদর্শ পৃথিবীতে দেশপ্রেম, মানবপ্রেম ও নারীপ্রেমের ত্রিবেণী-সংগম রচিত হবে। প্রচণ্ড জীবনীশক্তি, প্রবল আবেগ ও তীব্র অনুভূতি নজরুলকে কেবলই অস্থির করে তুলেছে। কোনোরূপ অন্যায়ের সাথে আপোষ-রফা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই শুধু কবি হিসাবে নয়, শুধু সংগীতকার বা সুরকার হিসাবেও নয়, একটি প্রচণ্ড মানুষ হিসাবেই তিনি তাঁর যুগকে নাড়া দিয়েছেন বেশি করে। প্রাণের আবেগকে, অনুভূতিলব্ধ সত্যকে তিনি সহজভাবে প্রকাশ করেছেন; মানুষের মর্মে তাই তাঁর বাণী এমন করে ঝংকার তুলেছে।

সেদিনের অস্থির জীবনযন্ত্রণা আর সুগভীর জীবনাবেগের প্রতিমূর্তি নজরুল ইসলাম। তারুণ্যের প্রতীক নজরুল জনমানসে আসন নিলেন আর সেই যৌবনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলেন চার পাশে। তার উত্তাপ ক্ষণে ক্ষণে যেন আজো অনুভব করা যায়।

নীলকণ্ঠের মতো এ-যুগের হলাহলকে ধারণ করে তিনি সমাহিতচিত্ত। সেই উদাত্ত কণ্ঠ আজ নীরব। কিন্তু স্বপ্ন দেখ্‌ছি নতুনের আবির্ভাবের। শুনতে পাচ্ছি নবীন কণ্ঠে তাঁরই সুর, তাঁরই বাণী। আমাদের অঞ্জলি নিবেদন তা'হলে ব্যর্থ হয় নি, ব্যর্থ হবে না!

●

সুরপ্রেমিক তানসেন পাণ্ডে

আরতি মৈত্র

"ধ্রুপদ অওর খেয়ালকি মধ্যে কী ডিফ্‌রেন্স আছে বলতে পারে ?"

"না।"

"আচ্ছা, তো—ধ্রুপদ কী আছে ?"

"জানি না।"

"খেয়াল— ?"

"না।"

"আগার আমি Interview-মে থাকতে তো তুমি পাশ হোতে না। Interview-মে আমি ছিলে না, তো তুমি পাশ হোয়ে গ্যেছে।"—পাণ্ডেজীর সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। তারিখটা ১৯৬০ সনের ২৭শে নভেম্বর। পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত নাটক আকাদমীতে (বর্ত্তমান রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়) ছাত্রী হিসাবে পাণ্ডেজীর কাছে প্রথম অভ্যর্থনা মেলে এইভাবে। প্রথম পরিচয়ের এই অভ্যর্থনাতেই চমক লেগেছিল। মুহূর্তের পরিচয়েই মনে হোল মানুষটি সাধারণের পরিমাপে তৈরী নয়। তাই তথাকথিত ভদ্রতা রক্ষার জন্য কপটতার দায় তাঁর নেই। সেই ক্ষণেই আমার অন্তরে ভালবাসার আসনটি দখল করে নিলেন এই অজানা মানুষটি।

মুগ্ধ হয়েছিলাম প্রথম দর্শনেই। অপূর্ব দিব্যকান্তি সৌম্যদর্শন পুরুষ। কাঁচা-পাকা চুল ঘাড় ছাড়িয়ে নীচে নেমেছে। উজ্জ্বল রঙ্। বসে আছেন মেরুদণ্ড সোজা করে,—দুটি হাত দুটি জানুতে। প্রাচীন ভারতের আশ্রম-গুরুর উপমা মনে এলো।

শ্রদ্ধেয় শম্ভু মিত্র রবীন্দ্র-নাটকের বিশেষ বিশেষ চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এমন একটি আদর্শ চরিত্র প্রায়ই চোখের সামনে আঁকেন "যে চরিত্রের কোন inhibition নেই।" পাণ্ডেজীর মধ্যে সেই চরিত্রটি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। পাণ্ডেজীকে দেখার পূর্বে এই চরিত্রটির একটি স্কেচ অস্পষ্ট রূপ নিয়ে আমার মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল, কিন্তু পাণ্ডেজীকে দেখার পর থেকে চরিত্রটি পাণ্ডেজীর মূর্তি ধরে আমার কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে।

আজ 'পাণ্ডেজীর ঘরে' যেখানটিতে বসে তিনি গান শেখাতেন, হাসাতেন, কাঁদাতেন, নিজে কাঁদতেন, সেই জায়গাটির অতি কাছে বসে তাঁকে মনের মধ্যে

স্পষ্ট দেখতে পাই—অনুভব করি। মনে পড়ে কত কথা, কত গান, কত সুর—অজস্র সুর, সুরের সমুদ্র ! অনুভব করি—হাসি, সুর আর চোখের জলে গাঁথা আমাদের গুরুশিষ্যের ভালবাসার গানখানি ! ঝল্‌মল্ করতেন সব সময় সুরের ব্যঞ্জনায়। হৃদয়ের মধ্যে সুরকে তিনি বসিয়েছিলেন রাজাসনে। প্রেমের অঞ্জলিতে তাঁকে সেই সুরের পূজা করতে দেখেছি দিনের পর দিন। তাই যখন গান গাইতেন তখন তাঁকে মনে হোত দীন পূজারীর মত, প্রেমিকের মত। সেই মুহূর্তে জগৎ সংসার কিচ্ছু নেই, তখন কেবল তিনি আর তাঁর সুর—তাঁর দয়িত। এই কারণেই বোধ করি গান গাইবার জন্য তাঁর মেজাজ ('মুড') আসবার প্রয়োজন হোত—অর্থাৎ, গান গাইবার পূর্বে, কণ্ঠে সুরকে আবাহন করবার পূর্বে তো তাঁকে মনের মধ্যে একলা হ'তে হবে, পবিত্র হ'তে হবে। এমনি করে সুরের সঙ্গে ভালবাসার গ্রন্থিবন্ধন হলে তবেই বুঝি তিলেক অনুভব করা যায় সঙ্গীতকে।

লক্ষবার বলতে শুনেছি একটি কথা—"ধ্রুপদমে প্রেম থাকবে।" আলাপ করতে গিয়ে প্রেম প্রকাশ হচ্ছে না বলে প্রচণ্ড বকুনি খেয়েছি, আবার যখনই কেউ সুরের মধ্যে এতটুকু ভালবাসা দিতে পেরেছে তখনই সে পাণ্ডেজীর নিজস্ব মধুর ভঙ্গীতে প্রায় আহ্লাদিত বালকের কণ্ঠে শুনেছে—"সাব্বাস্ বাবা ! ·· সাওধান্‌সে ! ইয়ে বাত্ !"

শিক্ষা-পদ্ধতি ছিল আশ্চর্য দক্ষতাপূর্ণ। গল্প বলে, নানা উদাহরণ দিয়ে রাগ বোঝাতে চেষ্টা করতেন। বোঝাতে বোঝাতে বার বার বলেছেন—

"আমার কথা বুঝ্‌তে পারে ? রাগমে পুরা ধেয়ান থাকবে। আমি টোড়িকি কোমল রেখাব দিচ্ছি, খেয়াল রাখ্‌না। টোড়িকি রেখাব কড়া আছে, 'তানেকসা' গোলমাল হোলে রাগ নষ্ট্ হোবে।" অনেক সময় রাগের দুরূহ রূপ আমাদের বোধের মধ্যে আসে নি। বুঝেছেন। বলেছেন—"আলাপ শিখাতে সময় আমি তেলবুদ্ধি চাই।" তেলবুদ্ধিটা কী ? না, বুদ্ধি তিন রকম—চাম্‌ড়াবুদ্ধি, নামদাবুদ্ধি আর তেলবুদ্ধি। চামড়া বা রবারে একটা পেরেক ঢুকোলে পেরেকের কোন চিহ্ন প্রায় বোঝাই যায় না। নামদা এক রকমের কাপড়। এই কাপড়ে যদি পেরেক দিয়ে একটা বড় ফুটো করে দেওয়া যায় তবে যতটুকু ফুটো করা হয় ততটুকুই থাকে—আপন ক্ষমতায় বাড়েও না, কমেও না। আর এক বালতি জলে আঙুলের ডগা দিয়ে "তানেকসা" তেল ছোঁয়ালেই সমস্ত জলটা 'তেল হি তেল' হয়ে যায়। তা' ধ্রুপদের আলাপ শেখার জন্য এই তেলবুদ্ধিটি চাই।

নতুন কিছু শেখাবার সময় অসংখ্যবার দেখাতেন, ক্লান্তি বা বিরক্তির লেশ দেখিনি। কিন্তু শেখা হয়ে যাবার পর সামান্যতম ত্রুটি সহ্য করতে

তানসেন পাণ্ডে

[শ্রীমতী কেতকী দাসের সৌজন্যে]

পারতেন না। ভাবটি এই রকম যে আমরা তো বুদ্ধিমতী, তবে কেন জানা সুর আমরা ভুল করবো। আমাদের কাছ থেকে তিনি তা আশা করেন না। তবু আমাদের প্রচুর ভুল হয়েছে আর তখন মারমুখী হয়ে বকাবকি করেছেন। এই সময় প্রায়ই বলতেন—"এমন বক্‌নী দিবো কি পাখী হয়ে পাঙ্খার ব্লেডের উপর বোসে যাবে।"

অনেক সময় class নিতে চাইতেন না। "আমার মুড নেই, class লেতে পারবে না।" কখনও কখনও ভাববার চেষ্টা করেছি class নিতে এই মুডের অভাবের কারণটা কী হোতে পারে। ভেবে মনে হয়েছে, ভারতবিখ্যাত ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ যাঁর কাছে আলাপ শুনেছেন দিনের পর দিন নিজ পুঁজি বাড়াবার জন্য, এবং পুত্র মুনব্বর খাঁকে যাঁর কাছে "নাড়া" বাঁধিয়েছেন সঙ্গীতশিক্ষার জন্য, সেই শিল্পীর পক্ষে আমাদের মত নব্য শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার কাজটা বিড়ম্বনা বই আর কিছুই নয়। তাই হয়তো তাঁর মনটা এই বিড়ম্বনা থেকে মাঝে মাঝে পালিয়ে যেতে চাইতো।

মুড না থাকলে তো class হবেই না, তার উপর যদি ক্রিকেটের সিজন এলো তো কথাই নেই। কলেজেই আর পাণ্ডেজীর দেখা মিলবে না। আলোয়ারের Royal team-এর দক্ষ পোলো খেলোয়াড় হুসেনউদ্দীন high blood pressure-এর জন্য ইদানীং আর ঘোড়ার সওয়ার হোতে পারতেন না, কিন্তু ক্রিকেটও তো আছে। সে-ও তো রাজারই খেলা!

স্বরসাধনার class যদি হোত, প্রায়ই একটা খেলার মধ্য দিয়ে হোত। পকেট থেকে বেরোল একটি দশ নয়া পয়সা আর একটি দেশলাই। দশ নয়া পয়সাটি খুব গম্ভীর মুখে সামনে রাখা হোল। এখন তিনি একটি করে দেশলাই কাঠি জ্বালবেন, আর সেই ঘর্ষণে কোন্ স্বর বাজছে বলতে হবে। যে ঠিক ঠিক বলতে পারবে সে ওই পয়সাটি লাভ করবে। উদারা-মুদারা-তারার স্বরগুলি কি নিখুঁতভাবে বেজে চলতো দেশলাইয়ের কাঠিতে। আমরা কখনও সঠিক স্বর নির্ধারণ করতে পেরেছি; কখনও পারিনি। পাণ্ডেজীর বিচারে কিন্তু কোনদিন কারুর স্বরনির্ধারণ ঠিক হয়নি। সম্মিলিত কণ্ঠের প্রতিবাদের মধ্যে মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্যের মুখোস পরে মুদ্রাটি পকেটস্থ করে সটান হনহনিয়ে class থেকে প্রস্থান করতেন। পরে দেখা হলেই আমরা গম্ভীর, আর ওঁর মুখে নীরব অট্টহাসি।

আমাদের হয়তো কোনদিন class করতে ইচ্ছে করছে না। অনিচ্ছায় গান গাইলে যা হয় তাই হতে লাগল। সুর ঠিক লাগছে না, বন্দেজ ভুল হচ্ছে। আশঙ্কিত মনে যখন সকলেই ভাবতে আরম্ভ করেছি যে এই বুঝি শোনা গেল হুঙ্কার—"কী হোচ্ছে?" তখন অবাক হয়ে দেখি—একি, এ যে একেবারে anti-climax হয়ে গেল!

দেখি সকলের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন। ব্যাপার না বুঝতে পেরে আমরা থেমে গেলাম। "হুম্, গান করনেকা ইচ্ছা নেই। বদমাসী!" ধরা পড়ে আমরা হাসতে আরম্ভ করলাম। আর তখনই দু'পকেটে দু'টো হাত ঢুকে গেল আর বেরিয়ে আসতে লাগল মুঠোভরা জয়পুরের কিস্‌মিস্। জয়পুর থেকে কিস্‌মিস্ এসেছে, তারই খানিকটা এসেছে তাঁর আদরের ছেলেমেয়েদের জন্যে। "লও, খাও, খাকে ঠিকসে গান করো।" কিস্‌মিস্ খাবার পর ঠিকসে গান হোত, আবার আবদার করলে গল্পও হোত। গল্পের ঝুলি থেকে বেরিয়ে আসত নানা রঙের, নানা রসের পিলেফাটানো হাসির গল্প। এই গল্পের আসরেই তার য়ুরোপ ভ্রমণের গল্প শুনে আমরা ঘণ্টাখানেক বেদম হেসেছিলাম।

আলোয়ারের মহারাজা জয়সিংহ রাজঋষি দেওয়ের দরবারের প্রধান গায়ক পাণ্ডেজী মহারাজের সঙ্গে তিনবার য়ুরোপ ভ্রমণে যান। য়ুরোপবাসী সম্ভবতঃ সেই প্রথম ধ্রুপদের রসাস্বাদন করবার সুযোগ লাভ করেন। এই সময়কার কথা বলতে গিয়ে প্রচণ্ড হাসতেন। তিনি তখন মাত্র তিনটি ইংরেজী শব্দ জানতেন—yes, no এবং very good। এর বেশী জানতেন না আর ইংরেজী বুঝতেনও না। একদিন হয়েছে কি— "কোই আদমী মহারাজার কাছে এসেচে, মহারাজার সঙ্গে উনকো দেখা হুয়া নেই"। আমাকে জিজ্ঞাসা কিয়াছে 'আপলোক কোতদিন আর থাকবেন'। আমি বোলে দিয়াছে— 'very good'।

কোন্ ছাত্র কি রকম করে হাঁটে, কোন্ ছাত্রী পরীক্ষায় ফেল করে কি রকম করে কেঁদেছিল, কার গলা কি রকম বেসুরো হয়ে গিয়েছিল, কোন্ ছাত্রী interview দিতে এসে কিরকম করে হাঁটুতে চাপড় মেরে গান গেয়েছিল, visitor মেমসাহেব high heel জুতো পরে vanity bag হাতে নিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে কি রকম করে ধ্রুপদ শুনেছিল— সমস্ত হুবহু নকল হয়ে যেত পাণ্ডেজীর দেহে ও কণ্ঠে—আর ঘরবারান্দা ভরে শোনা যেত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সম্মিলিত কণ্ঠের উচ্ছ্বসিত হাসি। কোন মেয়ে ব্যাগ বা কিছু হারিয়ে ফেলেছে। তিনি সেটা পেয়েছেন। জিনিষটি তৎক্ষণাৎ তাঁর পকেটে আত্মগোপন করলো। মেয়েটি যখন জিনিষটি খুঁজছে, তিনিও তখন অত্যন্ত গম্ভীরমুখে খুঁজছেন—ঘরের কোণায়, চেয়ারের নীচে। তাইতো—কোথায় গেল! অবশেষে কাঁদ-কাঁদ মুখ দেখে হো হো হাসি আর পকেট থেকে ব্যাগ-এর আত্মপ্রকাশ! কোন ছাত্রী জিজ্ঞাসা করেছিল—"আপনি ছোটবেলায়ও এমনি দুষ্টু ছিলেন?" বাঁ হাতটি অভ্যাসমত একটু দুলিয়ে মাথার চুল ঝাঁকিয়ে কৌতুকদীপ্ত কণ্ঠে উত্তর করলেন—"আরে ব্বাবা! আমি তোমাকো পেটমে দুষ্টুমী শুরু কিয়াছে। আটমাসকা বেশী পেটমে

থাকা না। বাহারে এসে গ্যেচে।" বলা বাহুল্য, বালক সুলভকণ্ঠের এই উক্তিটি ছেলে-মেয়েদের হাসিকে উচ্চতর গ্রামে পৌঁছে দিত।

বড় ভাইসাহেব ও গুরু ওস্তাদ নাসিরুদ্দীন খাঁ সাহেবের কথা বলবার সময় মুখ আর থামতে চাইত না। আর সে কি দীপ্তি চোখেমুখে গুরুর কথা বলতে! গুরুর গুণের কথা বলতে গিয়ে দীন ভাবই বা কত! "আমি বেশরমমে বহুত্ দিন আগে এক-রোজ মালকোষ গান কিয়া। গান শেষ হয়েছে কি এক আমাকে বোলেছে—'তোম নাসিরুদ্দীন খাঁকে শিষ্য আছে। আর মালকোষ রাগকা পবিত্রতা নষ্ট্ কিয়াছ!' আমি মাফি মাঙ্গ্ লিয়া। ইসকা বাদ বার বরষ মালকোষ গান কিয়া না।" বলতে বলতে দাদার কথা ভেবে চোখে জল এসে গেল। গঙ্গাজলও কি এত পবিত্র! তৃণও কি এত দীন!

প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের মুখ দেখে বুঝতে পারতেন তাদের মনের অশান্তির কথা। তখন মিনতি—"কী হয়েছে বাবা, কী হয়েছে মা? দরকার হোয় হামারসে টাকা লও।" Interview-তে প্রতিভাবান ছাত্রের দারিদ্র্যের কথা শুনে তার ভর্তি হবার ও মাস মাইনের সমস্ত দায়িত্ব নিজে নিয়েছেন—এমনও ঘটেছে। যখন ছিল তখন এমন অজস্র জনকে দিয়েছেন। শেষ দিনগুলিতে তাঁর আর কিছু ছিল না।

এই পাণ্ডেজীকে তাঁর শেষ মৃত্তিকাশয্যায় রেখে আসবার জন্য আমরা গিয়েছিলাম গত ২রা মে তারিখে। মৃত্তিকাপ্রকোষ্ঠে শুইয়ে দেবার পর অতি প্রিয় মুখখানি তিনবার দেখতে পেলাম। মাটি দিলাম মুঠোভরে। ক্রমশঃ সরে গেলেন তিনি চোখের অন্তরালে। গোলাপজল, আতর, অজস্র ফুল আর ধূপে মনোমত করে সাজালাম তাঁর শেষ শয্যার উপরিভাগ। ফুলের গন্ধ, আতরের সৌরভ আর ধূপের ধোঁয়ায় মনটা চলে গেল কতদূরে—তাঁর কাছাকাছি। মেঘের পাশ কাটিয়ে চাঁদ তখন ঠিক মাথার উপরে।

একটু আগেই 'গোসল' হয়ে গেছে - মুক্তিস্নান। গোসলের সময় আকাশে ছেঁড়া মেঘের আনাগোনা, দু'একপশলা কান্না—কান্না আমাদের মনেও—খোলা আকাশের নীচে মাঠে বসে আছি আমরা যে ক'জন—তাঁর অতি প্রিয় ছাত্রছাত্রী। অন্ধকার মনগুলোকে অভিভূত করে স্নানঘর থেকে ভেসে আসছে জলধারার অবিরাম শব্দ আর মন-কেড়ে-নেওয়া সুরে কোরানের বয়েৎ। পৃথিবীর মালিন্য ধুয়ে মুছে পবিত্র হবার পর তাঁর শেষ সফরের সহযাত্রী হলাম আমরা। হারিয়ে গেল সুর, নীরব হয়ে গেল ভাষা। নীরবেই প্রতিভাধরকে মৃত্তিকালগ্ন করে এলাম! মনে পড়ে গেল—

> "Dust into Dust, and under Dust, to lie,
> Sans Wine, sans Song, sans Singer and—sans End!"

কিন্তু না! মন বিদ্রোহ করে ওঠে—এইখানেই শেষ নয়। 'পাণ্ডেজী' মানে তো শুধু দেহ নয়—সুর! তাই তিনি আছেন সুরের মধ্যে। কালো রাতের নক্ষত্রখচিত আকাশের মধ্য থেকে নিদ্রাহীন চোখে শুনতে পাবো তাঁর দরবারী, সমুদ্রের পারে বসে অসংখ্য ঢেউয়ের উচ্ছ্বাসে শুনতে পাবো বসন্ত্, আষাঢ়ের প্রথম মেঘডম্বরের মধ্যে শুনতে পাবো তাঁর মেঘমল্লার আর নিদ্রাহীন রাতের অবসাদ তিনি সস্নেহে মুছিয়ে দেবেন প্রথম কাকলীর সঙ্গে আশাবরীর রাগবিস্তারে। প্রভাতের প্রথম অরুণচ্ছটায় তাঁর স্মৃতিধারায় স্নান করে আমি তৃপ্ত হবো—পবিত্র হবো।

●

নাট্যাভিনয় ও নাট্যকলা

শম্ভু মিত্র

আমাদের আলোচ্য বিষয় হোল সৎ নাট্যপ্রচেষ্টা। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করার আগে প্রথমেই আমাদের কাছে স্পষ্ট হওয়া চাই যে নাট্যবস্তুটি কী?

আমরা জানি যাত্রাও নাট্যের অন্তর্ভুক্ত, সঙের নাচ নাট্যের অন্তর্ভুক্ত, প্যান্টো-মাইম নাট্যের অন্তর্ভুক্ত, নৃত্যও নাট্যের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ কথা বা সঙ্গীত বা নৃত্য বা অঙ্গভঙ্গী—এর যে-কোনও একটি বা একাধিক মাধ্যমকে অবলম্বন করেই নাট্যকলার জন্ম হতে পারে। কিন্তু এর মধ্যের মূলসূত্রটা কী? উপরে যে ক'টি উদাহরণের কথা আমরা প্রথমে বলেছি তাতে একটি ব্যাপারকে সর্বত্র বর্তমান ব'লে দেখা যাচ্ছে। সেটা হোল যে যাত্রা, সঙের নাচ, প্যান্টোমাইম বা নৃত্যনাট্য—এর প্রত্যেকটাতেই মানুষ কোনও না কোনও একটি চরিত্র সেজে ভাব প্রকাশ করছে। তা'হলে কি, আমি ছাড়া আর একজন হওয়ার এই চেষ্টাটাকেই নাট্যলক্ষণ বলা হবে?

কিন্তু তাই যদি হয় তা'হলে কথকতা, বর্ণনাময় নৃত্য বা চারণের গান কি নাট্য-প্রয়াস নয়? বলা যেতে পারে যে কথক নানা ভঙ্গীতে নানা ঘটনার বর্ণনা দেয়, বিভিন্ন চরিত্রের কথা সে একাই ব'লে দেয়, তাই সেটা নাট্যশিল্পের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তা'হলে উপন্যাসকারই বা কী সুবাদে কথকের সঙ্গে এক পর্যায়ভুক্ত হবেন না? তার উত্তরে অবশ্য কেউ কেউ বলতে পারেন যে, উপন্যাসকার তো কথা ব'লে বা গান গেয়ে বর্ণনা দিচ্ছেন না—তাঁর মাধ্যম শুধু লিখিত অক্ষর। কিন্তু তাহলে নাট্যকারের লেখা নাটকটাও তো শুধু অক্ষর এবং তা'হলে সেটাকেও তো আমাদের নাট্যশিল্পের বহির্ভূত ব'লে ধ'রে নিতে হয়। অর্থাৎ সফোক্লিস থেকে আরম্ভ ক'রে অসবোর্ণ ওয়েস্কার পর্যন্ত সকলের সৃষ্টিকে একেবারে একসাটে একঘরে ক'রে দিয়ে নাট্যশিল্প সৃজনে বসতে হবে। সেটা কি আমাদের পক্ষে খুব সুবিধের হবে? তা'ছাড়া, কথাকলিতে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র সেজে মানুষ নাচে, কথকেও তা আছে। কিন্তু কোনও চরিত্র না হ'য়ে কেবল মুদ্রা দ্বারা বর্ণনা দেওয়ার মতো নাচও আছে। অর্থাৎ সে নাচের মধ্যে মানুষ অন্য কিছু সাজবার

প্রয়াস পায় না বলেই যে আপনারা তাকে নাট্য-শ্রেণী থেকে বরখাস্ত করবেন তার কোনও উপায় নেই। কারণ সে নাচ একেবারে নাট্যশাস্ত্র-প্রণেতা ভরতমুনির আশ্রিত—নাট্যকুলে কুলীন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মানুষ বা মানুষের তৈরী পুতুল বা ছবি যেখানে অক্ষরের দ্বারা বা উচ্চারিত শব্দের দ্বারা, (এই শব্দের মধ্যেই গানকে গণনা করা যায়) বা অঙ্গ-ভঙ্গীর দ্বারা (এর মধ্যে নৃত্যও গণনীয়) এক বা একাধিক চরিত্রের রূপ ধারণ ক'রে কিংবা রূপধারণ ব্যতিরেকে কেবল বর্ণনার দ্বারা সেইসব চরিত্রের ভাবপ্রকাশ করে, তাকে নাট্যশিল্প ব'লে অভিহিত করা চলে। কিন্তু এতেও কি সমস্যার সমাধান হোল ? কারণ কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, শ্রীতাপস সেন "সেতু"-নাট্যাভিনয়ে যে রেলগাড়ির দৃশ্য দেখান, বা "অঙ্গার"-নাট্যাভিনয়ে যে প্লাবনের দৃশ্য দেখান, সেগুলো কি নাট্যশিল্প-প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত নয় ? তাতে অক্ষরের ব্যবহার নেই, কোনও শব্দের উচ্চারণ নেই, কোনও অঙ্গভঙ্গীরও বালাই নেই। অথচ এমন একটা কিছু নিশ্চয়ই সেখানে ঘটছে যাতে দর্শক-সাধারণ উৎফুল্ল হয়ে হাততালি দিচ্ছেন এবং বিদগ্ধ সমালোচকবৃন্দ সোচ্চারে আধুনিক নাট্যপ্রয়াসকে ধন্যরব জানাচ্ছেন। সেটা কি নাট্যশিল্প ?

এই সুবাদে এ প্রশ্নও উঠতে পারে যে, বিশেষ একটী নাটকীয় মুহূর্তে আবহ-সঙ্গীতের একটী ছোট্ট পকড় বা phrase যদি প্রবল আবেগ সৃষ্টি করতে পারে, সেই phraseটি কি তবে নাট্যশিল্প ? অর্থাৎ সাধারণভাবে সঙ্গীত একটী পৃথক শিল্প, কিন্তু নাট্যান্তর্গত সেই সাঙ্গীতিক টুক্‌রোটি কি নাট্যশিল্প ব'লে অভিহিত হ'বে ?

এ রকম অনেক প্রশ্নই উঠে থাকে যার তালিকা এখানে বাড়িয়ে লাভ নেই। বরঞ্চ উত্তর হিসাবে বলা যায় যে, নববধূ যখন স্বামীর কাছে যায় তখন তার পরণে লাল-চেলি থাকে, গায়ে পালিশ করা সোনার গয়না থাকে (তা সে ১৪ ক্যারেট হোক বা ২২ ক্যারেটই হোক্), কিন্তু তারাই নববধূ নয়, তারা নববধূর আভরণ মাত্র। নববধূ এই সব সজ্জা নিয়েই নববধূ, কিন্তু এদের ছাড়িয়ে গিয়েও সে নববধূ। আলো, মঞ্চমায়া, আবহ-সঙ্গীত এসব নাট্যে থাকতেও পারে আবার অবস্থা-বিশেষে নাও থাক্‌তে পারে, ঠিক যেমন গান্ধর্ববিবাহে চেলি বা নতুন সোনার গয়না না থাকতে পারে, কিন্তু তার জন্য শকুন্তলার বিবাহ অসিদ্ধ হয়ে যায় না।

বেশ। কিন্তু একটা প্রশ্ন আমরা কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারি না, সেটা হচ্ছে যে নাট্যের মূল সত্তাটা কোন্‌খানে, আর কতোটাই বা তার আভরণ! আলো, মঞ্চমায়া, আবহসঙ্গীত—এই সমস্ত বাদ দিতে দিতে আমরা অভিনেতাদেরও বাদ দিয়ে বলতে পারি যে, "রক্তকরবী" নাটক পড়ে বহুদিন থেকেই আমরা মুগ্ধ হয়েছি, তা'হলে

নাট্যশিল্প সৃষ্টি তো ঐ নাটক লেখার সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণ হয়েছে, পরে আবার সেটাকে মঞ্চস্থ করা হোল কিনা সেটা সম্পূর্ণ অবান্তর। কারণ, মঞ্চাভিনয় লিখিত নাটকের নানা-রকম বর্ণাঢ্য আভরণ মাত্র।

এই সূত্রে একটা কথা বলতে শোনা যায় যে, "রক্তকরবী"-নাট্যাভিনয়ে যে interpretation প্রকাশ পায় সেটা কেবলমাত্র পাঠে আসে না, তাই নাট্যপ্রযোজনাটা এ ক্ষেত্রে অবান্তর নয়, বরঞ্চ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

তা'হলে কিন্তু মানেটা এই দাঁড়ায় যে, প্রত্যেক নাটকের মঞ্চরূপায়ণের মধ্যে এমন একটা অচিন্তিতপূর্ব চম্‌কিয়ে দেবার মতো interpretation আমদানি করা চাই যাতে নাট্যাভিনয়কে আর আভরণমাত্র ব'লে বাতিল ক'রে দেওয়া চলবে না। কিন্তু কেবলমাত্র এই রকমভাবে চম্‌কিয়ে দেবার পন্থা অনুসরণ করাই কি আমাদের শিল্পী হিসাবে উন্নত হওয়ার পক্ষে সহায়ক হবে? এবং বহুরূপীর রক্তকরবী নাট্যাভিনয় যদি কেবলমাত্র সেই লক্ষ্যেই প্রস্তুত হয়ে থাকে তা'হলে তাকে শিল্পকর্ম ব'লে গণ্য করা বোধ হয় অনুচিত হবে।

কিন্তু উদ্ভট interpretation-এ চম্‌কিয়ে দেবার কথা ছেড়ে দিলেও সাধারণ-ভাবে আমাদের ধারণা যে নাটককে রক্তমাংসের মানুষ দিয়ে ও অন্যান্য মঞ্চোপযোগী উপকরণ দিয়ে সাজালে আমাদের বুঝতে ও অনুভব করতে সহজ হয় এবং সেইটাই মঞ্চ-প্রযোজনার একটা কারণ।

হয়তো বোঝাবার প্রয়োজনটা একটা বড়ো প্রয়োজন, কিন্তু সেটা তো শিল্পসৃষ্টি নয়। শিশুদের বোঝাবার জন্যে তাদের বইয়ে কবিতার পাশে পাশে illustration থাকতে পারে, নাট্যাভিনয় কি তেমনি কেবল শিশুবোধ্য হবার জন্যে? কারণ ধরা যাক্ শরৎচন্দ্রের মতো কুশলী শিল্পীর কথা, যিনি কেবল ভাষার মাধ্যমে রাজলক্ষ্মীর চরিত্র এতো জীবন্ত করেছেন যে বোধসম্পন্ন পাঠকমাত্রের কাছেই সেটা সেজে বা ছবি এঁকে স্পষ্টতর করতে যাওয়া অসম্ভব কার্য। সেটা কেবল তাঁদের জন্যেই করা যেতে পারে যাঁদের ভাষা থেকে সম্পূর্ণ ভাব উপলব্ধি করার ক্ষমতা কম। নাট্যাভিনয় কি কেবল তাঁদের জন্যে?

তা'হলে নাট্যের মূল সত্তা কি অভিনয় ব্যতিরেকে কেবল নাটকেই? এটা আমরা স্পষ্টতঃ মানতে পারি না, অথচ নাটক বাদ দিয়ে অভিনয়ের কোনও চেহারা আমরা ধরতেও পারি না। ফলে, যখনই বুদ্ধিজীবীর মতো নাট্যাভিনয়ের আলোচনা করতে যাই তখনই নাটকের আলোচনা করে বসি। এবং সমস্ত আলোচনার শেষে বলি 'অভিনয় যথাযথ হইয়াছে',—এ যেন বইয়ের সমালোচনায় বলা—প্রচ্ছদপট ও বাঁধাই ভালো, দাম তিন টাকা আট আনা।

আমার অল্প বয়সে আমাদের পাড়ায় 'চিতোর-গৌরব' নামে একটি স্ত্রী-ভূমিকা-বর্জিত ছোট্ট নাটক অভিনয় হয়েছিলো। তাতে ছিলো, প্রথম দৃশ্যে রাণা অমরসিংহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিলাসে মগ্ন, মোঘলদের আক্রমণ সত্ত্বেও যুদ্ধে যেতে অনিচ্ছুক। কিন্তু নানান অমাত্যের উত্তেজিত বাণী শুনতে শুনতে তাঁর মোহ অপসারিত হয়, তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সেই অভিনয়ে আমার এক বাল্যবন্ধু অমরসিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। অভিনয়ের পরদিন তিনি বাড়ীর এক বৃদ্ধ কবিরাজ মশাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তার অভিনয় কবিরাজ মশায়ের কেমন লেগেছে!

কবিরাজ মশায় প্রায় ক্রুদ্ধকণ্ঠে বল্লেন—গোড়ার দিকে তুমি কী একটা যাচ্ছেতাই যে করছিলে,—একেবারে বিচ্ছিরি! আমার বন্ধু অপ্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—কেন, কী করেছি?

কবিরাজ মশাই বল্লেন—কী আবার! যুদ্ধু করবো না, যুদ্ধু করবো না,—বিলাস-ব্যসনে একেবারে মত্ত। খুব যাচ্ছেতাই হয়েছে।—তবে হ্যাঁ, মোহ ভাঙবার পর থেকে খুব ভালো। তখন থেকে খুবই ভালো। কিন্তু গোড়াটা! বিচ্ছিরি।

তখন আমাদের ছেলেমহলে এই নিয়ে খুব হাসাহাসি হ'য়েছিল। আমরা এঁদের নাম দিয়েছিলাম 'মোহ ভাঙা'-র দল!

কিন্তু নাট্যসম্পর্কে আমাদের অনেকের চিন্তাই এই রকম অপরিস্রুত; এবং এই চিন্তার লজিকেই বলা উচিত যে শিশিরকুমার প্রথম শ্রেণীর শিল্পী ছিলেন না। কারণ তাঁর অভিনীত ও বিপুলসম্বর্ধিত "সীতা" বা "আলমগীর" সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথম স্তরের সম্মান পায় না। সুতরাং তার অভিনয়ে শিশিরকুমারের আর কতটুকুই বা কৃতিত্ব!

কিন্তু যদি স্বীকার করি যে শিশিরকুমার শিল্পী, তা'হলে একথাই বলতে হ'বে যে দ্বিতীয় তৃতীয় বা চতুর্থস্তরের নাটকেও তিনি কিছু অরিজিন্যাল সৃষ্টি করেছেন, এবং সে সৃষ্টি সম্ভব যখন অভিনয় কেবলমাত্র নাটকের রঙচঙে illustration নয়। যেখানে নাটককে বরঞ্চ বলা যায় নাট্যাভিনয়ের জটিল ছকের কিছু শর্টহ্যাণ্ড notes – একেবারেই খুব স্বল্প পরিমাণ notes। গানের স্বরলিপিতে যতোটা বিশদভাবে লেখা থাকে নাটকে তা থাকে না, তার সমস্ত স্বরগ্রাম, তাল ও লয় অভিনয়ে সৃষ্টি করতে হয়; এবং সেই সৃষ্টির মধ্যে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্য আনে। তাই অভিনয়ের ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক রাগ বা দুঃখ ব'লে কোনও পদার্থ নেই, রাবণের বিশেষ মুডের রাগ বা সীতার বিশেষ মুডের দুঃখ আছে। এই যে রাবণ বা সীতার মুডের যে বৈশিষ্ট্য সেটা আসে অভিনেতার বৈচিত্র্য ও গভীরতা থেকে। তাই মহাকবির লেখা সংলাপের ওপর নির্ভর করেই দু'জন

প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা দু'রকম পৃথক রাবণের সৃষ্টি করতে পারেন। নাটকটাই যদি মূল নাট্যবস্তু হোত তা'হলে সেক্স্পীয়ারের লিখিত চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন অভিনেতাকে আশ্রয় ক'রে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পেত না।

এর দ্বারা নাট্যকারদের সম্পর্কে কোনও অবজ্ঞা প্রকাশ করা হচ্ছে না। তাঁরা সাহিত্যিক, তাঁদের অনেকের লেখাই কেবলমাত্র পাঠ্য হিসাবেই উপভোগ্য, কিন্তু সেটাই নাট্য নয়। নাট্য যেন নাটক ও অভিনয়—এই binary star-এর, এই যুগ্মতারার দ্বৈত নৃত্য। পরস্পর যেমন পরস্পরের দাস, তেমনি আবার পরস্পরের প্রভুও। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার অভিনয়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রচণ্ড অভিনয়ের উপযুক্ত নাটক লিখে, আর শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নাটকের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন নাট্যকারের লিখিত চরিত্রের মাধ্যমে তাঁর নিজের চরিত্রের গভীরতম সত্যকে প্রকাশ করবার চেষ্টা ক'রে। এই দুই শ্রেষ্ঠের মিলন হোলে তবেই শ্রেষ্ঠ নাট্যের জন্ম হয়। এবং সেটা ইতিহাসে অহরহ ঘটে না বলেই কখনো নট বড়ো হয়ে ওঠে, কখনো নাট্যকার। ইংলণ্ডে যখন মাঝে মাঝে ক্ষমতাপন্ন নাট্যকারের অভাব ঘটেছে তখনও নটের সৃষ্টি সেক্স্পীয়ারকে আশ্রয় ক'রে প্রকাশ পেয়েছে। সেইরকম কোনও নট যদি তাঁর পরিণত জ্ঞান নিয়ে দু'এক শতাব্দী বেঁচে থাকতেন তা'হলে তাঁকে আশ্রয় ক'রেই নতুন ক্ষমতাপন্ন নাট্যকার নাটক রচনা করতেন। যেমন শুনেছি, ফোর্বস্ রবার্টসন্‌কে মনে করে বার্ণার্ড শ' নাটক লিখেছিলেন।

কিন্তু এ সমস্ত অলস কল্পনা বাদ দিয়ে আবার আমাদের আলোচনায় ফিরে আসা যাক্। গ্রীকযুগে নাটকের ভাষাই প্রধান ছিল, এবং নটের প্রধান গুণ ছিল ভালো আবৃত্তিকার হওয়া। কিন্তু তারপরে ইতালীতে এমন একটা যুগ এসেছিল যখন নাটক ছিল মাত্র একটা গল্পের অতি শীর্ণ প্লট, তার যা কিছু জীবনের সৌষ্ঠব সমস্তই সৃষ্টি হোত অভিনেতাদের দ্বারা মঞ্চের ওপরে। শ্রীমনোমোহন ঘোষ বলেছেন যে ভারতের প্রাচীন নাট্যকলায় গ্রীকদের মতো শ্রবণের ওপর ঝোঁক দেওয়া হোত না, দর্শনের প্রাধান্যই বেশী ছিল। তাই ওদের audience, আমাদের দর্শক। আমাদের auditorium নয়, আমাদের প্রেক্ষাগৃহ। অর্থাৎ এই ভারতবর্ষে নাট্যের এক স্বর্ণযুগে নটের ক্রিয়াই ছিল নাট্যকলার মূল কথা। এবং আরও আশ্চর্যের কথা যে সেই যুগেই কিছু বিস্ময়কর নাটকও লেখা হ'য়েছিল।

তাই আমার বিশ্বাস নাট্যকলার প্রধান কেন্দ্র হোল অভিনয়ের একটি আসর ও নটনটীদের passion, তাঁদের আবেগ।

যতদূর মনে পড়ছে স্তানিস্লাভস্কি যেন কোথায় বলেছেন যে নাট্যকার এসেছে

স্টেজকে অধিকার করতে, নির্দেশকও এসেছে, কিন্তু স্টেজ চিরকালই নটদের, কেবলমাত্র নটদেরই।

এ কথার অর্থ কী? আমাদের সাধারণভাবে ধারণা আছে যে নাট্যকারের সংলাপ যথাযথভাবে বলতে হয়, অর্থাৎ নাটকে যেখানে হাসবার কথা বলা আছে সেখানে হেসে বলতে হবে, যেখানে কাঁদবার কথা বলা আছে সেখানে কান্নার ভাবে বলতে হ'বে।

কিন্তু সেইটুকুই যদি নটের দায়িত্ব হয় তা'হলে দেশের নাট্যশিল্প যে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হবে একথা অবধারিত। এবং এইসব ক্ষেত্রেই নটেরা নাট্যকারকে সম্পূর্ণ আসরটি ছেড়ে দিয়ে নিজেরা মাত্র আভরণে পর্যবসিত হয়।

কথাটা একটু বিশদভাবে বোঝাবার চেষ্টা করা যাক। নাট্যকার স্থান কাল ও পাত্রের একটা উল্লেখ ক'রে সংলাপ সুরু করেন। ধরুন, লেখা আছে রাজীববাবুর বৈঠকখানা। মঞ্চশিল্পী সেইটা জেনে রাজীববাবুর আর্থিক অবস্থার অনুমান ক'রে একটা বৈঠকখানা সাজিয়ে দেন। তারপর দৃশ্যের সময়টা দিন কিংবা রাত্রি বুঝে আলোকশিল্পী যতোটা পারেন আলো করেন। তারপর অভিনেতারা মঞ্চে এসে সংলাপগুলো ব'লে যান। এইরকমভাবে যখন নাট্যাভিনয় হয় তখন সত্যিই কিন্তু পুরো নাট্যাভিনয়টা নাট্যকারের চাদরে বাঁধা, নিজের বিশিষ্ট সত্তার দাবী করা তখন নিতান্তই অযৌক্তিক। সেইজন্য অনেক নির্দেশক গোড়াতেই নাট্যকারের নির্দেশ লঙ্ঘন ক'রে বৈঠকখানার বদলে প্রায় স্যুরিয়ালিষ্ট পদ্ধতিতে একটা মঞ্চসজ্জার নির্দেশ দেন। তিনি যে স্বাধীন, এবং মঞ্চ যে তাঁর এক্তিয়ারে এইটা বোঝাবার জন্যে দরজার ফ্রেমগুলোকে অসম চতুষ্কোণ, এবং জানালাগুলোকে ত্রিভুজের চেহারা দিয়ে খাড়া করান। এতে অনেক দর্শকও খুব প্রীত হন—মাথা নেড়ে ভাবেন যে, হ্যাঁ, একটা জবরদস্ত নির্দেশক আছে বটে পিছনে। ভাবটা অনেকটা "রাজা" নাটকে বিদেশী রাজাদের সম্পর্কে তাঁদের প্রজাদের মনোভাবের মতো।

এরকম পদ্ধতির কথা অন্যত্র আলোচনা করা যাবে, এখনকার মতো শুধু একটা গল্প বলি। আমাদের ছোটবয়সে একজন বন্ধু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য সামনে কাছা এবং পিছনে কোঁচা দিয়ে কাপড় প'রে রাস্তায় বেরিয়েছিল। এই পদ্ধতিটা ব্যক্তিগতভাবে আমাদের অনেকের ভাল লাগে না—একটু লজ্জা লজ্জা করে।

কিন্তু কী উপায়ে তা'হলে নাট্যকারের ওপরে নাট্যকে স্থাপন করা যায়? বিদেশী আলোচনায় অনেক সময়ে দেখা যায় কোনও এক নট বা নটী সম্পর্কে বলা আছে যে অভিনয় খুব sensitive. আমি কয়েকজন উদীয়মান অভিনেতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, sensitive লোকের ভূমিকা হ'লে sensitive অভিনয় হ'বে, আর চরিত্রই যদি

sensitive লোকের না হয়, তা'হলে sensitive অভিনয় হবে না—সুতরাং sensitive acting এর মানে কী?

আমার সেই অভিনেতা বন্ধুরা উত্তর দিতে পারেন নি। কিন্তু তার জন্যে তাঁদের আমি খুব দোষ দিই না। কারণ, শিশিরকুমার বড়ো অভিনেতা ছিলেন, অহীন্দ্রবাবুও বড়ো অভিনেতা ছিলেন, কিন্তু তাঁদের শিল্পের বৈশিষ্ট্য কী ছিল, কে কোন্ জিনিষটা ভাল পারতেন তার কি কোনও ভালো আলোচনা আজ পর্যন্ত হয়েছে? অন্ততঃ সাধারণ দর্শক-সমাজকে ওয়াকিবহাল ক'রে তোলার মতো ক'রে কোনও সীরিয়াস্ আলোচনা হ'য়েছে ব'লে আমরা জানি না।

রবীন্দ্রনাথও গল্প লিখেছেন, শরৎচন্দ্রও গল্প লিখেছেন। গ্রামের গল্পই লিখেছেন। কিন্তু গল্পগুলোতো এক নয়। দু'জনে নিজের নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে দুটো ভিন্ন জগৎ সৃষ্টি করেছেন, একজনের বোষ্টমী আর একজনের কমললতা থেকে একেবারে আলাদা, ঠিক যেমন একজনের বিপ্রদাসের সঙ্গে আর একজনের বিপ্রদাসের পার্থক্য গভীর। এই যে তফাৎটা হয়, আমরা সকলেই জানি যে সেটা শিক্ষার গভীরতম সত্তার উপলব্ধি অনুযায়ী। সেইজন্যে একই পৃথিবী ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর চোখে কী ভীষণ ভিন্নরূপ নিয়ে প্রকাশ পায়!

কিন্তু এই যে নিজস্বতা এটা দেখারও দৃষ্টি থাকা চাই।—বিশেষ করে নাট্যে; কারণ, এতে চরিত্রগুলো ধরা হয় মাঝখান থেকে, তাদের মধ্যে কেউ ভাল, কেউ মন্দ, কিন্তু কে যে কেমন সে সম্পর্কে উপন্যাসের মতো কোনও বিবরণ দেওয়া থাকে না, বা প্রাচীন কোনও কোনও নাট্যে যেমন গোঁফওয়ালা একটা কুৎসিতদর্শন লোক মদের গেলাস হাতে নিয়ে খল্ খল্ করে হাসছে, আমরাও অমনি সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলাম যে এই হোল villain—এ সব কিছুই থাকে না। অর্থাৎ আপনার চারপাশের লোকজনকে চেনবার আপনার যে রকম দৃষ্টি সেই অনুপাতেই আপনি নাট্যাভিনয়ের চরিত্রগুলো বুঝবেন। আপনার যদি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে তা'হলে "সাজাহান" নাটকের প্রথম দৃশ্যে দারা যখন বলে—পিতা, আপনি চিন্তিত হ'বেন না, এ বিদ্রোহ দমন করতে আমি জানি, আর সাজাহান বলেন—না, তার জন্য ভাবছি না দারা, আমি ভাবছি এই ভায়ে ভায়ে যুদ্ধ —তখনই সাজাহানের বলার ভঙ্গীতে আপনি বুঝতে পারবেন যে সাজাহান কী প্রকৃতির লোক।

এক হ'তে পারে, সে সাধারণ অবসরপ্রাপ্ত অথর্ব পিতা, বিষয়সম্পত্তির লোভে ছেলেদের এই কলহে তার খারাপ লাগছে, আবার কিসে কী হ'য়ে যায় এই ভয়ও আছে! তাই ঠাণ্ডা হ'য়ে কথা বলে যতোটা মিটমাট্ করে ফেলা যায় তারই ব্যবস্থা ক'রতে উৎসুক।

আবার এও হ'তে পারে যে, লোকটি একেবারেই কবিপ্রকৃতির। বিদ্রোহ হয়, তাকে দমন ক'রতে হয়—এ সব হোল তার কাছে শৌর্যের ক্ষেত্র, তাতে কাব্য আছে। কিন্তু সম্পত্তির লোভে ভায়ে ভায়ে ঝগড়া করা যেন অত্যন্ত নীচ, অত্যন্ত কুৎসিত—ব'লতে গিয়ে ধিক্কার এসে যায় মুখে।

আবার ধরুন, এও হ'তে পারে যে সাজাহানের মনে প'ড়ে যাচ্ছে যে সে নিজেও এই ভ্রাতৃঘাতী রক্তের পথে হেঁটে সিংহাসনে এসে পৌঁচেছে। এইরকম মনে হচ্ছে হয়তো যে—Sins of the fathers visit their children.

কিন্তু এই যে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র সৃষ্টি করার ইঙ্গিত—এগুলো তো বর্ণনা ক'রে বা underline ক'রে দেখানো হয় না। এগুলো অনেক সময়ে খুবই আলতো ক'রে দর্শকদের সামনে ফেলা হয় এবং তখনই সুরুচিসম্পন্ন বিদগ্ধ দর্শকের অত্যন্ত দরকার হয় দেশে।

দু'জন ইংরেজ অভিনেত্রী Lady Macbeth-এর ভূমিকা দু'রকমভাবে অভিনয় করেছিলেন, নাট্যকারের চাদর ছাড়িয়ে স্বপ্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত না হ'লে তা কী ক'রে সম্ভব ?

কিন্তু এই স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়াটা হয় কী করে ? কেউ যদি বলেন যে আমি রাস্তার বয়াটে ছেলে, এবং ঐ ধরনের চরিত্র দিলে আমি এমনভাবে সিগারেট টানবো, এমনভাবে তাকাবো, গুণ্ডামি করবার সময়ে এমনভাবে আস্তে আস্তে এগুবো যে, কোনও নাট্যকারের ক্ষমতা নেই সেটা লিখে প্রকাশ করে,—তা'হলে আমি কি আপনাদের ফর্দ অনুযায়ী ভালো অ্যাক্‌টর ?

আমরা বলবো যে, নিশ্চয়ই তুমি অ্যাক্‌টর, আমাদের ফর্দ অনুযায়ী তুমি অ্যাক্‌টর। কিন্তু ভালো কিনা সেটা প্রমাণ হবে তুমি কতোটা গভীর হ'তে পারো তার ওপরে।

কেউ যদি দেবতার চরিত্র অভিনয় ক'রে দেবত্ব না আনতে পারে তা'হলে তার চেয়ে যে চরিত্রহীন নিজের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যটুকু আনতে পারে সে অভিনেতা। এবং এর ওপরে যদি সে চরিত্রহীনতার Tragedy-টাও প্রকাশ করতে পারে তা'হলে সে ভালো অভিনেতা।

কিন্তু তা'হলেই একটা সন্দেহ কিন্তু জাগে যার নিরসন প্রয়োজন। অভিনয় কি তা'হলে নিজের গোটাকতক বিশিষ্ট ধরনধারণের প্রদর্শনী ?—যেমন অর্থবহুল ফিল্মের রাজ্যে হ'য়ে থাকে ? সেখানে একজন তারকার publicity build-up-এর জন্য অজস্র ফিল্মসাহিত্যে অজস্রতর বানানো কাহিনীর সঙ্গে সেই তারকার অজস্রতম ভঙ্গীর ছবি

ছাপা হয়। ফলে তার সম্পর্কে দর্শকের একটা কল্পিত ধারণা তৈরী হয়ে যায়। এবং সেই ধারণার উপর ভিত্তি ক'রে যে সমস্ত ফিল্মনাটক লেখা হয় তাতে—এক অভিনেতার ভাষায়—they just behave ; they don't have to act.

এই যে behaviour আর acting-এ পার্থক্য করা হচ্ছে এর অর্থটা কী? উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একটা কুকুরকে দিয়ে যখন অভিনয় করানো হয় তখন সে কি অভিনয় করে? সে কেবল নিজের মতো behave করে, এবং তার সেই behaviour-টা নির্দেশক নিজের সুবিধামতো লাগিয়ে নেন, কিন্তু সেটা তো অভিনয় নয়। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি যে জন্তু-জানোয়ারকে দিয়ে অভিনয় করানো হবে শুনে গ্যেটে নাকি রাগ করে থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর বোধ হয় ধারণা ছিল যে অভিনেতার কাজ একটা মহৎ কাজ, সেই কাজের নামে জন্তু-জানোয়ার আনাকে তিনি মনে করেছিলেন অভিনয়-কলার অপমান করা।

এই বিংশ শতাব্দীতে কিন্তু আমাদের মনে গ্যেটের মতো কোনও দাপট নেই। শুনেছি বিদেশে Rintin tin ব'লে একটী বিখ্যাত কুকুর চিত্রাভিনেতার fan club ছিল। আমি নিজেও একটী ছবিতে অভিনয় করেছি যেখানে একজন অ্যালশেসীয় শ্বাপদ-বংশের সহ-অভিনেতা ছিলেন। এবং শুনেছি প্রত্যেকদিন প্রেক্ষাগৃহে তিনি প্রচণ্ড হাত-তালির ovation পেতেন।

এদেরই মতো শিশুরাও খুব স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। তারা এতো সহজে হাসবে গাইবে নাচবে লাফাবে যে দেখে অত্যন্ত স্বাভাবিক অত্যন্ত জীবন্ত ব'লে মনে হবে। কিন্তু তাদের কাঁদতে বলুন, সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন বহু শিশু বাতিল হ'য়ে গেল, খুব অল্প সংখ্যকই রইল।

আমরা গ্রাম্যচরিত্রে অভিনয় করার জন্য বহুবার এমন সমস্ত লোককে নামিয়েছি যারা কখনো অভিনয়ের কোনও শিক্ষানবিশী করেনি, কিন্তু তাদের অস্পষ্ট উচ্চারণ, অমার্জিত কণ্ঠস্বর এবং ছন্দহীন অঙ্গভঙ্গী চাষার ভূমিকায় অদ্ভুত মানিয়ে গেছে।

কিন্তু কোন চাষা যদি চাষার আপন মনে গা চুলকানো, আবেদন করার সময়ের বিনীত ঘাড় বাঁকানো, চিন্তার সময়ের মাথা চুলকানো, এই সমস্ত একটা ছন্দের মধ্যে বেঁধে প্রকাশ করতে পারে তখনই আমাদের মনে হয় যে চাষাদের বিভিন্ন খুঁটিনাটি ব্যবহার সে খুঁটিয়ে দেখেছে, এবং এর অভিনয় হোল একধরনের চাষা সম্পর্কে এর commentary.

অর্থাৎ অভিনয় মানে কোনও একটা চরিত্র কেবল হ'য়ে ওঠা নয়, সেই চরিত্রের টীকাকার হওয়া। এই টীকা করতে ব'সে যে অভিনেতা যতো detail দিতে পারেন—

আমার এই detail শব্দটার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে এলিওনোরা ডুসে সম্পর্কে বার্নার্ড শ'য়ের লেখায়—তাঁকে ততো sensitive actor ব'লে খাতির করবো।

তাই যখন "দিগ্বিজয়ী" নাটকে শিশিরকুমারের নাদিরশাহের অভিনয় দেখতে যাবো তখন অর্বাচীনদের মতো তাঁকেই বন্য ও violent প্রকৃতির মানুষ মনে ক'রে অভিনয়টা দেখবো না, দেখবো নাদিরশাহ লোকটা সম্পর্কে তাঁর commentary কী, তাঁর বিশ্লেষণটা কী?

অভিনেতার এই যে commentary এটা কিন্তু বিশ্লিষ্ট করে না, অভিনেতার সমগ্র সত্তা দিয়ে এর একটি সংশ্লিষ্ট রূপ ফুটিয়ে তোলাই হোল অভিনয়কলা, নইলে এটা খালি প্রবন্ধকারের কাজ হোতো।

এবং এই যে আপন সত্তা এটাই হোল অভিনেতার যন্ত্র। গায়ক যেমন গলা সাধে, বাজিয়ে যেমন প্রতিদিন বাজনা অভ্যাস করে, কবি যেমন প্রতিনিয়ত মনে মনে শব্দ তৈরী করে আর তাকে আস্বাদ করে, অভিনেতা তেমনি নিজের গলা, নিজের চলা, নিজের তাকানো সমস্তকে নিয়ে প্রতিদিন প্রতিসময়ে প্র্যাক্‌টিস্ করে। তার যন্ত্র হোল সে নিজে, এর ভেতর দিয়েই তাকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব প্রকাশ করতে হবে।

এবং এই অনুশীলন তো খালি বাইরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনুশীলন নয়, এর অনুশীলন তার সত্তার, যা প্রত্যেক যথার্থ শিল্পীর পক্ষে অবশ্যম্ভাবী।

এই রকম ক'রে আমরা অনেকে যদি তৈরী হ'তে পারি তা'হলে হয়তো কোনও একদিন behaviour-এর বিজ্ঞাপনকে লোকে অভিনয় ব'লে ভুল করবে না। অর্থাৎ কুকুরের বা শিশুর বা সমতুল্য বুদ্ধির কোনও অভিনেতার অভিনয়টা কেন যে অভিনয় নয়, এবং কেন যে একজন শিল্পীর অভিনয়টা উৎকৃষ্ট অভিনয়, এই বোধটা আমাদের প্রথমেই হওয়া চাই। অর্থাৎ নাট্যবস্তুর মূল প্রকাশটা কোনখানে। তারপরে আসবে নাট্যপ্রচেষ্টার সদসৎ বিচার।

মুকুলিকা

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

আঁধার মাঝে পাতার ঘেরে
গোপন কোণে
মুকুলিকা স্বপন গাঁথে
আপন মনে—
প্রভাত কবে উঠবে ফুটি
পূব আকাশে,
শিশির কণা দুল দুলাবে
সবুজ ঘাসে,
হাওয়া এসে কোমল করে
পরশ দেবে
হৃদয় হতে সকল ভয়
ভাবনা নেবে,
তখন হবে মুকুলিকার
ফোটার বেলা,
মিলিয়ে দেবে তখন তার
রঙীন খেলা।

আজ প্রভাতে এলো কি তার
তেমন দিন?
আপনাকে সে বিলিয়ে দেবে
শঙ্কা হীন,
মিলিয়ে দেবে সবার খোলা
চোখের আগে,
যেমন আলো ছড়িয়ে পড়ে
আপন রাগে?
ভাববে না সে কেইবা তারে
বাসল ভালো,
কেই বা তারে বিরাগভরে
চোখ রাঙালো,
উষার ডাকে নামবে আজি
সকল ভুলে,
মুকুলিকার মুখাবরণ
পড়ুক খুলে।

একটি আশ্বাস

চিত্তপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

কাল রবীন্দ্র-সৈকতে বসে তোমার কথা ভাবছিলাম বন্ধু,
জোছ্না রাত ছিল।
নদীর কলতান ছিল।
আর ছিল সীমাহীন নক্ষত্রের আকাশ,
যেন তোমার জীবনের শান্ত অবকাশ॥

তুমি আবার ভাল হয়ে উঠবে,
কৃষ্ণচূড়া গুলমোহর তো তোমার বুকের রক্ত নয়!
ও যে যৌবনের রঙ-এ রাঙান,
প্রকৃতির অকৃপণ হাতে সাজান॥

আমরা তোমার প্রতীক্ষায় থাকব,
তুমি আমার পাশে বসবে।
প্রাণভরে হাসবে, গান গাইবে।
আমরা বিন্দুর মাঝে খুঁজব সিন্ধু,
কাল শুধু তোমার কথাই ভাবছিলাম বন্ধু॥

নির্জন স্বপ্ন

বিভাস ঘোষ

এখন আকাশ জুড়ে অনেক আঁধার জমে গেছে ;
দুর্বোধ্য তারার আখরে
চিন্তার অস্পষ্ট মুহূর্ত কাছে আসে ;
আসে আর যায়।
খিল-আঁটা দরজার এপারে
মৃদু এক টিম্‌টিমে আলো ;
মাঝে মাঝে নিশাচর—
কোন কোন অদৃশ্য আসা-যাওয়া।

বেছে বেছে তুলে নিই,
এক-একটা সুস্বাদু অতীত।
তবু, আরো কত ভীড় ক'রে
এপারে—ওপারে—
উপেক্ষিতা স্বৈরিণীর মত।

এ আশ্চর্য অনুভূতিদের
অন্ধকারে মুখোমুখি পেয়ে
স্বেচ্ছা-উদাসীন কোন
নায়কের দু'চোখ কল্পনা করি।

তারপর একান্ত নির্জন।
নেই কোন নরম-সুকেশা ;
কিংবা সেই মৌ-ঝরা মেয়ে।
একা আমি—।
আর সেই সূর্যাকাঙ্ক্ষ স্বপ্ন।

নায়ক

ধীরেন দেবনাথ

উঞ্ছবৃত্তি জীবনের অস্থির নায়ক!
তোমার সোনালী চোখে
আজো কোন্ স্বপ্নের আবেশ
আমারে আকুল করে।
আমারে ভাসায় স্রোতে
তমিস্রার গাহনের শেষে।

তুমি তো জেনেছ—
আমার বুকের মাঝে
জ্বলে কোন্ অনির্বাণ শিখা।

যে-স্বপ্নের মোহ
        দূরবিসর্পিত জীবনের অন্ধকোণে
        মরে গিয়েছিল—
ভাবিনি তো তারি অবশেষ দিয়ে
আজো হবে তব অভিষেক!
তোমার প্রতিষ্ঠা তুমি কবে যে করেছ
        আমার প্রাণের প্রান্তে—
সেদিন জানিনি কিছু।

তাই অশ্রুর আভাসে
মিথ্যা বলে দিয়েছি ধিক্কার,
পৃথিবীর ভ্রূকুটিরে করেছি সম্মান।
তোমারে হারাতে পারি,
এতো বড়ো প্রেম মোর—
সদর্পে করেছি ঘোষণা।

বিরাট ত্যাগের দানে
আমাদের ভালোবাসা
অনেক উজ্জ্বল হবে—
এমনি কত সে কথা!

কিন্তু আজ মনে জানিলাম—
স্মৃতি নয়, প্রেম নয়;
তুমি আছ সকল সত্তায়।
অস্তিত্বের প্রতি রোমকূপে
তোমার নিজেরে তুমি রেখেছিলে
জ্যোতিষ্কের অম্লান দীপ্তিতে।
আজো তার এতোটুকু
হয়নি যে ক্ষয়।

আমার সকল তবে মিথ্যা হোক্!—
তোমার সোনালী চোখে
যে-স্বপ্নের বিদ্যুৎ-ঝিলিক্,
হোক্ তাহে মরণ আমার।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে উত্তরপর্ব

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

১৩২১ সালের বৈশাখ মাসে প্রমথ চৌধুরী প্রকাশ করেছিলেন 'সবুজপত্র'। এই পত্রিকার আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে একটি স্মরণীয় ঘটনা। সজীব এবং সতেজ তারুণ্য 'সবুজপত্রে'র নিয়ত অনুপ্রেরণা। বুদ্ধি এর নির্ণায়ক, পাশ্চাত্ত্য চিন্তাশীলতার সঙ্গে আধুনিক মননের যোগ-সাধন এর লক্ষ্য, এবং ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পুনর্বিচার এর অন্যতম দায়িত্ব। যা "নবীন পত্রের রং", যার মধ্যে "রসের ও প্রাণের যুগপৎ লক্ষণ ও অভিব্যক্তি," তারই ধ্বজা উড়িয়ে—এইভাবেই আসরে এসেছিল 'সবুজপত্র'।

কিন্তু আরো কথা আছে। তা প্রমথ চৌধুরীর রচনা থেকেই উদ্ধৃত করা যাক: "যে জীবনীশক্তির আবির্ভাবের কথা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, সে শক্তি আমাদের নিজেদের ভিতর থেকে উদ্‌বুদ্ধ হয়নি; তা হয় দূর দেশ হতে নয় দূর কাল হতে, অর্থাৎ বাইরে থেকে এসেছে। সে শক্তি এখনো আমাদের সমাজে ও মনে বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। সে শক্তিকে নিজের আয়ত্তাধীন করতে না পারলে তার সাহায্যে আমরা সাহিত্যে ফুল কিংবা জীবনে ফল পাব না। এই নতুন প্রাণকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে হলে প্রথমে লোকের মনে তা প্রতিবিম্বিত করা দরকার। অথচ, ইয়োরোপের প্রবল ঝাঁকুনিতে আমাদের অধিকাংশ লোকের মন ঘুলিয়ে গেছে। সেই মনকে স্বচ্ছ করতে না পারলে তাতে কিছুই প্রতিবিম্বিত হবে না। বর্তমানের চঞ্চল এবং বিক্ষিপ্ত মনোভাব-সকলকে যদি প্রথমে মনোদর্পণে সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে প্রতিবিম্বিত করে নিতে পারি, তবেই তা পরে সাহিত্য-দর্পণে প্রতিফলিত হবে।" (সবুজপত্রের মুখপত্র) 'সবুজপত্রে'র এই উদ্‌ঘোষণ থেকে কয়েকটি সংকেতসূত্র পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমত, দেশের হৃদয়ের মধ্যে একটা উগ্র চঞ্চলতা দেখা দিয়েছে, এমন একটা শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে—যার উৎস দ্বিমুখী; একটি পাশ্চাত্ত্য আধুনিক চিন্তাধারা, আর একটি আমাদের স্বদেশীয় প্রাচীন উত্তরাধিকারবোধ। দ্বিতীয়ত, লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই শক্তি এখনো আমাদের মধ্যে সংহতিলাভ করেনি—জীবনে বা সাহিত্যে তা কোনো পূর্ণ ফলবন্ত রূপ নিয়ে প্রকটিত হচ্ছে না। তৃতীয়ত, এই বিক্ষিপ্ত-প্রবল প্রাণের জোয়ারকে সংহত, সংযত এবং নিয়ন্ত্রিত করে একটি নতুন জীবন তথা সাহিত্য-আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার।

'সবুজপত্রে'র নবত্ব এবং বিশেষত্ব এর থেকেই সুস্পষ্ট। এককথায় 'সবুজপত্র' এক ভাবদ্বন্দ্ব এবং যুগসন্ধির পত্রিকা প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য মননের সমীকরণের প্রয়াস—দেশের অন্তরের প্রচণ্ড সমকালীন আবেগকে একটা সুনির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করবার চেষ্টা, বুদ্ধির আলোকে আত্মসমীক্ষা এবং আগামীযুগের পথনির্দেশের প্রচেষ্টা।

এই নতুন জীবনীশক্তির স্বরূপ কী? সমাজচিন্তা এবং ব্যক্তিত্ববোধ প্রবলভাবে আন্দোলিত হয়েছে ইব্‌সেনের এবং বার্ণাড শ'র নাটকে, গল্‌স্‌ওয়াদির 'ফরসাইট্‌ সাগা'র একটি খণ্ড বাঙালী পাঠকের হাতে এসেছে, আঁরি বারব্যুসের 'L'enfer'-এর সঙ্গে অন্তত বুদ্ধিজীবীদের পরিচয় ঘটেছে, তলস্তয় সামনেই রয়েছেন। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান বিয়র্ণসন পূর্বেই এসেছিলেন—তাঁর উত্তরসূরী হামসুন বাঙালীর অন্তরে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছেন। এই সমস্ত সাহিত্যের পঠন-পাঠনে স্বভাবতই প্রশ্ন জেগেছে, আমাদের এতদিনের প্রচলিত মূল্যবোধ আজ কতখানি স্বীকার্য, নারীর অধিকারের সীমা কতখানি প্রসারিত এবং এইসব নতুন বৈপ্লবিক ভাবনাকে আমরা কী পরিমাণে আত্মস্থ করে নিতে পারি।

অন্যদিকে দেশে প্রবল রাজনীতিক আলোড়ন। বিপ্লববাদী অগ্নিতরঙ্গ বইছে, সেই সঙ্গে এসেছে অসহযোগ ও বিদেশী বর্জনের জোয়ার। দেশপ্রেমের ঝোড়ো হাওয়া ছুটেছে দিকে দিকে। কংগ্রেসপন্থা এবং রুদ্রপন্থা একসঙ্গে তরুণ মনে এক অসহ উন্মাদনার আবর্ত ফেনিয়ে তুলেছে।

অতএব, স্বভাবতই আত্মস্থ হওয়া প্রয়োজন—একটা হিসেবনিকেশ দরকার। এই দারুণ লগ্নে একবার নিজেদের ভালো করে যাচাই করতে হবে, বুঝে নিতে হবে এই মুহূর্তে আমরা কতটা গ্রহণ করব, কতটাই বা বর্জন করব। যে আগুন জ্বালাতে চলেছি, তাতে কতখানি আলো জ্বলবে, গৃহদাহের আশঙ্কাই বা কী পরিমাণে। আত্মবিকাশের প্রচণ্ডতায় আমরা এমন কোন ভ্রান্তিচক্রে পড়ব কিনা—যা শেষ পর্যন্ত আত্মবিনাশে সমাপ্তিলাভ করে।

'সবুজপত্রে'র এই আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ সর্বাধিক সাড়া দিয়েছিলেন এবং বলা বাহুল্য তাঁর পক্ষে সেইটিই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। চতুর্দিকের এই তরঙ্গ-বিক্ষোভে তাঁর চিত্তেও কোনো প্রশান্তি ছিল না। তাই এই আত্মসমীক্ষা এবং সত্যসন্ধানের প্রয়োজনে 'সবুজপত্রে' যে উপন্যাসটি তিনি লিখতে সুরু করলেন, তার নাম 'ঘরে বাইরে।' এইখান থেকেই আমি তাঁর উপন্যাসের 'উত্তরপর্ব' আলোচনা করব।

বহিরঙ্গগত একটি গৌণ কারণও আছে। 'ঘরে বাইরে'ই রবীন্দ্রনাথের চল্‌তি ভাষায় লেখা সর্বপ্রথম উপন্যাস।

॥ ২ ॥

'ঘরে বাইরে' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশে সাড়া তুলেছিল। একদল পাঠক যেমন এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের এক আশ্চর্য আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করলেন, আর একদল তেমনি 'ঘরে বাইরে' থেকে আবিষ্কার করলেন দুর্নীতি এবং দেশদ্রোহিতা। যাঁরা 'ঘরে বাইরে' সম্পর্কে বিক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের অন্ততঃ একজনের পত্রোত্তরে রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্রে'র পাতাতেই তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে কিছু ভাষ্যরচনা করেছেন। কয়েক বছর পরে 'প্রবাসী'তেও তাঁকে আর একবার নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করে নিতে হয়েছে।

এইসব সুপরিচিত আলোচনা থেকে দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন যে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস, এবং উপন্যাসরূপেই তার মূল্য রসিকজনের বিচার্য : সেই সঙ্গে এ-কথাও তিনি জানিয়েছেন কোনো দেশে কোনো কালেই লেখক স্বয়ম্ভূরূপে আবির্ভূত হন না ; ব্যক্তিমানবরূপে দেশ ও জাতি সম্পর্কে তাঁরও কিছু চিন্তা-চেতনা আছে এবং তাঁর সাহিত্যে তাদের প্রতিফলন অপরিহার্য তথা অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সামগ্রিকভাবে এই উপন্যাসে যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তার দায়িত্ব অস্বীকার করেন নি। 'ঘরে বাইরে'র নীতি-দুর্নীতি সম্পর্কে সেদিন যে-সমস্ত প্রশ্ন উঠেছিল, গীতা সম্বন্ধে সন্দীপের হঠোক্তি কারো কারো মনে যে ক্রোধের সৃষ্টি করেছিল—আজকের সাহিত্য-পাঠকের কাছে তা হাস্যকর। কিন্তু 'ঘরে বাইরে'র রাজনীতির ব্যাখ্যান সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ এখনো বিদ্যমান। আর এই দিকটির ওপরে রবীন্দ্রনাথও অনেক বেশি জোর দিয়ে নিজের ভূমিকাটি স্পষ্ট করে নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন : "সত্য প্রেমের পথ আরামের পথ নয়, সে পথ দুর্গম। সিদ্ধিলাভ সকলের শক্তিতে নেই এবং সকলের ভাগ্যেও ফলে না, কিন্তু দেশের প্রেমে যদি দুঃখ ও অপমান সহ্য করি তাহলে মনে এই সান্ত্বনা থাকবে যে কাঁটা বাঁচিয়ে চলবার ভয়ে সাধনায় মিথ্যাচরণ করিনি।"

উপন্যাসের পাতায় নিখিলেশের জবানবন্দিতেও আমরা এই কথাই বারে বারে শুনতে পাই।

'ঘরে বাইরে' যেন প্রমথ চৌধুরীর সূত্র অবলম্বন করে এক সঙ্গে দুটি বক্তব্য তুলে ধরতে চেয়েছে। বিমলা এবং নিখিলেশের দাম্পত্য-জীবনে একটা আনন্দিত সুর-ঝঙ্কার বেজে চলেছিল, কোথাও যে তার মধ্যে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ঘটতে পারে এ সম্ভাবনার আশঙ্কা পর্যন্ত কোনোখানে ছিল না। মেজোরাণী সম্পর্কে যে চাপা-সংশয়টুকু বিমলাকে মধ্যে মধ্যে পীড়ন করত—তা সেই দাম্পত্য-জীবনে একটুখানি ছায়া-আলোকের জাফ্‌রি কাটত মাত্র।

বনেদী রাজপরিবারের ইতিহাসে নিখিলেশ ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। সুরা এবং সাকীর আহ্বানে সে পূর্বপুরুষদের নির্দেশিত পাতালের মসৃণ পন্থা বেয়েই নেমে যায় নি। সে উচ্চশিক্ষিত, আধুনিক এবং চরিত্রবান। নতুন কালের চিন্তাধারার সঙ্গে তার মানস-সংযোগ ছিল, ইব্‌সনের নোরার অন্তর্দাহও তার অজানা ছিল না; তাই বিমলাকে মাত্র গৃহবধূরূপে লাভ করেই তার তৃপ্তি হয় নি। সে বিশ্বাস করত—"স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ।" তাই ব্যক্তিক স্বার্থপরতার ক্ষুদ্র গৃহকোণটি থেকে সে বিমলাকে বাইরের আকাশে মুক্তি দিয়ে নিজের প্রেমকেও মুক্ত করতে চেয়েছিল—সম্পূর্ণ পৃথিবীর মধ্যে পূর্ণভাবেই স্ত্রীকে লাভ করতে চেয়েছিল। নিখিলেশ বলেছেঃ "আমি লোভী নই, প্রেমিক। সেই জন্যেই তালা-দেওয়া লোহার সিন্দুকের জিনিস চাই নি—আমি তাকেই চেয়েছিলুম আপনি ধরা না দিলে যাকে কোনোমতেই ধরা যায় না। স্মৃতি-সংহিতার পুঁথির কাগজের কাটা ফুলে আমি ঘর সাজাতে চাইনি; বিশ্বের মধ্যে জ্ঞানে শক্তিতে প্রেমে পূর্ণ-বিকশিত বিমলকে দেখবার বড়ো ইচ্ছে ছিল।"

এই মুক্তি এল দেশজোড়া রাজনীতিক আলোড়নের ভেতর দিয়ে। আর সেই সঙ্গে দুরন্ত বেগে এল সন্দীপ। "কালপুরুষের নক্ষত্রের মতো" সন্দীপের "উজ্জ্বল দুই চোখ" বিমলার "মুখের উপর এসে পড়ল।" বিমলার ইচ্ছে হল—"গ্রীসের বীরাঙ্গনার মতো আমার মাথার চুল কেটে দিই ওই বীরের হাতের ধনুকের ছিলা করবার জন্য—আমার এই আজানুলম্বিত চুল।"

এইখান থেকেই শুরু হল 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের সংঘাত। সন্দীপের প্রবল ব্যক্তিত্ব, তার চরিত্রের উগ্র প্রচণ্ডতা,—তার নির্লজ্জ নগ্ন দুঃসাহস, তার অকুণ্ঠিত লোভ—এবং সর্বোপরি তাকে ঘিরে ঘিরে দেশপ্রেমের একটা অগ্নিবলয় বিমলাকে অপ্রতিরোধ্য-ভাবে আকর্ষণ করল। শেষ পর্যন্ত দেশপ্রেম রইল ছদ্মবেশ, বিমলার প্রতি সন্দীপের উগ্র কামনা আর পতঙ্গবৃত্ত বিমলার তার প্রতি মরণান্তিক আকর্ষণ 'ঘরে বাইরে'র ট্র্যাজেডীকে ঘনিয়ে আনল।

প্রথম দিকে সন্দীপের প্রতি বিমলার যে শ্রদ্ধা ছিল, তা এক অগ্নিমন্ত্রী দেশনায়কের চরণে নিবেদিত—যা দেশের নগণ্য অগণনকে মহতোমহীয়ানরূপে ছাড়িয়ে উঠেছে বিশাল বনস্পতির মতো। কিন্তু সে মোহ ভাঙতে দেরী হয়নি। তার পরবর্তী অধ্যায় মাত্র ব্যক্তিক আকর্ষণের। লোহা যেমন করে চুম্বককে টানে, কাঁচপোকা যে-ভাবে তেলাপোকাকে আত্মসাৎ করে, তেমনিভাবেই দুর্নিবার বেগে সন্দীপ বিমলাকে টেনে নিয়ে চলেছে। তখন আর সন্দীপ সম্বন্ধে বিমলার শ্রদ্ধা নেই। সে জানে সন্দীপ লোভী,

জানে মিথ্যাকে জোরের সঙ্গে ঘোষণা করাই সন্দীপের চরিত্র ; শান্ত-সংযত নিখিলেশের সত্য, শক্তি এবং ত্যাগের সম্মুখে সন্দীপের মেকী দেশপ্রেম বারে বারে চুরমার হয়ে যায়। তবু সন্দীপকে বিমলা ছাড়তে পারে না ; আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়, নিখিলেশের পা বুকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে—তবুও তার ফেরবার পথ নেই। এ তার নেশা—সর্বনাশের নেশা। এর হাত থেকে সে প্রাণপণে মুক্তি চেয়েছে, কিন্তু সব দিক থেকে চরম দুর্লগ্ন ঘনিয়ে আসবার আগে আর সে-মুক্তি তার আসে নি।

পুরুষের যে আদিম প্রবলতা নারীকে তার শান্ত, শীলিত কক্ষপরিক্রমা থেকে ধূমকেতুর মতো ছিন্ন করে নিয়ে আসে—সেই চিরন্তন ইতিহাসকে শিল্পিত করাই 'ঘরে বাইরে'র প্রধানতম কৃতিত্ব। এর সঙ্গে যুগের প্রশ্নও এসে মিলেছে। নারীর ভূমিকা কতখানি ঘরে, কতখানিই বা বাইরে ? আকাশে ডানা মেলবার অধিকার নিশ্চিত-ভাবেই তাকে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু ঝড়ের কালো মেঘে জ্বলন্ত বিদ্যুতের মনোহরণ মূর্তি দেখে যদি সে সেইদিকেই মৃত্যু-অভিসারে যাত্রা করে—তবে তাকে ফিরিয়ে আনবার প্রয়োজন আছে কি না ? এবং এই ক্ষেত্রে আমরা কতটা গ্রহণ করব ইব্‌সেনের শিক্ষা, আধুনিক ইয়োরোপের নারীস্বাতন্ত্র্যবাদ আমাদের নীড়-জীবনের পক্ষেই বা কতটা কল্যাণকর হবে ?

তিনটি প্রধান চরিত্রের আত্মসমীক্ষার আলোকে এই প্রশ্নই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। উদ্দামতার উদগ্র নেশায় এবং দেশপ্রেমের মোহাবরণে নিখিলেশকে বিমলা উপেক্ষা করেছে, তার উদার, গভীর, নিস্তরঙ্গ, ধ্রুব ও কল্যাণময় প্রেমকে তার বিস্বাদ মনে হয়েছে ; আগ্নেয় মরণ যাকে ডাক দিয়েছে—স্নিগ্ধ-শান্ত ছায়ানীড় তার কাছে তখন নিরর্থক। শান্তি প্রেম এবং কল্যাণের আদর্শে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ এই অগ্নিময় মৃত্যুকেই জয়মাল্য দেননি—অনেক দুঃখের মধ্য দিয়ে, অনেক অপচয়ের বেদনায় দীর্ণজীর্ণ হয়ে বিমলা নিজের সত্যভূমিতে ফিরে এসেছে।

উপন্যাসের মুখ্য অবলম্বন কিন্তু রাজনীতি। মাতানোর এবং খ্যাপানোর আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের কোনো শ্রদ্ধা নেই—তিনি চান আত্মশোধন, তিনি চান আত্ম-গঠন। তাঁর বিশ্বাস, হাজার যুগের সংস্কারে যারা আচ্ছন্ন, তাদের উত্তেজনার মদিরা পান করিয়ে ছোটানো যায় বটে, কিন্তু সে উদ্যম প্রায়শ উপদ্রব এবং শক্তির অপব্যয়। ইংরেজের অত্যাচারকে ঘৃণা করা যায়—কিন্তু ইংরেজকে ঘৃণা করবার অপবুদ্ধি এবং জাতিবৈর দেশকে রসাতলে নিয়ে যাবে। দেশের মানুষকে কাপড় জোগাবার শক্তি নেই, অথচ বিলিতি কাপড় পুড়িয়ে দরিদ্র ব্যবসায়ীর সর্বনাশ করব এবং জনসাধারণকে উলঙ্গ করে রাখব—এই স্বাদেশিকতা তাঁর কাছে দুর্বোধ্য। আর বিপ্লববাদ ? রক্তের

পথ তাঁর কাছে চিরদিন ঘৃণ্য—ও এক বীভৎস পাপচক্র—যা এক অন্যায়ের প্রতীকার করতে গিয়ে সহস্র অন্যায়কে আহ্বান করে আনে। এ সম্পর্কে ইয়োরোপের নজীর তুলে কোনো লাভ নেই। তারা রক্তপাতের পথ ধরে হয়তো অনেকখানি সিদ্ধিলাভ করেছে, কিন্তু তাই দেখেই আমরা অভিভূত হয়ে পড়ব না। শক্তিমত্ততা এবং রক্তপাতের সমস্ত ঋণ একদিন তাকে কড়ায় ক্রান্তিতে মিটিয়ে দিতে হবে, কারণ :

'অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥'

সুতরাং 'ঘরে বাইরে'তে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় এবং প্রত্যক্ষ বক্তব্য : ইয়োরোপীয় শক্তিতন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে অন্ধবেগে এ কোন্ নীরন্ধ্র অন্ধকারের পথে আমরা সর্বনাশের দিকে ছুটেছি ?

মনস্তত্ত্ব এবং কাব্যব্যঞ্জনার আশ্রয়ে, ফাঁকে ফাঁকে প্রয়োজনীয় নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করে, থেকে থেকে চকিত বিদ্যুতালোকে চরিত্রগুলির এক-একটি আশ্চর্য দিক উদ্ভাসিত করে 'ঘরে বাইরে' কলধ্বনিত নদীর মতো তার সমুদ্রপরিণতির দিকে অগ্রসর। কখনো নিখিলেশের মন তাতে গভীর অতলতা সৃষ্টি করেছে, কোথাও বিমলা তার প্রবল আবর্তে ডুবছে-উঠছে, কখনো বা সন্দীপ তাতে ফেনার অট্টহাসি তুলে কূল ভাঙছে।

কিন্তু সাহিত্যের বিচারে, বিমলা-সন্দীপ-নিখিলেশের ভেতরকার মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, সন্দীপের উন্মত্ত, বর্বর আকর্ষণে বিমলার আত্মবিস্মৃতি আর সত্যের শিখায় নিজের হৃদয়কে জ্বালিয়ে রেখে প্রতি মুহূর্তে দগ্ধ হতে হতে নিখিলেশের যে প্রতীক্ষা—এ থেকেই 'ঘরে বাইরে' সম্পূর্ণ সার্থক হয়ে উঠতে পারত। বস্তুত, তাই-ই ঘটেছে। আজ সেদিনের রাজনীতি একটা দূর ইতিহাস মাত্র, তার অনুষঙ্গ একালের পাঠকের মনে যৎসামান্য প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করে। যা সত্য হয়ে ওঠে তা বিমলার কঠিন আত্মদ্বন্দ্ব ; নিখিলেশের কঠিনতর আত্মশাসন এবং সন্দীপের অদ্ভুত অলজ্জ-লুব্ধতা। অর্থাৎ চিরকালীন মানব-সত্যই 'ঘরে বাইরে'কে আজো উজ্জ্বল করে রেখেছে, নিখিলেশ তথা রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রীয় চিন্তা নয়।

এবং, 'ঘরে বাইরে'র দুর্বলতাও এই রাজনীতির চর্চার ভেতরেই। একটা বিশেষ কালের জীবন ও সমাজকে ফোটাতে গিয়ে রাজনীতি প্রয়োজন হলে অবশ্যই আসতে পারে। কিন্তু রাজনীতিক উদ্দেশ্যের দাবি মেটাতেই সব কিছুকে ব্যবহার করতে হবে—সেই উদ্দেশ্যের দ্বারাই সব কিছু চালিত হবে এবং চরিত্র ও ঘটনাকে অস্বাভাবিকভাবে পর্যন্ত বক্তব্যের জোয়ালে বেঁধে দিতে হবে· এ এক মারাত্মক বিভ্রান্তি। এই উপন্যাসে নিখিলেশ এবং চন্দ্রনাথবাবুর মধ্য দিয়ে দেশসাধনার যে তত্ত্ব প্রকটিত হয়েছে, তা

রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা ; তাঁর বহু প্রবন্ধ, আলোচনা এবং চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে আমরা তা জানতে পারি। এই মতকে যদি উপন্যাসের স্বাভাবিক বিকাশের ভেতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারতেন, তা হলে তাতে কোথাও আপত্তি থাকত না। কিন্তু 'ঘরে বাইরে'তে বক্তব্য উপস্থিত করবার ভেতরে একটা অস্বাভাবিক অসহিষ্ণুতা চোখে পড়ে। যে-দোষে বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তর-জীবনের উপন্যাস কঠোরভাবে সমালোচিত— রবীন্দ্রনাথও তা থেকে নিষ্কৃতি পান না। উপন্যাসের প্রতিদ্বন্দ্বী সন্দীপ এই অসহিষ্ণুতার জন্যেই কখনো কখনো ক্লাউনের মতো ব্যবহার করে—বিমলার সশ্রদ্ধ ভক্তি নিবেদনের অন্তরালে রবীন্দ্রনাথের নিগূঢ় ব্যঙ্গ চাপা থাকে না। সন্দীপের মধ্য দিয়ে যে দেশনায়কের মূর্তি রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়েছেন সেই ক্রূর-কুটিল নগ্ন-স্বার্থপর মানুষটি বিপ্লবীদের প্রতি সুবিচার করা দূরে থাক, তার একটা অন্যায় প্যারডি রচনা করেছে মাত্র। সেদিনের যে আত্মত্যাগী মানুষগুলি 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র উচ্চারণ করে অকম্পিত পদে ফাঁসির মঞ্চের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন—রবীন্দ্রনাথ যদি সন্দীপের মধ্য দিয়ে তার প্রতিফলন দেখতে পেয়ে থাকেন, তবে তাকে দেশের দুর্ভাগ্য বলে মেনে নিতে হয়। মতভেদ থাকতেই পারে, কিন্তু তাই বলে বিরুদ্ধ বক্তব্যকে হীন করবার জন্যে হরিশ কুণ্ডুর মতো জমিদারকে দেশপ্রেমিকরূপে চিত্রিত করা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে প্রত্যাশিত নয়—যেহেতু তা ঐতিহাসিকভাবেই অসত্য। আর এই বিকৃতির ফল উপন্যাসের মূল শিল্প-সৌন্দর্যকে পর্যন্ত গিয়ে আঘাত করে। লেখকের সহানুভূতি এবং পক্ষপাতে নিখিলেশ প্রথম থেকেই জয়যুক্ত, সন্দীপ প্রথম থেকেই ঘৃণা এবং কৌতুকের উপকরণ এবং তার প্রতি বিমলার আকর্ষণ—বিমলার রুচি এবং চরিত্রবল সম্পর্কে শুরু থেকেই আমাদের মনে সংশয়ের সৃষ্টি করে। 'Mock-Hero' সন্দীপের জন্যে বিমলার মোহাচ্ছন্ন মূঢ়তা এই কথাই প্রমাণ করে যে সে একরাশ পুঞ্জীভূত আবেগ মাত্র, তার বিন্দুমাত্র বিচারবোধ নেই— অন্যূতম আত্মসংযমের শক্তি নেই। অতএব বিমলার প্রতি পাঠকের সহানুভূতি প্রচণ্ড-ভাবে আঘাত খায়। বলা বাহুল্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রথমেই কৌতুকের এবং অশ্রদ্ধার উপকরণ করে তুললে তাতে ঔপন্যাসিক সংঘাত প্রবলতা লাভ করে না, তা রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্বল হয়ে যায়। 'ঘরে বাইরে'তে পরম বেদনার সঙ্গে এই সত্যটি লক্ষ্য না করে উপায় নেই।

কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর উদ্ধৃতি থেকেই দেখেছি, কালটা আত্মজিজ্ঞাসার এবং আত্ম-সংহতির। সেই প্রয়োজনের দাবিতেই 'ঘরে বাইরে' নানা প্রত্যক্ষ প্রশ্নের উত্থাপনা এবং তার আলোচনায় মুখর। ঔপন্যাসিক এবং তাত্ত্বিকের সেখানে সমভাগ। নিখিলেশ-সন্দীপ-বিমলার হৃদয়গত সংঘাতে ঔপন্যাসিক জাগ্রত এবং সফল ; রাজনীতির

আলোচনায় তাত্ত্বিকের উপস্থিতি এবং সে উপস্থিতিকে শিল্পের বিচারে খুব বাঞ্ছনীয় বলে মনে করতে পারি না।

॥ ৩ ॥

এর পরবর্তী উপন্যাস 'যোগাযোগ'। 'যোগাযোগ' রচিত হওয়ার মধ্যেই 'শেষের কবিতা'ও লিখিত হতে থাকে এবং এই দুটি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে 'বিচিত্রা' ও 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। রচনা এবং প্রকাশের কালবিচারে 'যোগাযোগ' কয়েক মাসের বয়োজ্যেষ্ঠ। তাই যোগাযোগের দিকেই প্রথমে দৃষ্টিপাত করা যাক।

'ঘরে বাইরে' থেকে 'যোগাযোগে'র মধ্যে পনেরো বৎসরের ব্যবধান। এই সময়ের ভেতরে কথাসাহিত্যের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ নিরতিশয় নিরুৎসুক, এমন কি ছোট গল্পের চর্চা পর্যন্ত যৎসামান্য। তাঁর সাহিত্য-সাধনা তখন অন্যতর ক্ষেত্রে ব্যাপৃত, কিন্তু সে আলোচনা আমাদের নয়।

এই পনেরো বৎসরে দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনীতিক ইতিহাস অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। বিপ্লববাদের তরঙ্গ থামেনি, ১৯৩০ সালের চট্টগ্রামে সে তার দারুণ বিস্ফোরণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ঠিক একই সময়ে দেশব্যাপী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রবল বন্যাও সমাগতপ্রায়। রবীন্দ্রনাথের মন এই সময় হিন্দু-মুস্‌লিম সমস্যা নিয়ে চিন্তিত—চরকা কাটা এবং স্বরাজ-সাধনার সত্যবিচারে উৎসুক। 'ঘরে বাইরে'তে তাঁর যে চিত্তদাহ প্রকটিত হয়েছিল, তা এখন স্তিমিত। তিনি এখন সংগঠন-মূলক কর্মপদ্ধতিতে বিশ্বাসী—তথাকথিত 'পলিটিক্‌সে' আর তাঁকে তেমনভাবে উৎসাহিত দেখা যায় না।

সেইজন্যে এই পর্যায়ে যে উপন্যাসে তিনি হস্তক্ষেপ করলেন, তাতে রাজনীতির চিহ্নমাত্র রইল না। 'তিনপুরুষ' নাম দিয়ে যে বৃহৎ উপন্যাসটি তিনি 'বিচিত্রা'র পাতায় আরম্ভ করলেন, তা একান্তই পারিবারিক কাহিনী—রাজনীতি দূরে থাক, তা সমাজ-সমস্যাকে স্পর্শ করল না। 'তিনপুরুষ' অচিরাৎ 'যোগাযোগে' নামান্তরিত হল এবং এক পুরুষের কাহিনীতেই উপন্যাস সমাপ্তি পেল। চাটুজ্জে পরিবার এবং ঘোষাল বংশের পুরুষানুক্রমিক বিদ্বেষের রণক্ষেত্রে কুমুদিনীর সকরুণ আত্মদান একটি বিষণ্ণ গোধূলির পাণ্ডুর ছায়া বিকীর্ণ করল। যেন ট্রয়যুদ্ধের পর তৃষিত প্রেতাত্মাকে তৃপ্ত করবার জন্যে অ্যাকিলিসের সমাধিতে ঢেলে দেওয়া হল প্রায়াম-কন্যা পলিক্‌সেনার শোণিতধারা!

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসেই আমরা লক্ষ্য করেছি, চরিত্র এবং ঘটনার মধ্য দিয়ে বক্তব্যকে ফুটিয়ে তোলার চাইতে চরিত্র ও পরিস্থিতিকে বক্তব্যের বাহন করবার দিকে

রবীন্দ্রনাথ উদ্যোগী হয়েছেন। এই প্রবণতা 'গোরা' থেকেই সূচিত হয়ে উঠেছিল। হয়তো এটা পরিণত বয়সের স্বাভাবিক ধর্ম এবং এই কারণেই উদ্দেশ্যের মহনীয়তা সত্ত্বেও তলস্তয়ের 'রেসারেক্‌শন'কে পূর্ণাঙ্গ শিল্পসাফল্যরূপে গ্রহণ করা কঠিন হয়। 'যোগাযোগ' উপন্যাসেও ভাবদ্বন্দ্বই মুখ্য—চরিত্রগুলো সেই দ্বন্দ্ব প্রকাশের উপকরণমাত্র। চাটুজ্জে এবং ঘোষালবংশের দীর্ঘ পারিবারিক বিরোধের ইতিহাস উপন্যাসের পটভূমিতে থাকলেও এর মূল সংঘাত গড়ে উঠেছে একটি সর্বকালীন সমস্যাকে আশ্রয় করে। শিল্পীর একটি অম্লান উজ্জ্বল সৌন্দর্যপিপাসা এবং তার সঙ্গে স্থূল, রূঢ় ও বৈষয়িক জীবনের সংঘাত যেন চিরকালের 'La belle et La bête'-এর কাহিনী। যা সূক্ষ্ম এবং সুকুমার—তার দিকে প্রতিমুহূর্তে লোভের কুশ্রীতা রাহুর মতো অগ্রসর হয়; কলাবতী বীণার তন্ত্রীগুলি ছিন্ন ছিন্ন হয়ে যায় অসুরের স্থূল-কর্কশ অঙ্গুলি-সম্পাতে; বৈষয়িকতার সারমেয় শিল্পের নৈবেদ্যকে উচ্ছিষ্ট করে। এই বেদনা থেকেই ভ্যান গগকে নিজের হাতে তাঁর 'The yellow house of light'-কে নিবিয়ে দিতে হয়, গর্গ্যা প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে ব্যাধিতে জর্জরিত হয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেন, কীট্‌সের প্রদীপ শিখায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠবার আগেই অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায়।

পৃথিবীর সর্বদেশে, সর্বকালে, সমস্ত শিল্পী-সাহিত্যিক এ নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। অরসিকের কাছে রসনিবেদনের দুর্ভাগ্য থেকে তাঁরা পরিত্রাণ কামনা করেছেন, নিরবধি কালের কাছে সমানধর্মার প্রত্যাশা জানিয়েছেন, দিঙনাগের স্থূল হস্তাবলেপের আশঙ্কায় অনুকূল পবনচারী মেঘদূতের গতি বারে বারে মন্থর হয়ে গেছে। 'যোগাযোগে'র অন্তরলোকেও এই চিরকালীন কাহিনী।

বিষয়ের দিক থেকে রবীন্দ্র-সাহিত্যেও এটি আকস্মিক নয়। 'যোগাযোগে'র পূর্বসূচনা পাওয়া যাবে 'হালদার গোষ্ঠি' গল্পের বনমালীর চরিত্রে, আরো ভালো করে পাওয়া যাবে 'সবুজপত্রে'র প্রথম বৎসরে দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত 'হৈমন্তী' গল্পে। এই 'হৈমন্তী' চরিত্রটি কুমুদিনীর প্রথম খসড়া বলা যেতে পারে। হৈমন্তীর স্বামী এখানে যোগাযোগের মধুসূদন নয়—সে-ভূমিকা নিয়েছে রক্ষণশীল লোভী সংসার—যা প্রতি মুহূর্তে ইতর-কার্কশ্যে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে হৈমন্তীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। হৈমন্তীর পিতা গৌরীশঙ্করের সঙ্গে বিপ্রদাসের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া কঠিন হয় না। সতেরো বছরের কিশোরী হৈমন্তী—যে 'অকলঙ্ক শুভ্র, নিবিড় পবিত্র', তার সঙ্গে 'রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ড' কুমুদিনীর—যার সমস্ত মুখে একটি 'বেদনায় সকরুণ ধৈর্যের ভাব'—আত্মিক সম্পর্ক আপনি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। হৈমন্তীর কায়িক মৃত্যু এবং কুমুদিনীর মানস মৃত্যুর বেদনাও মূলত এক।

বিপ্রদাসের সান্নিধ্যে এবং শিক্ষায়, শিল্পে, সৌন্দর্যে এবং শুচিতায় যে কুমুদিনী রজনীগন্ধার মতোই ফুটে উঠেছিল, নূরনগরকে পরাভূত করবার আকাঙ্ক্ষায় প্রৌঢ় বৈষয়িক মধুসূদন তাকে নিজের ভোগের ফুলদানীতে সাজাবার জন্যে ছিন্ন করে আনল, ঋণের জালে নাগপাশের মতো জড়ালো চাটুজ্জেদের মুমূর্ষু জমিদারীকে। চিরকালের ব্যবসায়ী মধুসূদন ভেবেছিল বিবাহের মধ্য দিয়ে যাকে একবার মুঠোর মধ্যে পাওয়া গেছে সে তার ব্যাঙ্কের টাকার মতো নির্বিঘ্ন ব্যয়-অপব্যয়ের সামগ্রী। জীবিত প্রাণীরূপে স্ত্রীর কিঞ্চিৎ ব্যক্তিত্ব যদি কখনো কখনো প্রতিবাদে সজাগ হয়ে ওঠে, তাহলে তাকে ঘুম পাড়ানোর জন্যে ছু'একখানা হীরা-মুক্তার গহনাই যথেষ্ট।

কিন্তু দেখা গেল, কুমুদিনীর হাতের তুচ্ছ নীলার আংটিটিকে তার সমস্ত ঐশ্বর্য দিয়েও মধুসূদন কিনে নিতে পারল না। যে অর্থ আর শক্তির দম্ভ দিয়ে এতদিন সে পদমর্যাদা ভোগ ক'রে এসেছে, কুমুদিনীর কাছে তা লুটিয়ে গেল ধূলোতে। তারপরে সে বারবার নত হল, অভিমান করল, রাগ করল এবং অনুতাপ করল, কুমুদিনীর দেহের ওপর স্বামীত্বের অধিকার লাভ করেও তার মনকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারল না, বিপ্রদাসের ওপর শূন্যগর্ভ ঈর্ষায় জ্বলে মরল, শেষ পর্যন্ত নিজের ভেতরকার হিংস্র ক্ষুধিত পশুটাকে শ্যামাসুন্দরীর মাংসপিণ্ড দিয়ে পরিতৃপ্ত করতে চাইল। পরিসমাপ্তিতে তারই সন্তানের জননী হয়ে কুমুদিনী যখন তার কাছে ফিরে গেল, তখন সে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক তারপরে আর কাহিনীকে টানেন নি, কিন্তু সেই অলিখিত অংশে কুমুদিনীর প্রাণহীন দেবীমূর্তির পায়ে দিনের পর দিন মধুসূদন তার ব্যর্থ উপচার সাজিয়ে চলেছে, এই রূপটি আমরা কল্পনা করে নিতে পারি।

'যোগাযোগ' উপন্যাস 'ঘরে বাইরে' বা 'চতুরঙ্গের' মতো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের তীব্র তীক্ষ্ণ অন্তর্মুখিতাকে বিশেষ আশ্রয় করেনি; এর বক্তব্য প্রথম থেকেই উপস্থাপিত—তারপর নিরবচ্ছিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত অসংখ্য নাটকীয় মুহূর্ত। এমন দ্রুতগামী উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ এবং সেইজন্যেই মুকুন্দলাল এবং নন্দরাণীর সংক্ষিপ্ত পূর্বকাহিনীটুকুও আমাদের কাছে অনাবশ্যক বলে মনে হতে থাকে।

এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ মধুসূদনের প্রতি নয়—তাঁর মমতায় অভিষিক্ত হয়েছে কুমুদিনী, তাঁর স্নেহে লালিত হয়েছে বিপ্রদাস, প্রসন্নতায় স্নিগ্ধ হয়েছে নবীন, মোতির মা, কালু মুখুজ্জে এবং গোপাল। কিন্তু ঔপন্যাসিক চরিত্র হিসাবে সব চাইতে সার্থক মধুসূদন। বিপ্রদাস, কুমুদিনী এবং মধুসূদন—এই ত্রয়ী ব্যক্তিত্বের মধ্যে মধুসূদনই উজ্জ্বলতম। সে কুমুদিনীর মতো আইডিয়া নয়, বিপ্রদাসের মতো মহৎ ব্যক্তি নয়, নবীন-মোতির মা-র মতো টাইপ নয়, এমন কি শ্যামাসুন্দরীর

মতো দেহসর্বস্ব লোলুপতাও নয়। সে পরিপূর্ণ রক্তমাংসের মানুষ—সহজ এবং স্বাভাবিক। কুমুদিনীকে সে যে চিনতে পারেনি—সে তার দুর্ভাগ্য—অপরাধ নয়; চাটুজ্জেদের অপমান করবার একটা দুরভিসন্ধি যদি তার প্রথম দিকে থেকেও থাকে—তাহলে সে তার অসম্মানিত পিতৃপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাতর্পণ এবং তা যথাযোগ্য। বিপ্রদাসের চিঠি লুকোনোর জন্য কিছু শাস্তি হয়তো তার পাপ্য ছিল, কিন্তু যে জীবনব্যাপী অভিশাপ কুমুদিনীর মধ্য দিয়ে তার ওপরে নেমে এসেছে—এতখানি দণ্ড তাকে কোনোমতেই দেওয়া চলে না।

আমার মনে হয়, যোগাযোগে সব চাইতে করুণ ভূমিকা মধুসূদনের—এ উপন্যাস তারই ট্র্যাজেডী। যে-কোনো সার্থক ঔপন্যাসিক বা নাট্যকার তাঁর প্রধান চরিত্রকে গঠন করেন, নানা টানা-পোড়েনের মধ্য দিয়ে, ভ্রান্তি এবং সংশয়ে দহন করে, নানা পতন-উত্থানের আশ্রয়ে। কবি-ঔপন্যাসিক মধুসূদনকে 'ভিলেন' করতে চেয়েছিলেন কি না জানি না, কিন্তু মধুসূদনের চরিত্রে এই সব লক্ষণগুলি বিদ্যমান। এই উপন্যাসে চূড়ান্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব তারই, তার মনের বঙ্কিম রেখাঙ্কনে লেখকের সিদ্ধিলাভ হয়েছে। উপন্যাসের শেষাংশে যখন কুমুদিনীকে ফিরিয়ে নেবার জন্যে সে বিপ্রদাসকে উকিলের চিঠি দেয়, তখন তার নেপথ্য থেকে যেন আমরা মধুসূদনের আর্তনাদই শুনতে পাই—তার অহঙ্কারের হুঙ্কার নয়!

অন্যদিক থেকে, কুমুদিনী শেষ পর্যন্ত শুচিতার বিবিক্ততায়ই বাস করেছে এবং উপন্যাসের শেষে যখন লজ্জায় গ্লানিতে তাকে অভিশপ্ত স্বামীগৃহে ফিরে আসতে হয়েছে, তখনো তার মন বিন্দুমাত্র মধুসূদনের প্রতি অনুকূল নয়। উপন্যাসের প্রারম্ভে কুমুদিনীকে নিয়ে যে বিরোধের সূত্রপাত ঘটেছিল, পরে দেখা গেল দু-একটি আঘাতের পরেই একটি নিরাসক্ত নিষ্ঠুরতার কেন্দ্রে সে সংহত হয়ে গেছে, স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হবার গ্লানি সে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভুলতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথের আইডিয়া দিয়ে গড়া কুমুদিনীর এই নির্মম অনাসক্তি—সৌন্দর্য এবং কুশ্রীতার অসম-মিলনতত্ত্বে হয়তো সার্থক, কিন্তু জীবনের বাস্তবতার বিচারে মোতির মা-র মতোই তাকে স্বীকার করে নেওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হয়। আর একটু সহজ এবং সহিষ্ণু হলে সে মধুসূদনকে বদলাতে হয়তো পারত না, কিন্তু অনেকখানি ঊর্ধ্বায়িত করে তোলা তার পক্ষে একান্ত অসম্ভব ছিল না। কিন্তু কুমুদিনী তা করেনি, তার সুকঠিন নির্বেদ নিয়ে যখন এক জায়গায় সে স্থির হয়ে দাঁড়ায়, তখন যে বিচিত্রতার বাঁকে বাঁকে চরিত্র পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, কুমুদিনী সে সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়। কুমুদিনীর নিষ্ঠুরতা তাকে মাত্র যে স্বামীর সংসারেই প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়নি তা নয়, জীবন্ত চরিত্ররূপে সাহিত্যের আসর থেকেও তাকে অনেকখানি সরে যেতে হয়েছে।

'ঘরে বাইরে'র মতোই তাই এই উপন্যাস-সম্পর্কেও বলা যেতে পারে, শিল্পী যেখানে প্রধানত আইডিয়ার উপাসক, সেখানে তাঁর কৃতিত্বের অংশ বেশি নয়; কিন্তু বাস্তবতা দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে, হৃদয়বৃত্তির আলোড়ন-বিলোড়ন দিয়ে যখন তিনি দুর্জনকেও রূপায়িত করে তোলেন তখনই সে সত্যিকারের সৌন্দর্য এবং সার্থকতায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মধুসূদনও এই গৌরবের অধিকারী—যেমন ম্যাক্‌বেথ নাটকের নায়ক হত্যাকারী ম্যাক্‌বেথ, যেমন মেঘনাদ বধের নায়ক রাক্ষসপতি রাবণ।

॥ ৪ ॥

'শেষের কবিতা' ঠিক এই ধরনের পারিবারিক উপন্যাস নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের আদর্শই এই উপন্যাসে শিলং শহরের পাইনবনের কাজল-কোমল ছায়ায়, ঝর্ণার ঝঙ্কৃত স্ফটিক-জলের স্বচ্ছধারাতে, রডোডেনড্রনের উদ্ধত শাখার রক্তিমরাগে স্বপ্নবিভোর হয়ে উঠেছে। এর একদিকে ডানের কবিতার কয়েকটি পংক্তির মৃদু গুঞ্জন, অন্যদিকে—'তব অন্তর্ধান পটে হেরি তব রূপ-চিরন্তন'। এর মর্মকথা:

'আমার প্রেম রবি কিরণ হেন,
জ্যোতির্ময় মুক্তি দিয়ে তোমারে ঘেরে যেন।'

'শেষের কবিতা'ও আইডিয়া-ভিত্তিক উপন্যাস। রিয়্যালিটির অংশ এতে আরো সংক্ষিপ্ত—কাহিনী-গ্রন্থনের সূত্রে যে-টুকু বাস্তবতা একান্ত আবশ্যক, মাত্র সেইটুকুই লেখক গ্রহণ করেছেন। অজস্র কবিতায় আকীর্ণ 'শেষের কবিতা' একটি পরিপূর্ণ কাব্য-পাঠের আস্বাদনেই পাঠকের মনকে মন্থর করে তোলে।

একদিক থেকে 'শেষের কবিতা' একটি অপূর্ব প্যারাডক্স্‌। এই উপন্যাস রচনার কালে দেশের বিদ্রোহী নবীন বীরেরা স্থবির রবীন্দ্রনাথের 'শাসন-নাশনে' উদ্যোগী। তাঁর বিরুদ্ধে তরুণদের অভিযোগ সোচ্চার—তিনি রোমান্টিক, তিনি বিগতকালের শিল্পী। রবীন্দ্রনাথ যেন এর প্রতিবাদে গড়ে তুললেন আধুনিকতমতার বিগ্রহ 'অমিট্‌ রে' কে—যার ভাষায়, চাল-চলনে, পোষাক-পরিচ্ছদে একটা সর্বাত্মক বিদ্রোহ—সকলের মধ্যে যে 'ডিস্‌টিংগুইস্‌ড্‌'। 'অমিতর দুর্লভ যুবকত্ব নির্জলা যৌবনের জোরেই একেবারে বেহিসেবি, উড়নচণ্ডী, বান ডেকে ছুটে চলেছে বাইরের দিকে, সমস্ত নিয়ে চলেছে ভাসিয়ে, হাতে কিছুই রাখে না।' তার পকেটে নিবারণ চক্রবর্তীর কবিতার খাতা—যে রবিঠাকুরের আত্মতৃপ্ত সৌন্দর্যরতির কমলবনে মত্ত হস্তীর মতো এসে প্রবেশ করেছে:

"আমার দুর্বোধ বাণী
বিরুদ্ধ বুদ্ধির 'পরে মুষ্টি হানি

করিবে তাহারে উচ্চকিত,
আতঙ্কিত।
অপরিচিতের জয়,
অপরিচিতের পরিচয়,—
যে অপরিচিত
বৈশাখের রুদ্র ঝড়ে বসুন্ধরা করে আন্দোলিত,
হানি বজ্র-মুঠি
মেঘের কার্পণ্য টুটি
সংগোপন বর্ষণ-সঞ্চয়
ছিন্ন করে, মুক্ত করে সর্ব জগন্ময়।"

কিন্তু এই ঔদ্ধত্য এই প্রবল দুর্বিনয়, এই দুর্ধর্ষ আধুনিকতা শেষ পর্যন্ত শিলং পাহাড়ে এসে তার মুখাবরণ মুক্ত করল। দেখা গেল, বাইরে অমিত যতই বিদ্রোহী, অন্তরে সেই পরিমাণেই রবীন্দ্রনাথের শিষ্য। অমিত শিলঙে গিয়েছিল তার স্বশ্রেণীর কেউ সেখানে পায় না বলে, সে চেয়েছিল নির্জনতা—যেখানে দেওদার বনের ছায়ায় বসে নিজের আনন্দে সে বই পড়তে পারে। কিন্তু গল্পের বই নয়। "গল্পের বই ছুঁলে না, কেননা ছুটিতে গল্পের বই পড়া সাধারণের দস্তুর। ও পড়তে লাগল সুনীতি চাটুজ্জের বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব, লেখকের সঙ্গে মনান্তর ঘটবে এই একান্ত আশা মনে নিয়ে।"

কিন্তু একটা ছোট মোটর দুর্ঘটনার আকস্মিকতায় অমিতের মুহূর্তে রূপান্তর ঘটে গেল। "একটি মেয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। সদ্য মৃত্যু-আশঙ্কার কালো পটখানা তার পেছনে, তারি উপরে সে যেন ফুটে উঠল একটি বিদ্যুৎরেখায় আঁকা সুস্পষ্ট ছবি—চারদিকের সমস্ত হতে স্বতন্ত্র। মন্দরপর্বতের নাড়া-খাওয়া ফেনিয়ে-ওঠা সমুদ্র থেকে এইমাত্র উঠে এলেন লক্ষ্মী, সমস্ত আন্দোলনের উপরে- মহাসাগরের বুক তখনো ফুলে ফুলে কেঁপে উঠছে।"

তারপরে নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের কলগুঞ্জন- বুদ্ধি এবং আবেগদীপ্ত তীক্ষ্ণ সংলাপের দ্যুতি—চেরাপুঞ্জির নিবিড়-নীল মেঘ থেকে এক-একটি বর্ষণের মতো কবিতার ধারাপাত। হৃদয়ের প্রবল টানে পরস্পরকে জীবনে জড়িয়ে নিতে গিয়েও শোভনলালের নীরব করুণ প্রেমের অলক্ষ্য বন্ধনে লাবণ্যের দ্বিধা, কেটি মিত্রের আবির্ভাব এবং তার 'এনামেল করা' গালের উপর দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়া, তারপরে 'হে বন্ধু, বিদায়'।

এই কাব্যোপন্যাসের সঙ্গে কোথায় যেন 'ঘরে বাইরে'র একটা অলক্ষ্য সংযোগ অনুভব করা যায়। অমিতের সঙ্গে সন্দীপের অবশ্য কোন তুলনাই করা চলে না—কিন্তু

যে প্রবল প্রাণবেগে অমিত শোভনলালের স্তিমিত ভক্ত-প্রেমের পূজামন্দির থেকে লাবণ্যকে ছিন্ন করে আনছে—তা আর একদিক থেকে বিমলার পরম-সংকটকেই স্মরণ করায়। পরিশেষে যেমন বিমলা সন্দীপের লোভের গ্রাস থেকে মুক্তি পেয়েছে, তেমনি করেই অমিতের স্বপ্নরাজ্যের কুহেলি থেকে লাবণ্য ফিরে গেছে শোভনলালের উৎকণ্ঠ-প্রতীক্ষিত শান্ত প্রেমের জগতে, যে তাকে গ্রহণ করবে "অসীম ক্ষমায়, ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি।" আর অমিতকে জানিয়ে গেছে :

"যে ভাবরসের পাত্র বাণীর তৃষায়,
তার সাথে দিব না মিশায়ে
যা মোর ধূলির ধন, যা মোর চক্ষের জলে ভিজে।
আজো তুমি নিজে
হয়তো বা করিবে রচন
মোর স্মৃতিটুকু দিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট তোমার বচন।
ভার তার না রহিবে, না রহিবে দায়—"

বিশুদ্ধ রোমান্টিক উপন্যাস- চম্পূকাব্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। দেহহীন ভাবময় প্রেমের সেই চিরন্তন আরতি। কিন্তু বৈশিষ্ট্যও আছে। 'শেষের কবিতা'য় ভাষাশিল্পী রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব চরমে পৌঁছেছে। জলভরা মেঘের মধ্যে খরশাণ বিদ্যুতের মতো কাব্যসুরভিত এবং উইটে উজ্জ্বলিত এই ভাষা অনুকরণের প্রলোভন জাগায় ; কিন্তু নদীর ওপর জ্যোৎস্নার লীলাকে যেমন জলের অঞ্জলিতে তুলে আনা যায় না, তেমনি এর ভাষা আমাদের চোখের সামনে থেকে লুব্ধ করেও ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

এই উপন্যাসের আর একটি বিশেষত্ব অমিতের চরিত্র-রচনায়। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় এমন একটি নায়ক-মূর্তি এই পর্যায়ে ফুটে উঠতে আরম্ভ করেছে—যে সমস্ত আধুনিকতা অতিক্রম করে আধুনিক, যে চলনে-বলনে প্রখর-প্রগল্ভ, অথচ যে অন্তরে অন্তরে কোনো স্থির অচঞ্চল ধ্রুব সত্যের প্রত্যয়ী। তার বাইরের সমস্ত উদ্দামতা অশ্রান্ত উগ্রতায় সেই সত্যেরই সন্ধান করে ফিরছে। সে আধুনিক, কিন্তু বিলিতি কেতার অনুকরণে নয়—তার আধুনিকতা সম্পূর্ণই মৌলিক ; সে ফ্যাশানেব্‌ল নয়— ষ্টাইলিষ্ট্ ; সে অভিজাত ইঙ্গ-বঙ্গ সংস্কৃতির সৃষ্টি একটি পরগাছা মাত্র নয়—সপ্ত সমুদ্রের বাতাস ডানায় মাখিয়ে নিয়ে মুক্তির আনন্দে রাজহংসের মতো কোনো মানস-সরোবরের যাত্রী। এই মুক্ত চঞ্চল আধুনিকতম যৌবনের প্রতিভূ অমিত— আর লাবণ্যই তাকে তার মানস-যাত্রার পথ দেখিয়েছে। অমিতকেই আমরা নতুন করে দেখতে পাই 'রবিবার' গল্পের অভীকের মধ্যে।

আর একটি নতুন কথা আছে 'শেষের কবিতা'য়—যাকে রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্ত্বের মধ্যে কিছুটা নতুন সংযোজন বলা যেতে পারে। 'মানসী'তে তিনি যে রূপাশ্রয়ী অকায় প্রেমের সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, তাকেই পূর্বাপর অনুসরণ করে এলেও 'শেষের কবিতা'য় তার সীমা আরো একটু প্রসারিত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ সত্যতর প্রেমকে ধ্যানের মধ্যে রেখে নিভৃতে পূজো করা যায়, আর ব্যবহারিক জীবনে আর এক প্রেমকে নিয়ে দৈনন্দিনতা নির্বাহ করা চলে। অমিতের ভাষায় 'দীঘি', আর 'কুয়োর জল'। "কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল,—প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যের সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা সে রইল দিঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।" এই ঔদার্য অবশ্য তরুণ রবীন্দ্রনাথ দেখাতে পারেন নি ; পারলে 'নষ্ট নীড়' অমন করে ভাঙনের মধ্যে হারিয়ে যেতো না—চারু, অমলের সরোবরে অবগাহন করে ভূপতির ঘড়ায় তোলা জলেই স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে পারত।

॥ ৫ ॥

১৩৩৯ এবং ১৩৪০ সালে পর পর দুটি ছোট উপন্যাস প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা' পত্রিকায়। একটি 'দুই বোন', আর একটি 'মালঞ্চ'। উপন্যাসের কিছু লক্ষণ থাকলেও এদের আয়তনে, ঘনীভূত বিন্যাসে, চরিত্রের স্বল্পতায় এবং ইঙ্গিতধর্মিতার প্রাচুর্যে দুটি দীর্ঘ ছোটগল্পেরই আস্বাদ লাভ করা যায়। ভাবের দিক থেকেও উপন্যাস দুটিতে কিছু ঐক্য আছে—এদের 'দুই বোন' নামে চিহ্নিত করলেও অন্যায় হয় না।

দুটি উপন্যাসই মূলতঃ রোমান্টিক—কেন্দ্রে একটি পুরুষ, তাকে প্রদক্ষিণ করে 'দুই নারী'। 'দুই বোনে' এ ছাড়াও কিছু তত্ত্ব আছে। "মেয়েরা দুই জাতের। .. একজাত প্রধানত মা, আর একজাত প্রিয়া।" একজন 'বর্ষাঋতু'—যে জলদান করে, ফলদান করে, তাপ নিবারণ করে—শুষ্কতাকে দূর করে দিয়ে জীবনকে তৃপ্ত পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। আর একজন বসন্ত—তার সমস্ত মায়ামন্ত্র আর চঞ্চলতা নিয়ে প্রবেশ করে চিত্তের গভীরে—"যেখানে সোনার বীণায় একটি তার রয়েছে নীরবে, ঝংকারের অপেক্ষায়, যে-ঝংকারে বেজে বেজে ওঠে সর্ব দেহে মনে অনির্বচনীয়ের বাণী।"

'দুই বোন' উপন্যাস এই দুইজাতের নারীর পরিচিতি—একটি বিশেষ আইডিয়ার দ্বারা নির্দেশিত, উপন্যাসের সূচনা-পর্বেই কবি সে-কথা তাঁর পাঠকদের জানিয়ে দিয়েছেন এবং 'বিচিত্রা'য় পত্রস্থ একটি চিঠির মাধ্যমে উপন্যাসের মর্মবাণীটি সুস্পষ্ট-ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তা থেকে আমরা জানতে পারি, যে-ধরনের পুরুষের স্ত্রীর মধ্য

দিয়ে মাতৃস্নেহলাভে সারাজীবন চরিতার্থ হয়ে থাকে—গল্পের নায়ক এঞ্জিনীয়র শশাঙ্ক সে-দলের নয়। তার অন্তর চেয়েছিল স্ত্রীকে "স্ত্রীরূপেই"—চেয়েছিল "যুগলের অনুষঙ্গ"। তার বদলে সে পেল শর্মিলাকে: "বড়ো বড়ো শান্ত চোখ; ধীর গভীর তার চাহনি; জলভরা নব-মেঘের মতো তার দেহ। স্নিগ্ধ শ্যামল; সিঁথিতে সিঁদুরের অরুণরেখা।" এবং তার "মকরমুখো মোটা বালাপরা" দুই হাতে কল্যাণময় সেবা আর অতিলালনের সতর্কতা।

এইখানেই শশাঙ্কের মনে লুকিয়েছিল একটা অচেতন অতৃপ্তি। যে লীলারূপিণী প্রেয়সীর জন্যে অন্তর তার নিজের অগোচরেই দিনের পর দিন তৃষিত হয়ে উঠছিল, একদিন অবস্থাচক্রে তারই সংবাদ নিয়ে এল শর্মিলার ছোট বোন ঊর্মিমালা। নামের মধ্যেই তারও চরিত্রের ইঙ্গিত। সে "যতটা দেখতে ভালো তার চেয়েও তাকে দেখায় ভালো। তার চঞ্চল দেহে মনের উজ্জ্বলতা ঝল্‌মল্ করে বেড়ায়।"

শশাঙ্কের মতো ঊর্মির জীবনেও একটা ভ্রান্ত নির্বাচন ঘটে গেছে। সে ব্যক্তি নীরদ—জন্ম গুরুমশাই—প্রতি পদে যার শাসন আর নিষেধ—যাকে নিয়ে ঊর্মির "প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল।"

অর্থাৎ দু-দিক থেকেই অমিল পয়ার এবং ছন্দোপতন। নীরদ বিলেত যাওয়ার পরে তপস্যার কারাগারে বন্দিনী ঊর্মি কিছুদিনের জন্যে পেল মুক্তি আর সেই মুক্তির আনন্দে সে মাতিয়ে দিলে শর্মিলার কেজো স্বামী শশাঙ্ককেও। লোহা-লক্কড় চূণ-সুরকির তলায় এঞ্জিনীয়ারের যে হৃদয়টি চাপা পড়ে গিয়েছিল এবং শর্মিলার অতিলালনে যে পুরুষসত্তা শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়েছিল - তারা একসঙ্গে বসন্তের বাতাসে জেগে উঠল। শর্মিলার অসুস্থতার আনুকূল্যে এবং নীরদের বিশ্বাসঘাতকতায় ব্যবসায়ে সর্বনাশের আগুন জ্বেলে তারই আলোকে যখন ঊর্মিকে জীবনে বরণ করতে যাচ্ছিল শশাঙ্ক, তখন দিদির দিকে তাকিয়ে ঊর্মিই নিজেকে তা থেকে সবলে বিচ্ছিন্ন করে নিলে। "ভাগ্যের অঘটন শোধরাতে গিয়ে সামাজিক অঘটন দারুণ হয়ে উঠল"—এই হল লেখকের সিদ্ধান্ত।

অসম মিলনের এই সমস্যা সর্বকালের, অথচ সামাজিক বিধি-বিধান এবং লোকাচারের নিষেধে এর কোনো প্রতিকার নেই। শর্মিলার মতো আদর্শ স্ত্রীকে পেয়েও মনের ছন্দ মেলেনি বলে শশাঙ্ক অসুখী—ডিভোর্সের মামলায় আদালতেও এ যুক্তি অচল। অথচ এই যন্ত্রণা সত্য এই অতৃপ্তির মধ্যে কোনো রোমান্টিক্ কল্পনা-বিলাস নেই। বাধ্য হয়েই মানুষকে নিজের প্রাপ্তির সঙ্গে চুক্তি করে নিতে হয়, তাকে বলতে হয়; "যা পেয়েছি তাই মোর অক্ষয় ধন, যা পাইনি বড়ো সেই নয়।" তারপরে দিন কাটতে থাকে, অভ্যাসের সঙ্গে ঘষা খেতে খেতে অনুভূতির তীক্ষ্ণতা ভোঁতা হয়ে আসে, তখন আর 'কী পাইনি' মন তার হিসেব মেলাতে উৎসাহ বোধ করে না।

কিন্তু এরই মধ্যে যদি কখনো দেখা দেয় ঊর্মিমালার মতো তপোভঙ্গ মহেন্দ্রের দূতী, তখন তার কালো চক্ষের বিদ্যুতের আলোয় অসাড় ঘুমন্ত চেতনায় সোনার কাঠির ছোঁয়া লাগে, যাকে ভোঁতা লোহার ফলা বলে মনে হয়েছিল তা ইস্পাত হয়ে জ্বলে ওঠে, মজা নদীতে অকস্মাৎ দুরন্ত বন্যা বয়ে আসে। সেদিন যে অঘটন ঘটতে আরম্ভ করে, সামাজিক দিক থেকে তাকে ধিক্কার দেওয়া চলে, নীতি দিয়েও তাকে সমর্থন করা যায় না, কিন্তু সত্য হিসেবে তাকে অস্বীকার করবার পথ কোথায়? এই 'Mal-adjustment' এবং তাকে সংশোধন করবার একটা করুণ চেষ্টার বিষণ্ণ কাহিনী পরিবেষণ করা হয়েছে 'দুই বোনে'।

জীবনে স্ত্রী-প্রিয়া এবং কর্মসহচরী—একটি নারীর মধ্যেও কখনো কখনো যে এই ত্রিবেণী এসে মিলিত হয় না—একথা বিশ্বাস করি না। এমন হলে, চরিতার্থ পুরুষ অর্জুনের মতোই বলতে পারে: 'প্রিয়ে, আজ ধন্য আমি।' কিন্তু যদি তা না হয়? যদি নদীর এক কূলে প্লাবন ঘটে—ঘটে অনাবশ্যকতার বন্যা, আর এক তীরে দীর্ঘ তৃষিত মরুভূমি ধূ ধূ করতে থাকে, তখন?

ইউজিন ও'নীলের 'The Strange Interlude' বলে যে বিখ্যাত নাটকটি আছে, তার নায়িকা তিনজন পুরুষকে দিয়ে জীবন পরিপূর্ণ করতে চেয়েছে। একজন তার প্রেমিক, একজন তার সুস্থ-সবল সন্তানের জনক, তৃতীয় জন তার ভর্তা ও রক্ষাকর্তা। বক্তব্য চমকপ্রদ, কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য হওয়া শক্ত। শশাঙ্কও শেষ পর্যন্ত শর্মিলার শান্ত আত্মত্যাগের প্রশ্রয়ে এমনি একটা সমাধানের দিকেই চলতে চেয়েছিল, কিন্তু তা আর ঘটল না। ভাঙনের পথ বেয়ে বেরিয়ে গেল ঊর্মি আর তিনজনের মনে জেগে রইল এমন ক্ষতচিহ্ন—যা থেকে চিরদিন রক্তবিন্দু ঝরতে থাকবে। অথবা চির-দিনের কথাই বা কে বলতে পারে—নিভৃত আত্মলেহনে সে ক্ষতকে নিরাময় করবার ক্ষমতাও তো মানুষের অনায়ত্ত নয়!

'মালঞ্চ' উপন্যাসেও এক পুরুষ, দুই নারী। শশাঙ্কের সঙ্গে আদিত্যের সাদৃশ্য আছে, নীরজার মধ্যে খানিকটা শর্মিলা, সরলার মধ্যে খানিকটা ঊর্মি। কিন্তু আদিত্য ও নীরজার মিলন ভাঙা ছন্দের অমিত্রাক্ষর নয়। "বিবাহের পর দশটা বছর একটানা" ওদের চলে গেছে "অবিমিশ্র সুখে"। নীরজাকে "মনে মনে ঈর্ষা করেছে সখীরা; মনে করেছে ওর যা বাজার দর তার চেয়ে ও অনেক বেশি পেয়েছে। পুরুষ বন্ধুরা আদিত্যকে বলেছে, 'লাকি ডগ'।"

এই দাম্পত্য জীবনের প্রতীক আদিত্য আর নীরজার "ফুলের চাষ"—তাদের যৌথ প্রেমের পুষ্পিত পরিপূর্ণ রূপ 'মালঞ্চ'। নীরজা নিঃসন্তানা—অন্যদিকে তার

"ভালোবাসার ছিল প্রচণ্ড জেদ।" এই প্রচণ্ড জোরালো ভালোবাসা দিয়েই সে ঘিরে রেখেছে আদিত্যকে—ফুটিয়ে তুলেছে মোতিয়া বেল, গোলাপ, ম্যাগ্‌নোলিয়া, রজনীগন্ধা, ডালিয়া, জিনিয়া, কার্নেশন। স্বামীর মতোই মালঞ্চের সঙ্গেও তার অচ্ছেদ যোগ, মালঞ্চের মধ্যেই তার প্রেম সহস্র পুষ্পদণ্ডে সূর্যস্নাত, বর্ষণসিক্ত, বসন্ত-সমীরিত।

কিন্তু মৃত সন্তান জন্মের পরে নীরজার জীবন্মৃত্যুর দুর্ভাগ্য কাহিনীতে ঘনিয়ে আনল দুর্বিপাক। এল সরলা। শান্ত, অন্তর্মুখিনী। আদিত্যের প্রথম জীবন-মালঞ্চের সে মালিনী—যার কাছে আদিত্যের বৈষয়িক সার্থকতার ঋণও সামান্য নয়। তারপরেই নীরজার দুঃসহ অন্তর্জ্বালার অধ্যায়। সে জানে, দিনের পর দিন তার পালা ফুরিয়ে আসছে, মালঞ্চের কোনো কাজেই সে আর কোনোদিন লাগবে না, তার জায়গায় আজ অপরিহার্যভাবেই সরলার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যা সত্য তাকে স্বীকার করে নেবার মতো বিবেচনা নীরজার আছে, রমেনের কথাও সে ভোলেনি, কিন্তু তার সাম্রাজ্যে তারই চোখের সামনে আর একজন অধিকারী হয়ে বসবে, এ সহ্য করা অসম্ভব। নিজের নিরুপায় যন্ত্রণায় সে রক্তাক্ত হয়েছে, অপমানের আঘাত দিতে চেয়েছে সরলাকে, অথচ সেই সঙ্গে চেয়েছে স্থৈর্য—একান্তভাবে কামনা করেছে তার অন্তর প্রসারিত হোক—ঔদার্যে উন্মুক্ত হোক —যাবার আগে যেন নিজের হাতে সরলাকে মালঞ্চ সমর্পণ করে দিতে পারে।

আদিত্যের মনেও তার প্রথম মালিনীকে জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার স্বপ্ন জেগেছে। আর নীরজার বিদ্বেষ এবং আদিত্যের ভালোবাসার দোটানায় সে-ও ক্ষত-বিক্ষত। সরলাও বুঝেছে সে সরে গেলেই হয়তো আদিত্যের সংসারে এবং মালঞ্চে নতুন করে সুর ফিরে আসবে। অতএব স্বদেশকর্মী রমেনকে তাঁর প্রশ্ন ঃ

'রমেনদা, জেলে যাওয়া যায় কী করে, পরামর্শ দাও আমাকে।'

'জেলে যাবার রাস্তা এত অসংখ্য এবং আজকাল এত সহজ যে কী করে জেলে না যাওয়া যায়, সেই পরামর্শই কঠিন হয়ে উঠল।...'

'না আমি ঠাট্টা করছি নে, অনেক ভেবে দেখলুম, আমার মুক্তি ওইখানেই।'

কেন? তার কারণ—এতদিন সরলা নিজেকে চিনত না, নীরজার "বিরাগের আগুনের আভায় সে নিজেকে দেখতে পেয়েছে,—"তেইশ বছর যা ছিল কুঁড়িতে, আজ দৈবের কৃপায় তা ফুটে উঠেছে।" সরলা এবং আদিত্য সেই উপলব্ধির আলোকে নিজেদের ভেতর আর কোনো আড়াল রাখল না। "সরলা উঠে দাঁড়াল, আদিত্য সামনে দাঁড়িয়ে, দুই হাত ধরে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, যেমন তাকিয়ে আছে আকাশের চাঁদ। বললে, 'কী আশ্চর্য তুমি সরি, কী আশ্চর্য'।"

তারপরে রমেনের সঙ্গে জেলেই গেল সরলা। আবার জ্বলতে লাগল নীরজার মন। এই বাগান ছেড়ে মৃত্যুর পরেও সে চলে যেতে পারবে না। তাই আদিত্যকে সে বলে, "ওই বাগানটা সম্ভব আর আমিই হব অসম্ভব এ হতেই পারে না, কিছুতেই না। সন্ধ্যেবেলায় ঠিক অম্‌নি করেই অস্পষ্ট আলোয় কাকেরা ফিরবে বাসায়, এম্‌নি করেই দুলবে সুপুরিগাছের ডাল ঠিক আমার চোখের সামনে। সেদিন তুমি মনে রেখো আমি আছি, আমি আছি, সমস্ত বাগানময় আমি আছি। মনে কোরো বাতাস যখন তোমার চুল ওড়াচ্ছে, আমার আঙুলের ছোঁয়া আছে তাতে। বলো, মনে করবে?"

এই হল নীরজার দাবি, তার অন্তিম কামনা। মালঞ্চের ওপর তার অধিকার জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে সমানভাবে প্রসারিত। কিন্তু মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সে নিজেকে আজ মহত্তম ত্যাগের জন্যেও প্রস্তুত করে নিয়েছে, সরলার প্রতি সমস্ত বিদ্বেষ তার ফুলবাগানের কাঁটাগাছের মতোই সমূলে এবং সজোরে উৎপাটিত করে তুলতে চেয়েছে সে। "কাল রাত্রি থেকে বার বার পণ করেছি, এবার দেখা হলে নির্মল মনে ওকে বুকে টেনে নেব আপন বোনের মতো।···বলো, আমি তোমার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হব না, তাহলে সবাইকে আমার ভালোবাসা দিয়ে যেতে পারব।" আর রমেনের কথাগুলো স্মরণ করে সরলা ফিরে আসবার সময় পর্যন্ত ডাক্তারের কাছে সে বেঁচে থাকবার আকুতি জানিয়েছে, বার বার সংকল্প করেছে—"দেব দেব দেব, সব দেব।"

কিন্তু শেষ মুহূর্তে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারে নি। সরলা ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তিম চেষ্টায় বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ক্ষিপ্তা ডাকিনীর মতো। বলেছে, "জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না। আমি থাকব, থাকব, থাকব।···পালা পালা পালা এখনই, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত।"

'দুই বোন' এবং 'মালঞ্চে' কোনো বৃহৎ তত্ত্বকথা নেই, কোনো জটিল ঘাত-সংঘাত নেই, চিন্তার এবং মনোবিকলনের তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ নেই—উপন্যাসের সুদীর্ঘ ব্যাপ্তিও নেই। আগেই বলেছি, এ দু'টি ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত। আর ভালো ছোট-গল্পের মতোই এরা নিরলঙ্কৃত উজ্জ্বলতায় দীপ্তিমান, সাংকেতিকতায় সমৃদ্ধ, গতিতে খরধার, ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ। অসামান্য সংযম এবং নৈপুণ্যের সাহায্যে জীবনের সরল অথচ অতি বাস্তব সত্যকে শিল্পিত করে তুলে রবীন্দ্রনাথ এই গল্প দু'টিকে রসোত্তীর্ণতায় পৌঁছে দিয়েছেন। 'ঘরে বাইরে', 'যোগাযোগে'র মতো বস্তু-মাহাত্ম্য এদের না থাকতে পারে, কিন্তু শিল্প-বিচারে এরা পূর্ণতর বলেই আমার মনে হয়। আর ছোটগল্প-লেখক রবীন্দ্রনাথ যে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের চাইতে মহত্তর শিল্পী—এই দু'টি রচনা তা আরো একবার প্রমাণ করে।

॥ ৬ ॥

রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ উপন্যাস 'চার অধ্যায়'।

এই উপন্যাসের আলোচনা করতে গিয়ে কিছু সংকোচ বোধ হচ্ছে। 'ঘরে বাইরে'র মতো এতে আবার রাজনীতি ঘিরে এসেছে—তা বিপ্লববাদের সমালোচনা। এর প্রথম মুদ্রণে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে কবির ব্যক্তিক আলাপের যে পূর্বভূমিকাটুকু যুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল, সম্ভবত চতুর্দিকের ক্রুদ্ধ প্রতিবাদে তা পরে প্রত্যাহৃত হয়েছে। এবারেও জনমত 'চার অধ্যায়ে'র বিরুদ্ধে উদ্যত হয়েছে—তা রাজনীতিক কারণেই।

'চার অধ্যায়' সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথকে 'ঘরে বাইরে'র মতো জবাবদিহি করতে হয়েছে—বলতে হয়েছে : "যেটাকে এই বইয়ের একমাত্র আখ্যানবস্তু বলা হয়েছে সেটা এলা ও অতীন্দ্রের ভালোবাসা।" এই ভালোবাসাকে যা নিয়ন্ত্রিত করেছে তা মাত্র নায়ক-নায়িকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই নয়—চারদিকের অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাত। এর রাজনীতির পটভূমি সেই পরিপার্শ্ব মাত্র।

কিন্তু পরিপার্শ্ব এত প্রবল যে মাত্র প্রেম-কাহিনীরূপেই 'চার অধ্যায়'কে গ্রহণ করা শক্ত। বিপ্লবী আন্দোলনের যে ছবি এতে ফুটেছে—সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার দাবি জানালেও তার সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্নের অবকাশ থাকে। বিশ্বাসঘাতকের হয়তো অভাব ছিল না, কিন্তু দলের পক্ষে কোনো কর্মী যদি ভার হয়ে ওঠে, তাহলে ইন্দ্রনাথের মতো নেতা স্বয়ং পুলিশে খবর দিয়ে সে ভার বর্জন করেন, বিপ্লবীদের ইতিহাসে এমন ঘটনা অশ্রুতপূর্ব। সত্যের বিচারে কানাই গুপ্ত সম্পূর্ণ অবাস্তব। বটু যেভাবে এলাকে আত্মসাৎ করতে চেয়েছে, তাকে অপবাদ বললে অত্যুক্তি হয় না।

আমার ক্ষোভ সেখানেও নয়। আসল কথা, এই উপন্যাস একান্ত দুর্বল। কথার কারুকার্য আছে, কিন্তু তারা চমকিত করে না ; চরিত্রগুলো প্রাণবন্ত হয়নি—তারা খসড়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে—কেউ-ই যেন রক্তমাংসে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। ব্রতভ্রষ্ট অতীনের বেদনা এবং এলার ট্র্যাজেডী—কোনোটিই মনে দাগ কাটে না। 'ঘরে বাইরে'তে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে চরিত্রায়ণে যে প্রচণ্ড বলিষ্ঠতা অনুভব করা যায়—'চার অধ্যায়ে' তার চিহ্নমাত্রও নেই। এইখানেই এই উপন্যাসের ব্যর্থতা। বিপ্লবী কর্মধারার বিপক্ষে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অতীন-এলার প্রেমের পটভূমিকাতে যদি শিল্পরূপে উপস্থাপিত হত, তা হলে 'চার অধ্যায়'কে গ্রহণ করতে আমাদের দ্বিধা থাকত না। কিন্তু এই উপন্যাসে শৈল্পিক ভিত্তিই শিথিল বলে রাজনীতিগত প্রশ্ন মুখ্য হয়ে উঠে প্রতিবাদে

পাঠককে উত্তেজিত করে, মূল নিঃশক্তি বলেই শুষ্ক শাখার দিকে চোখ পড়ে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র উপন্যাস-সাহিত্যে 'চার অধ্যায়' দুর্বলতম সংযোজন।

॥ ৭ ॥

আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করে এনেছি। কেবল আর একটি কথা বলেই উপসংহার টানব। এ-কথা কখনোই ভোলবার উপায় নেই যে রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি। তাঁর উপন্যাস সাহিত্যেও এই কবিকে বার বার অনুভব করা যায়—'শেষের কবিতা'য় তো তাঁকে পূর্ণ মূর্তিতেই আমরা দেখতে পাই। 'চতুরঙ্গ' আমাদের আলোচনায় আসেনি, কিন্তু সেখানে যে গভীরচারী মনস্তত্ত্ব—যে নিবিড় চৈতন্যপ্রবাহ চরিত্র, ঘটনা ও পরিণামকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, তার সঙ্গে ফরাসী মনোবিশ্লেষণের কোনো মিল নেই, জেম্‌স্ জয়েস কিংবা ভার্জিনিয়া উল্‌ফের সঙ্গে তার পার্থক্য আকাশ-পাতাল। চিত্ততলের মানস-স্রোতের ওপর থেকে থেকে কবি-কল্পনার রশ্মি পড়েছে, পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্যে যা বুদ্বুদিত তামস-প্রবাহ, তার ওপর রবীন্দ্রনাথ কবিত্বের ইন্দ্রধনু ফুটিয়েছেন। পৃথিবীর সাহিত্যে এমন অপরূপ রচনা আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে গুহার অন্ধকারে "আদিম কালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তুটা"র আবির্ভাব শচীশের চিন্তায় যে-ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তা মাত্র রবীন্দ্রনাথের লেখনীতেই সম্ভব। 'ঘরে বাইরে' থেকে একটি উদাহরণ নেওয়া যাক ঃ

"এই পর্যন্ত লেখা হয়ে শুতে যাব যাব করছি এমন সময়ে আমার জানলার সামনের আকাশে শ্রাবণের মেঘ হঠাৎ একটা জায়গায় ছিন্ন হয়ে গেল, আর তারই মধ্যে থেকে একটি বড়ো তারা জ্বল্ জ্বল্ করে উঠলো। আমার মনে হল আমাকে সে বললে, কত সম্বন্ধ ভাঙছে গড়ছে স্বপ্নের মতো, কিন্তু আমি ঠিক আছি ; আমি বাসর-ঘরের চিরপ্রদীপের শিখা, আমি মিলনরাত্রির চিরচুম্বন।

সেই মুহূর্তে আমার সমস্ত বুক ভরে উঠে মনে হল, এই বিশ্ববস্তুর পর্দার আড়ালে আমার অনন্তকালের প্রেয়সী স্থির হয়ে বসে আছে। কত জন্মে কত আয়নায় ক্ষণে ক্ষণে তার ছবি দেখলুম--কত ভাঙা আয়না, বাঁকা আয়না, ধুলোয় অস্পষ্ট আয়না। যখনই বলি, 'আয়নাটা আমারই করে নিই'—'বাক্সর ভিতর ভরে রাখি' তখনই ছবি সরে যায়। থাক্‌-না, আমার আয়নাতেই বা কী, আর ছবিতেই বা কী! প্রেয়সী, তোমার অটুট বিশ্বাস রইল, তোমার হাসি ম্লান হবে না, তুমি আমার জন্যে সীমন্তে যে সিঁদুরের রেখা এঁকেছ প্রতিদিনের অরুণোদয় তাকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে রাখছে।"

এ মনস্তত্ত্ব, কিন্তু তার চাইতেও অনেক বেশি। হৃদয়ের গোপনতল-বাহিনী —অথচ তার সেই চলস্রোতের ওপর সন্ধ্যাতারার আলোটিকে বয়ে এনেছে।

এ বিশ্লেষণের জটিলতায় ক্লান্ত করে না—কবিত্বের সৌন্দর্যে গানের মতো ঝংকৃত হয় 'যোগাযোগ' থেকে আর একটি উদাহরণ ঃ

"বর্ষার রাত্রে খিড়কির বাগানের গাছগুলি অবিশ্রাম ধারাপতনের আঘাতে আপন পল্লবগুলিকে যখন উতরোল করেছে তখন কানাড়ার সুরে মনে পড়েছে তার ওই গান ঃ

বাজে ঝননন মেরে পায়েরিয়া
কৈস করো যাউঁ ঘরোয়ারে।

আপন উদাস মনটার পায়ে পায়ে নূপুর বাজছে ঝননন—উদ্দেশহারা পথে বেরিয়ে পড়েছে, কোনোকালে ফিরবে কেমন করে ঘরে! যাকে রূপে দেখবে এমনি করে কতদিন থেকে তাকে সুরে দেখতে পাচ্ছিল। নিগূঢ় আনন্দ-বেদনার পরিপূর্ণতার দিনে যদি মনের মতো কাউকে দৈবাৎ কাছে পেত তা হলে অন্তরের সমস্ত গুঞ্জরিত গানগুলি তখনই প্রাণ পেত রূপে। কোনো পথিক ওর দ্বারে এসে দাঁড়ালো না। কল্পনার নিভৃত নিকুঞ্জগৃহে ও একেবারেই ছিল একলা। এমন-কি, ওর সমবয়সী সঙ্গিনীও বিশেষ কেউ ছিল না। তাই এতদিন শ্যামসুন্দরের পায়ের কাছে ওর নিরুদ্ধ ভালোবাসা পূজার ফুল-আকারে আপন নিরুদ্দিষ্ট দয়িতের উদ্দেশ খুঁজেছে।...

...অন্তরের এতদিনের এত আয়োজন ব্যর্থ হল—একেবারে ঠন্ করে উঠল পাথরটা, ভরাডুবি হল একমুহূর্তেই। ব্যথিত যৌবন আজ আবার খুঁজতে বেরিয়েছে, কোথায় দেবে তার ফুল! থালিতে যা ছিল তার অর্ঘ্য, সে যে আজ বিষম বোঝা হয়ে উঠল! তাই আজ এমন করে প্রাণপণে গাইছে, 'মেরে গিরিধর গোপাল, ঔর নাহি কোহি।"

আবার বলব, হৃদয়কে এমনভাবে রাঙিয়ে তুলে—অনুভূতির সমুদ্রে এমন করে সূর্যোদয়ের লীলা একমাত্র রবীন্দ্রনাথই প্রত্যক্ষ করাতে পারেন। আর, মাত্র এই একটি কারণেও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস বার বার পরম আনন্দে পড়া চলে।

●

সাহিত্য-বিচারে রবীন্দ্রনাথ

জ্যোতির্ময় ঘোষ

'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের উৎসর্গ-পত্রের প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'রস-সাহিত্যের রহস্য অনেককাল থেকেই আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা ক'রে এসেছি।' অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য কারণেই রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটিকে তাঁর সমস্ত সাহিত্য-সংক্রান্ত আলোচনার চারিত্র্য-পরিচয়রূপে গণনা করা চলে। উদ্ধৃত অংশের 'রসসাহিত্যের রহস্য' এবং 'আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা' এই শব্দগুলি সচেতন পাঠকের দৃষ্টিতে গভীরতর সত্যের আলোকে দীপ্ত হ'য়ে ওঠে।

সাহিত্যের নানা বিচার্য প্রসঙ্গ তাঁর কাছে সাহিত্যের 'তত্ত্ব' মাত্র নয়, তা 'সাহিত্যের রহস্য' এবং কেবল 'সাহিত্য' না ব'লে প্রথমেই 'রসসাহিত্য' বলায় সহজেই এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি-বৈশিষ্ট্য অনুভব করা যায়। তারপর, তিনি সাহিত্য বিশ্লেষণ করছেন না, তিনি তা' 'আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা' কর'তে ব'সেছেন। অর্থাৎ সাহিত্যতত্ত্বের বিশ্লেষণে তাঁর রুচি নেই, 'রস-সাহিত্যের রহস্য আলোচনা'য় তাঁর অভিরুচি।

'সাহিত্য' ব'লতে রবীন্দ্রনাথ বোঝেন 'নৈকট্য' অর্থাৎ সম্মিলন। কার সঙ্গে কার মিলন? এক মানুষের সঙ্গে বহু মানুষের মিলন। কিসের সঙ্গে কিসের মিলন? এক মনের সঙ্গে অন্য সকল মনের মিলন। সাহিত্যের কাজ হ'চ্ছে : 'হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ ঘটানো, যেখানে যোগটাই শেষ লক্ষ্য।' কিন্তু এই যোগ কেমন ক'রে ঘটে?

এ কোনো প্রয়োজনের সূত্রে ঘটে না, বরং প্রয়োজন এসে এই মিলনকে খণ্ডিত, সংকীর্ণ, কাজেই ব্যর্থ করে দেয়। জীবনযাত্রার প্রয়োজন মানুষকে চারিদিক থেকে একান্ত বদ্ধ ক'রে রাখেনি—মানুষের সমস্ত রকম শিল্পসাধনার গভীরে রবীন্দ্রনাথ এই সত্যকেই অনুভব ক'রেছেন। একান্ত আবশ্যিকতা থেকে যেখানে আমরা মুক্ত, সেখানেই আমরা পশুদের সুখের সীমাকে লঙ্ঘন ক'রে মানুষের সীমাহীন বেদনার রাজ্যে উত্তীর্ণ হ'য়েছি।

বেদনা তো হৃদয়বোধ। এই বোধেরই আলোকে আপন অন্তরের ব্যক্তিপুরুষকে নিবিড় ক'রে অনুভব করি—অনুভব করি আমার 'পারসোন্যালিটি'কে। এই উপলব্ধির মধ্যে মৃত্যু বা শূন্যতার ব্যথা নেই, পূর্ণতার স্পর্শে সমস্ত তুচ্ছ এখানে অসামান্যতায় দীপ্যমান।

কবি বলেন, সাহিত্যের কাজ 'হৃদয়ের যোগ ঘটানো'—জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, কেন?

আমাদের সুখদুঃখ, আনন্দবেদনা, বিরহমিলনের সমস্ত অনুভূতি আপন অন্তরে একান্ত আবদ্ধ রাখায় আমাদের মুক্তি নেই, তৃপ্তি নেই। আমার ভাবনা-বেদনার মূলে আছে বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবজগৎ। এককথায়, 'আমি আছি এবং আর সমস্ত আছে··· আমার বাইরে কিছুই যদি অনুভব না করি, তবে নিজেকেও অনুভব করিনে'।

কাজেই, নিজের দায়েই নিজেকে প্রকাশ ক'রতে হয়। কারণ, এই প্রকাশের স্পষ্টতায় আমার আনন্দ, 'অস্পষ্টতাতেই অবসাদ'।

বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির এই মিলন যখন সংঘাতের নামান্তর তখন দুঃখেরও উদ্ভব হ'তে পারে। কিন্তু এই দুঃখকে রবীন্দ্রনাথ আনন্দের বিপরীত মনে করেন না, তার অন্তর্ভূত বিবেচনা করেন। সুখের বিপরীত দুঃখ, একথা স্বীকার্য।

কিন্তু সুখ তো কবির অন্বিষ্ট নয়। 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র 'পাগল' রচনায় তিনি ব'লেছেন, 'সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত'।

এবং তাঁর এই উক্তি থেকে অনায়াসে আমরা সাহিত্যে 'বাস্তব' ব'লতে কবি কী বোঝেন এবং কেন তা' বোঝেন—এই সংশয়জড়িত প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে পারি।

তাঁর কোন একটি বিশেষ উক্তি উদ্ধার ক'রে একথা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই যে, তাঁর মতে, সমস্ত শিল্প-সাহিত্যেরই শেষ কথা হ'লো আনন্দ ; কেননা, এই কথাটি তিনি নানা-প্রসঙ্গে বারবার ক্লান্তিহীনভাবে উচ্চারণ করেছেন।

এই আনন্দ কী করে পাই ?

সত্যের বোধই দেয় আনন্দ।

সত্য কী ?

মানুষ আপন মনের নিবিড় অনুভূতি দিয়ে যাকে অব্যবহিতভাবে স্বীকার ক'রে নেয়, তা-ই সত্য তথা বাস্তব। বিষয়ের বাস্তবতা-উপলব্ধির কথা ব'লতে গিয়ে পুনরপি কবি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, 'যা-তা'-ই' বাস্তব নয়, নিজের বাছাই-করা জিনিষই হচ্ছে বাস্তব—এই নির্বাচন জেনেই করি, অথবা অজ্ঞাতসারে।

সাহিত্যে বাস্তবের সংজ্ঞা নির্ণয় ক'রতে গিয়ে কবি ব'লেছেন—সাহিত্যের মধ্যে যে 'বস্তু'র অনুসন্ধান আমরা করতে পারি, তার নাম 'রসবস্তু'।

এবং এ-জিনিষ কেবল রসিকের বোধগম্য। রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে, কবির কাছে তা'ই চূড়ান্ত সত্য। আর তথাকথিত বস্তুর মূল্যমান আপেক্ষিকতার দ্বারা লাঞ্ছিত, তা' নিত্য-পরিবর্তমান।

বাস্তব সম্পর্কে বিতর্ক উঠলে রবীন্দ্রনাথের শেষ উত্তর এই যে, তা নির্ভর ক'রবে কবির আত্মানুভূতির উপর। বিশ্ববস্তু এবং বিশ্বরসকে একেবারে অব্যবহিতভাবে কবি

যদি নিজে উপলব্ধি ক'রে থাকেন এবং সেই উপলব্ধির অনুবাদ যদি সম্ভব হ'য়ে থাকে তাঁর কাব্যে, তবে সেই তাঁর শক্তির প্রকাশ—অন্য প্রমাণ অনাবশ্যক।

বাস্তব সম্পর্কে কবির এই ধারণা আমরা স্বীকার করি বা না করি, তাঁর পক্ষে বাস্তবের ব্যাখ্যা এইরকম হওয়াই অনিবার্য ছিল। 'প্রতিদিনের সামগ্রী'র মধ্যে আছে তুচ্ছতা, তা' আমাদের সুখ দিলেও আনন্দ দিতে পারে না—এই আনন্দ 'প্রত্যহের অতীত' কোনো ভিন্নতর লোকে আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে—প্রতিদিনের সামগ্রীকে উত্তীর্ণ হ'য়েই সেই রসলোকের পথে কবির চিত্ত অভিসার করে।

'সাহিত্য আমাদের আনন্দ দেয় কেন'—এই প্রশ্নের উত্তরে কবি অনেকবার ব'লেছেন, সাহিত্য সুন্দরের সাধনা করে, অতএব সৌন্দর্যের প্রকাশই আনন্দময় হ'য়ে দেখা দেয়। কিন্তু 'সৌন্দর্যরচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ' কবির এই পূর্বকৃত সিদ্ধান্ত সাহিত্য ও আর্টের পরিণত অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত হ'লো না—কেননা, ভাঁড়ু দত্তেরা সুন্দর না হ'য়েও আনন্দজনক হয়, আপন আনন্দ-বোধের এই সাক্ষ্যকে তিনি অস্বীকার ক'রতে পারেন নি। কাজেই, 'সুন্দর আনন্দ দেয়, তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার' একথা না-ব'লে কবি এখন বলেন,—'যা' আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী'।

সুন্দরের প্রমাণ কী ?

নিবিড় বোধের দ্বারাই সুন্দরের প্রমাণ হয়। অর্থাৎ, এখানেও অনুভূতি-বোধের কষ্টিপাথরেই কবি-প্রত্যয় নিশ্চিত।

সাহিত্যের বাইরে এই সুন্দরের ক্ষেত্র সংকীর্ণ। কেননা, সেখানে তথ্যের অধিকার অবারিত। এবং তথ্যের মধ্যে র'য়েছে খণ্ডতা। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিকে শ্রদ্ধেয় মনে করেন না, কেননা, 'সাহিত্যে সমগ্রকে সমগ্র দৃষ্টি দিয়েই দেখ্‌তে হবে'। সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান-অংশগুলির বিশ্লেষণ অর্থহীন, কারণ শারীর বিশ্লেষণের দ্বারা প্রাণের মন্ত্র কেউ কোনোদিন জেনেছে ব'লে শোনা যায়নি।

বিদ্যাপতির একটি পদাংশ কবি একাধিকবার উল্লেখ ক'রেছেন এবং 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধেও এই উদ্ধৃতির সাহায্যে তিনি তাঁর বহু-আলোচিত সীমা-অসীমের তত্ত্বটি আরো একবার প্রকাশ করেছেন। তাঁর উদ্ধৃত অংশটি হ'লো এই—

যব গোধূলিসময় বেলি
ধনি মন্দিরবাহির ভেলি
নব জলধরে বিজুরিরেহা দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।

এই পংক্তিগুলির মধ্যে যে-তথ্যের আভাস আছে, তা বাস্তবিকই এর কাব্যত্বের সঙ্গে

তুলনীয় নয়, কেননা, গোধূলিবেলায় পূজা শেষ ক'রে একটি মেয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে ঘরে ফিরছে, তথ্য হিসেবে এটি অপূর্ব (যে-অর্থে কবি ওরিজিন্যালিটি বা মৌলিকত্ব শব্দটি অন্যত্র ব্যবহার ক'রেছেন) নয়; কেবল তা'ই কেন, এ অত্যন্ত অসম্পূর্ণ একটি তথ্য। কিন্তু তথ্যের এই অসম্পূর্ণতা আদৌ আমাদের পীড়িত করে না কারণ, কাব্যের সত্য এখানে আমাদের অঞ্জলি পূর্ণ ক'রে সুধা দান ক'রছে।

এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ কীট্‌সের 'ওড্ টু এ গ্রীসিয়ান্ আর্ন' কবিতারও উল্লেখ ক'রেছেন। কবির বক্তব্য, আমাদের অন্তরের মধ্যে যে-ঐক্যের আদর্শ আছে, (যার সাহায্যে আমরা আপাত-বিচ্ছিন্ন তথ্য সমূহের মধ্যে পূর্ণতার সৌন্দর্য অনুভব ক'রতে পারি) বাইরের বস্তুতে যখন আমরা সেই ঐক্যেরই দ্যোতনা লক্ষ্য করি, তখন অবাধ তৃপ্তিতে আমরা পূর্ণ হ'য়ে উঠি। সকল দ্বিধা ও সংশয়, বুদ্ধি এবং বিশ্লেষণ সহসা নিরস্ত হয়, বোধের গভীরে যখন এই ভিতর ও বাহিরের ঐক্যের মধ্যে রসের সেতুবন্ধন ঘটে।

রবীন্দ্রনাথের বাস্তব-বোধের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গেছে, তিনি ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যজ্ঞানকে সাহিত্যের বিষয় হিসেবে স্বীকার করেন না— কবির আত্মানুভূতির মাধ্যমে পরিস্রুত হ'য়ে যে-অভিজ্ঞতা নিছক তথ্যের সীমা অতিক্রম ক'রে সত্যের অসীমে পৌঁছোয়, তাঁর মতে, সাহিত্যের রসলোকে তারই প্রবেশাধিকার আছে। অতএব, সাহিত্যে যে-সত্য আমাদের লভ্য তা 'রূপের ট্রুথ, তথ্যের নয়'। কেননা, তাঁর মতে 'শেষ কথা হ'চ্ছে ঃ Truth is beauty'।

কীট্‌সের কাব্য নিয়ে যাঁরা আলোচনা ক'রেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কীট্‌সের এই উক্তিটিকে ততটা তাৎপর্য-মণ্ডিত ব'লে মনে করেন না, যতটা আজ উদ্ধৃতিরূপে বহুল ব্যবহারের দ্বারা সর্বজনস্বীকৃতির গৌরবে ধন্য। কিন্তু কীট্‌সের এই উক্তিটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অত্যাসক্তি মাঝে মাঝে আমাদের কিছু পরিমাণে বিস্মিত ক'রলেও, এ-বাণী রবীন্দ্রনাথের এত প্রিয় কেন, তা' ভেবে দেখা যেতে পারে। আমাদের মনে হয়, আজন্ম উপনিষদ-পরিশীলিত কবি-চিত্তের পক্ষে এই বাণীটির প্রতি এ-হেন প্রীতি খুবই স্বাভাবিক ছিল, কেননা, যাজ্ঞবল্ক্য-কথিত একটি শ্লোকের সঙ্গে কীট্‌সের ঐ উক্তির একটা আশ্চর্য গভীর, যদিও পরোক্ষ, সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়—'যে কোনো জিনিষ আমার প্রিয়—তার মধ্যে আমি আপনাকেই সত্য ক'রে পাই ব'লেই তা প্রিয়, তা'ই সুন্দর'।

সাহিত্যে মানুষ আর একভাবেও নিজের মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে। মুক্তি—সীমাবদ্ধতা থেকে। মুক্তি—প্রতিদিনের তুচ্ছতা থেকে। সাহিত্য তার কাছে একটি নূতন বিশ্ব। এখানে মানুষ স্রষ্টার ভূমিকায় অভিনয় করে। এমনকি, 'ভূমিকা' ও 'অভিনয়' শব্দ দু'টিও ব্যবহার করা সঙ্গত হ'লো না; হয়তো সাহিত্যের জগতেই তার মাথার উপরের সেই অনন্ত আকাশটাকে সে অনুভব করে—যার অকারণ প্রাচুর্য তাকে প্রাত্যহিকতার বাধাবন্ধন থেকে উত্তীর্ণ হ'য়ে অন্য কোনো স্বপ্নের সুষমায় আকীর্ণ হ'তে বলে।

সৃষ্টিকর্তা আপন সৃষ্টিতে নিজেকে আস্বাদন করেন নিত্য এবং তা'ই তিনি লীলাময়। মানুষও তেমনি লীলাময়—কেননা, সাহিত্যে আর্টে প্রতিদিনই সে নিজের বহু বিচিত্র লীলাকাহিনী লিপিবদ্ধ ক'রে চলেছে।

এরপর আসে কাব্যরূপায়নের কথা। তার শিল্পকলার কথা। কবি বলেন, 'যা প্রমাণ-যোগ্য তাকে প্রমাণ করা সহজ, যা আনন্দময় তাকে প্রকাশ করা সহজ নয়'। কথার শিল্প তাই ছন্দ-সঙ্গীত-বাণীভঙ্গি এবং সব মিলিয়ে—নির্বাচন। এই 'কারুকাজ' অত্যন্ত দুরূহ। অনেক শিল্পকলা শিল্পিতকে অতিক্রম করে স্ব-প্রধান হ'য়ে ওঠে। ফলে, কখনও কাব্য 'পৌরুষের' অভাবে অশ্রদ্ধেয় হ'য়ে ওঠে, কখনও অগভীর। জয়দেব ও সত্যেন্দ্রনাথ তার দৃষ্টান্ত। 'কেকাধ্বনি' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ জয়দেবীয় বাণীচাতুর্যের পাশে কালিদাসের শ্লোক উদ্ধার ক'রে দেখিয়েছেন, নিছক রূপচর্চা কাব্যের সমাধি রচনা করে।

সার্থক সাহিত্যে শিল্পের সঙ্গে শিল্পকলার এই বিরোধ কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সম্ভব হ'তেই পারে না। যদিও রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, 'রসসাহিত্যে বিষয়টা উপাদান, তার রূপটাই চরম', তখন তাঁকে প্রায় 'রূপবাদী' বলতে ইচ্ছা করে। কীট্‌সের শরৎ-সম্পর্কিত কবিতায় বিষয়ের এমনই কী অ-পূর্বতা লক্ষ্য করা যায়, 'তার সমস্তটাতেই রূপের জাদু'—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকেও তাঁকে কাব্য-বিচারে রূপতাত্ত্বিক ব'লতে প্রলুব্ধ হই, অথচ 'ভাবের প্রগাঢ়তা'কেও যখন তিনি রূপসৃষ্টির অঙ্গ ব'লে মনে করছেন, তখন বোধহয় ধ'রে নেওয়া যেতে পারে—কাব্যের ভাব ও রূপকে তিনি ঠিক স্বতন্ত্র বিবেচনার বিষয় ব'লে মনে করেন না—আসলে, এই দুয়ের যথার্থ সমবায়েই সার্থক কাব্যের জন্ম সম্ভব।

সাহিত্যের দ্বারা কোনো সামাজিক হিতসাধন হয় কি না, এ-প্রশ্ন কবি কতকটা অনীহার সঙ্গেই আলোচনা ক'রেছেন। যিনি বিশ্বাস করেন, প্রয়োজনসাধনে নয়, পরন্তু

অপ্রয়োজনের আয়োজনার্থেই সাহিত্যসাধনা, তাঁর পক্ষে সাহিত্যের সাহায্যে সামাজিক হিতসাধনের তত্ত্ব মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কবি তা' মানেনও নি। কেবল এই কথা ব'লেছেন, সাহিত্যের লক্ষণ প্রত্যক্ষত সামাজিক কল্যাণসাধন নয়, তবে তা' যদি সাধিত হয়, সে হ'চ্ছে উপরি-পাওনার মতো। মোটের উপর, সমাজকল্যাণে সাহিত্য পরোক্ষে প্রযুক্ত হ'তেও পারে, কিন্তু তা' গৌণ।

এই সূত্রে আধুনিক সাহিত্যের কথা এসে যায়।

ইবসেন কিংবা শ-এর নাটকগুলির কথা মনে পড়ে। 'মিসেস্ ওয়ারেন্স্ প্রফেসন' কিংবা 'এ ডল্স্ হাউস' নাটকের মাধ্যমে যে সামাজিক সমস্যা বা সত্যগুলির প্রতি নাট্যকারদ্বয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছিলেন, তাঁদের সাহিত্যপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সেই সমস্যাগুলির সমাধান বহু পরিমাণে আজ সম্ভব হ'য়েছে (শ' তো স্পষ্ট ঘোষণায়ও পরাঙ্মুখ নন যেঃ I am not an ordinary playwright in general practice··· my reputation has been gained by my persistent struggle to force the public to reconsider its morals । 'এ ডল্স্ হাউস' বা 'মিসেস্ ওয়ারেন্স্ প্রফেসন' তবে কি সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি নয়? এসব কি কেবল সামাজিক প্রয়োজনের দাবি মিটিয়েই বিনষ্টির সম্মুখীন হবে? একথা সত্য যে, শ-এর নাটকের সেই শাণিত বিদ্যুদ্দ্যুতি আজ আর তেমনি ক'রে আমাদের চোখ ঝলসায় না—তার ধার গেছে অনেকটাই ম'রে, কিন্তু শাশ্বত কালের বা রুচির বিচারে কী থাক্‌বে আর কী থাক্‌বে না—তার মীমাংসা কোনো বর্তমান কালের দ্বারা সম্ভব নয়।

অবশ্য, রবীন্দ্রনাথের আনন্দবাদ বা সৌন্দর্যবোধের মধ্যেও একটি মঙ্গলচেতনা বিজড়িত দেখ্‌তে পাই। কালিদাসের কাব্য সমালোচনা কর'তে গিয়ে কবি সৌন্দর্যবোধকে এই পরিণামী মঙ্গলচেতনার দ্বারা অভিসিঞ্চিত ক'রে নিয়েছেন। কিন্তু এখানেও রবীন্দ্র-মননের বিশিষ্টতা অনুপস্থিত নয়। একটু অভিনিবেশসহকারে লক্ষ্য ক'রলেই দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের এই মঙ্গলচেতনা বা শ্রেয়োবোধ বিশেষ কোনো সামাজিক সমস্যার সমাধানকল্পে উদ্ভাবিত নয়—এ হ'লো সামগ্রিকভাবে বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত ঈশ্বররচিত কল্যাণাদর্শের অভিমুখীন্—আধুনিকদের সমাজ-সচেতনতা ঠিক এই বস্তু নয়।

কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে তাঁর মানস-প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে কবিকে আমরা রোমান্টিক আখ্যায় ভূষিত ক'রতে পারি। তিনি এই বিশ্বব্যাপারের অন্তরালে এক পরম-মঙ্গলময় সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। দৃশ্যমান জগত ও জীবনের সমস্ত আপাত-

বিশৃঙ্খলা, খণ্ডতা, তুচ্ছতার মাঝখানে তিনি বিশ্বপিতার সেই মধুর বংশীধ্বনি শুনতে পান—যার মধ্যে একটি পরম ঐক্যের বাণী নিহিত আছে অচঞ্চল। খণ্ডতা এবং তুচ্ছতা আছে যে, একথা তিনি অস্বীকার করেন না, তবু এ-সব প্রাত্যহিক বিষয় বা অভিজ্ঞতাকে তিনি কাব্যের বিষয়ভুক্ত ক'রতে স্বভাবতই ইতস্তত বোধ করেন।

সাহিত্যের একটি সর্বকালীন ও চিরঞ্জীব রসমূর্তি তাঁর অন্তরে অম্লান হ'য়ে আছে। তিনি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের কয়েকটি চারিত্র্য-লক্ষণের কষ্টিপাথরেই আধুনিক যুগের সাহিত্য-সৃষ্টিকেও যাচাই করে নিতে চেয়েছেন। ফলে, এই নবযুগের সাহিত্য তাঁর দ্বিধাহীন অনুমোদন থেকে বঞ্চিত হ'য়েছে। তিনি আধুনিক সাহিত্যের শক্তিকে, এর প্রকাশ-ভঙ্গির বিশিষ্টতাকে কখনও-বা অভিনন্দিত ক'রেছেন : 'তাঁদের (আধুনিক সাহিত্যিকদের) বলিষ্ঠ কল্পনা ও ভাষা সম্বন্ধে সাহসিক অধ্যবসায় দেখে আমি বিস্মিত হ'য়েছি' এবং 'এই নব অভ্যুদয়ের অভিনন্দন ক'রতে আমি কুণ্ঠিত হইনে'।

কিন্তু সমস্যা এই যে, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সর্বকালীন ও সর্বজনীন একটা আদর্শে বিশ্বাসী। সমসাময়িক কালের দাবিকে সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে মেনে চলা তাঁর মতে কেবল অনাবশ্যক নয়, একটা ভ্রান্তিও বটে।

কিন্তু তাঁর এই সিদ্ধান্ত কি সর্বাংশে যথার্থ?

এ কথা কি আমাদের মনে হয় না যে, সাহিত্যের কাছে সমকালীন যুগেরও একটা দাবী আছে, কেননা, সে-যুগেরও একটি নিজস্ব বাণী আছে? এবং প্রত্যেক যুগই বিবিধ কারণে স্বভাবতই অনন্য, অর্থাৎ একটি যুগ অন্যান্য যুগের তুলনায় অনেক বিষয়েই স্বতন্ত্র?

একটু আগেই আধুনিক সাহিত্যের প্রতি তাঁর যে-অভিনন্দন আমরা লক্ষ্য ক'রেছি, ঐ একই প্রবন্ধে (সাহিত্যে নবত্ব : সাহিত্যের পথে) ক্ষণকাল পরেই ভাষাটাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে, অর্থের বিপর্যয় ঘটিয়ে, ভাবগুলোকে স্থানে অস্থানে ডিগবাজি খেলিয়ে, পাঠকের মনকে পদে-পদে ঠেলা মেরে, চমক লাগিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ, রবীন্দ্রনাথের এই ক্ষুরধার মন্তব্য—আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে তিনি মনস্থির করতে পেরেছিলেন কি-না, সেই সংশয় জাগ্রত করে।

আধুনিক সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গি যে কতকাংশে দুর্বোধ্য ও জটিল, সে কি বর্তমান যুগেরই জটিল জীবনাচরণসঞ্জাত নয়? তা' প্রীতিপ্রদ না'ও যদি হয়, তবু সত্য বলেই কি স্বীকার্য নয়?

তারপর আধুনিক সাহিত্যের বিষয়বস্তু।

এ ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ একদিক থেকে যা স্বীকার ক'রছেন, অন্যদিক থেকে তাকেই প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ কর'তে পারছেন না। আধুনিক যুগের সাহিত্য তার দ্বিধা-যন্ত্রণাজর্জর দিনগুলি রাতগুলির কাব্য না হ'য়েই পারে না। রবীন্দ্রনাথ এই সংশয়বিদ্ধ যন্ত্রণায় যদি বিক্ষত না হ'য়ে থাকেন, তবে সে তাঁর আনন্দমন্ত্রের জোরে, কিন্তু সে-মন্ত্রে আধুনিককাল তো দীক্ষা পায়নি। সাহিত্যে সমস্ত কিছুরই স্থান আছে, একথা তিনি একাধিকবার ব'লেছেন, তবু 'আম' এবং 'মাকালে'র শ্রেণীভেদ সম্পর্কে কবি অতি-সচেতন।

পরিণামে দেখা দিয়েছে দ্বিধা।

আধুনিককালের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে কবি সচেতন বুদ্ধি দিয়ে নবযুগকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন, আবার তাঁর মানস-প্রবণতার গভীরে চিরকালীন কাব্যাদর্শের যে-প্রতিমা দাঁড়িয়েছিল, আধুনিক যুগের সংশয়লাঞ্ছিত জিজ্ঞাসার দ্বারা তাকে পীড়িত দেখে কবি এ-কালের কাব্য সম্পর্কে তাঁর বেদনাক্ষুব্ধ হৃদয়ের অনীহাও গোপন করতে পারেন নি।

০

আমাদের আঙ্গিনায়

গ্রন্থনায় শিবানী চট্টোপাধ্যায়

এবার আমাদের আঙ্গিনায় 'মালা' গাঁথবার জন্য যে সংবাদ চয়ন করা হয়েছে, তার সংখ্যা কম ; কারণ গ্রীষ্মাবকাশে বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘকাল বন্ধ ছিল। এরই অগ্র-পশ্চাৎ স্বল্পসংখ্যক অনুষ্ঠানের বিবরণ দেওয়া গেল ঃ

২২শে এপ্রিল ৫জন সোভিয়েট সাহিত্যিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

* * * *

৩০শে এপ্রিল গ্রামোফোন কোম্পানীর পক্ষ থেকে শ্রী পি. কে. সেন বিনামূল্যে 'হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস্' এবং 'কলম্বিয়া'র সমস্ত রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রেকর্ড ও কবির স্বকণ্ঠের রেকর্ডগুলি 'বিচিত্রা' হলে উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে সমর্পণ করেন।

* * * *

গত ৪ঠা মে নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় 'জাতীয় সংকটে বাংলার নাটক ও নাট্যশালা' সম্পর্কে বক্তৃতা করেন।

* * * *

৮ই মে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। আজ থেকে এক বছর আগে (১৯৬২ সালের ৮ই মে) এমনি দিনে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর আঙ্গিনায় রবীন্দ্র ভারতীর জন্মক্ষণ সূচিত হয়েছিল—প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই নব-বিশ্ববিদ্যালয়। সেদিনের স্মরণে ৮ই মে সন্ধ্যায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পরদিন বরণীয় ২৫শে বৈশাখ। মহাসমারোহে বিশ্বকবির জন্মদিন তাঁর নিজ ভবনে—নিজ নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্‌যাপিত হল। প্রদর্শশালা সকাল ছ'টা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ভোর থেকেই সেদিন অগণিত নরনারী কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে সমবেত হ'ন। এই অভূতপূর্ব জনসমাগম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে এখানে দেখা যায়নি। সকালে বিশ্বভারতী, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্র ভারতী সমিতির মিলিত উদ্যোগে

বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে কবিগুরুর জন্মোৎসব অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়-মঞ্চে ছাত্র-ছাত্রীগণ আবৃত্তি ও নৃত্য-গীতের মাধ্যমে কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানান।

*　　*　　*　　*

১১ই মে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের অধ্যাপক বিখ্যাত ধ্রুপদী তানসেন পাণ্ডের মৃত্যুতে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র, অধ্যাপক ও কর্মীদের সম্মিলিত এই সভায় উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীত বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী স্বর্গীয় অধ্যাপকের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

*　　*　　*　　*

৪ঠা জুন শ্রীকল্যাণী কার্লেকারের নেতৃত্বে প্রায় ১০০ জন শিক্ষয়িত্রীর একটি দল রবীন্দ্র ভারতী প্রদর্শশালা পরিদর্শন করেন।

*　　*　　*　　*

১৯শে জুন সকাল সাতটায় ভূদান-নেতা আচার্য বিনোবা ভাবে কবিগুরুর পৈত্রিক বাসভূমিতে পদার্পণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারদেশে উপাচার্য শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রদর্শশালার অধিকর্তা শ্রীযুক্ত কুলপ্রসাদ সেন তাঁকে স্বাগত জানান। আচার্য ভাবে কবিগুরু যে কক্ষে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সেখানে মাল্য অর্পণ করেন এবং প্রদর্শশালা পরিদর্শন করেন। তিনি শান্তিনিকেতনকে রবীন্দ্রনাথের শান্তির স্থান এবং ঠাকুরবাড়ীকে তাঁর মুক্তির স্থান বলে অভিহিত করেন।

*　　*　　*　　*

২৫শে জুন আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় পঞ্চাশজন প্রতিনিধি এই বিশ্ববিদ্যালয় দর্শনে আসেন। এই উপলক্ষে রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানান্তে একটি প্রীতিভোজে তাঁদের আপ্যায়িত করা হয়। সমগ্র আয়োজনটিই তাঁদের অত্যন্ত খুশী করেছিল।

*　　*　　*　　*

দীর্ঘ অবকাশের পর ১লা জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার সাড়া জেগেছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় যে ত্রৈবার্ষিক স্নাতক পর্যায় পাঠক্রম এবার প্রবর্তিত হ'ল।

১লা জুলাই স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন। এ দিনটি তাঁর মৃত্যুদিনও বটে।

আমরা ভারতবাসীরা মৃত্যুকে স্বীকার করি না। এ দিনটিতে ডাঃ রায়ের ৮২তম জন্ম-দিবস পালন করা হ'ল। ডাঃ রায়ের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঋণ অপরিসীম। তিনি যে বিরাট মহীরুহের স্বপ্ন দেখে গেছেন, তা যেন পত্রে পুষ্পে পল্লবিত হয়ে সার্থক হয়। ১লা জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ঘরোয়া সভায় স্বর্গীয় ডাঃ রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন-প্রসঙ্গে উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এই আশাই প্রকাশ করেন।

ENGLISH SECTION

SONGS OF LĀLAN

ANIL KUMAR ROY CHOWDHURY

Baul songs constitute an important chapter of Bengali mystical literature. The Bauls, who sing these songs, are a sect well-known for their simple faith in God, whom they often call 'the Man of my heart', as well as for their charming songs. Indeed, "they provide a most moving example of the 'simple' (sahaj) man's search for 'the Man of my heart (moner mānush)".[1] The carefree nature of the Baul and his cosmopolitan outlook are revealed in a song sung by a Baul :

"So I rejoice in song and I dance with each and all.
That is why, brother, I became a madcap Baul."[2]

In certain respects there is a close resemblance between the songs of the Bauls of Bengal and those of the saint-poets of mediaeval India like Kabir, Dadu and others. Some of the ideas and expressions common in Baul songs show traces of the influence of Sufi saints and mystics.

The way in which the Bauls influenced Gurudeva Rabindranath Tagore is interesting to note. It has been said : "Whatever one's religious belief, it is difficult to deny the appeal of the poetry of the Bauls, which is simple, sensitive and direct. It is not surprising, therefore, that sophisticated poets like Rabindranath Tagore were vastly influenced by the works of these poets of the lowest strata of Indian society."[3] This is true in respect of the influence of the Bauls on Tagore. But this is not the whole truth. The *poetry* does not seem to be the only thing. There is something more in it—call it emotion, outlook or faith. What the Poet himself has got to say on this point throws more than ordinary light on it. The Poet says : "About this time, one day I chanced to hear a song from a beggar belonging to the Baul sect of Bengal. We have in the modern Indian religion deities of different names, forms and mythology, some Vedic and others aboriginal. They have their special sectarian idioms and associations that give emotional satisfaction to those who are accustomed to their hypnotic influences. Some of them may have their aesthetic value to me and others philosophical significance overcumbered by exuberant distraction of legendary myths. But what struck me in this simple song was a religious expression that was neither grossly concrete, full of crude details, nor metaphysical in its rarefied transcendentalism. At the same time it was alive with an emotional sincerity. It spoke of an intense yearning of the heart for the divine which is in Man and not in the Temple, or scriptures, in images and symbols."[4]

(1) K. M. Sen, *Hinduism*, p. 103.
(2) Ibid, p. 103.
(3) Ibid, pp. 106-107
(4) Rabindranath Tagore, *The Religion of Man* (London. Unwin Books), pp. 68-69.

A study of the Baul influence on Tagore is especially helpful in understanding and enjoying an important section of his (Tagore's) poems "which bear the impress of the theme of reciprocity of love with God............ He (Rabindranath) indicated that the subject matter of these poems is *Jivan Devata* (The Lord of his Life). We may, therefore, call them the *Jivan Devata* group of poems. The theme of these poems, as indicated by him, is that the Infinite has become defined in humanity and come close to him so as to need his love and co-operation to unfold their romance." [5]

Tagore lived many useful years of his glorious life in two important Baul centres of Bengal—Shelidaha (now in Eastern Pakistan) on the Padma where he composed some of his sweetest lyrics and Bolpur in the district of Birbhum in West Bengal where he set up his Visva-Bharati Santiniketan. It was while at the former place that the Poet came across some of the songs of Lalan, Lalan Fakir in popular parlance, and had them carefully copied and preserved. Here is published the English prose translation of just a couple of the songs of Lalan.

(I)

Never have I seen Him.
Just beside my house is the mirror-abode
—Well, there lives a neighbour.
Fathomless water surrounds that abode,
Vast is the expanse, and there's no boat to cross it.
My constant desire is to see Him,
But how am I to reach His place ?
What should I say about that neighbour !
He is sans hands and feet, sans head and shoulders.
Now He flies in the air,
And then He floats on the water.
If my neighbour would touch me,
I would be free from the fear of death.
Again, He and Lalan live together,
Yet they are leagues and leagues apart. [6]

(II)

Without knowing anything,
Why do you look up at the sky above ?
The moon, surrounded by another, abides in the north-east corner of your house.
At first the moon rises in the right ;
When it is new-moon,

(5) Hiranmay Banerjee, *How thou Singest My Master !*' p. 77.
(6) The original Bengali text used for the purpose of translation is that of Lālan- Gītikā (Songs of Lālan) published by the University of Calcutta.

It comes down a little to the left ;
It is so nice to see how,
When it is full-moon,
It goes back to the right.

If you search about your own house,
You will come to know the whereabouts.
There are twenty-four fortnights in the
twelve months,
The One that you are searching for
Will be found out in the course of that.
The moon in the sky and the One that
is within you,
Are but one and the same ;
If you can catch hold of one,
The other is caught.
That is the secret that Lalan
Fakir would impart.[7]

(7) The original Bengali text used for the purpose of translation is that of Lālan-Gītikā (Songs of Lālan) published by the University of Calcutta.

RABINDRANATH TAGORE

(A HOMAGE)

BHUPENDRA NATH SARKAR

Tagore is a veritable wonder of the world of culture. He has a mind with many windows to let in many winds. Tagore is India and India is Tagore ; besides, he is of the world—a cosmopolitan.

It is quite in the fitness of things that Rabindra Bharati University has started functioning in his ancestral home at Calcutta to serve as an adjunct to his dear Visva-Bharati at Santiniketan.

This is an attempt to view him from a few familiar standpoints, and that within a short compass.

Tagore never sought for God in heaven, he sought Him not in the dim light of the temple and in the solitude of a cave, but in the open and dusty road of human ordeal where the tiller is tilling the ground and the stone-breaker is breaking stones. He not only soars high above with his wings of poesy like the fabled Bird of Paradise, but also he condescends to come down on Earth and feels for the average man and human children, in particular.

It has been a unique achievement for a poet to build for the child an edifice which will stand for all time to come, as an enduring monument to his genius. In his *asrama*, God, man and nature combined to help the growth of the child . Transmission of life unto life was his motto. To quote his words,—"Teachers who are notoriously successful in guiding their pupils through examinations know that teaching can be made simple by cramming and hushing the questioning mind to sleep. It hastens success through a ruthless retrenchment of education".

We recognise our true teacher when he comes not to lull us to a minimum vitality of spirit but to rouse us to the heroic fact that man's path of fulfilment is difficult—"durgam pathastat".

That he himself was a great teacher is revealed by the following incident. The Poet was once giving a series of talks on Bengali Prosody. In one of them he referred to the power of the word and by way of illustration read out extracts from his writings, one of which describes a storm. As he was reading, his pupils felt as if a storm in all its fury was raging over them, so vivid and stirring was the description, and so articulate and impressive the reading ! This was followed by another extract describing the calm after the storm ; and this calm, too, was the immediate experience of his class. We need hardly say that all these were possible only for a master of the spoken word that Tagore was.

As in the days of our ancient hermitage, on the bed-rock of which Tagore founded his Asrama School, his personality—a magnetic personality, I should say—counted much with his pupils. Maria Montessori says that the child is a "spiritual embryo", able to evolve by itself, when given a suitable environment. This environment Tagore, a rebel with a universal cause, created at Santiniketan.

Tagore's poetry is transcendental. Apart from its beauty and grandeur, it has a universal appeal in that it breathes the message of the Upanishads and that of Gautam Buddha. Charlie Andrews aptly says, "Times of vision such as one feels after a recital of Tagore's hauntingly beautiful poems are the great supreme moments of our mortal state, when the Eternal breaks through the time process and reveals to us in a flash the real truth that lies beyond our outward ken."

Again, Romain Rolland sings in the same strain :

"You remember his ethereal poems woven of lights and shadows in which there burst forth the lightning flashes of the Vedas from behind the veils of Eternal Soul, the mysterious traveller in his transitory flight from world to world in pursuit of the Divine Lover."

We make no apology in quoting from 'Dedicated'—a poem by Nishikanta, an ex-inmate of Santiniketan :

> This morning bathed in Saraswati's ethereal stream
> 'Uttarayan' shines, the sun-mansion of Bengal's Muse,
> Rabindranath, the poet-king bestowed on me his look of dawn
> And said, 'By what mantric power of the New
> Thy life's lyre sings the hymn of transformation ?
>
> I replied : 'If in the wayward swaying of earth's children
> Thou hast seen Bholanath dancing on the world-stage,
> My life's drama, too, has found
> Parvati at play in this girl.'
>
> The poet smiled : 'O Moon-poet,
> Is she then thy princess-moon
> Companion of thy fantasy grand-child enamoured of the New ?

How exquisitely put here are the parts played by Bholanath and Parvati in the world-drama by the two poets : Lord of the Sun and Lord of Night !

We pay our homage to the Lord of the Sun.

TAGORE AND GANDHI : A STUDY

DIPAK KUMAR BARUA

Rabindranath Tagore and Mahatma Gandhi are the two luminous stars that shine brightly in the politico-cultural firmament of modern India—India which has risen from the mediaeval slumber of moral degradation, cultural bankruptcy and political subjugation. Indeed the whole history of modern India follows the noble and unique careers of these two great sons of this land. It may be that there lie some differences and outward distinctions between them, yet a close study will unveil a deep similarity that lies hidden. Really the differences exist in their external activities, while a stream of likeliness flows silently between the two. In their thoughts, ideas, actions and instructions they heralded a new epoch—the epoch which brought in the Indian renaissance.

Before embarking on a study of Tagore and Gandhi, it is wise to draw up a comparison between the two. The distinctive marks that separate these two great souls may be enumerated thus : Tagore, the aristocratic artist, turned democrat with proletarian sympathies, represented essentially the cultural tradition of India, the tradition of accepting life in the fullness thereof and going through it with song and dance. Gandhi, more a man of the people, almost the embodiment of the Indian peasant, represented other ancient tradition of India, that of renunciation and asceticism. And yet Tagore was primarily the man of thought, Gandhi of concentrated and ceaseless activity"[1]. Such a comparison, although not complete, may be taken roughly as the criterion of their differences. Tagore was essentially a poet and singer, while Gandhi was a man of action and the two appeared on the Indian scene as a thunderbolt shaking all and like a flash of lightning which illumined the minds of millions. Tagore took poetry and music as the essence of life and found out a harmony in man's life and nature. Gandhi, on the other hand, was a man of action and felt an intimacy with the lowliest of low in the country.

But the greatest dissimilarity lies in their political outlook. Tagore did never accept the non-coperation movement which was launched by Mahatma Gandhi. He refused to associate himself with such a movement which was negative in character. "Instead of boycott of foreign goods, he could appreciate the emphasis on the promotion of indigenous industries ; in the place of the boycott of schools and colleges, he could welcome greater assimilation of Indian culture".[2] Tagore, thus, could not support the Carkha-cult. He, like other intellectuals, could trace little connection between the Carkha and Swaraj. Tagore and Gandhi differ from each other on some political questions. Unlike Gandhi, Tagore had voiced his protest against absolute obedience

1. Nehru, Jawaharlal. The Discovery of India, p. 405
2. Sen, Sachin. The political thought of Tagore. pp. 24-25.

to a particular political ideal and thus detected the force of compulsion in the non-co-operation movement. The great poet was shocked by the blind attitude of the people who had sacrificed all their judgements. He became much anxious as the freedom of the soul was neglected for the cause of political emancipation. This state of affairs, according to him, stood directly on the way of a national emergence. That is why Mahatma's promise of political liberation within a year could not appeal to the poet who became more helpless as he found that the people were blindly led by such a promise.[1] Tagore raised his voice against such a degradation of the national character and dignity under the bewitching influence of Mahatma's leadership. Reason, broadmindedness, and truth were the main elements in Tagore's towering personality. When the Poet saw that these were dishonoured, downtrodden, his mind could not but protest against all such meanness and orthodoxy in the name of political liberation.

Unlike Tagore, Mahatma thought that our own sins have more force to ruin the structure of creation then any other physical phenomenon. In outward appearance, too, Tagore differed greatly from Gandhi. Tagore with his stalwart appearance and dress looked all his life a "royal" poet, while Gandhi with his emaciated figure and austere livelihood represented the life of a "half-naked Fakir" as he was styled by Churchill. Gandhi was out and out a politician with all his practical wisdom and shrewdness, while Tagore being far from a politician was a man who took the help of song and poetry to protest against foreign oppression. Although Tagore supported some political grievances of the Indians, yet he did never take active steps to achieve them. He had little sympathy for political "hatred" and "negation" and thought that the "craze of blind obedience to the leader" was detrimental to the manifestation of human qualities. So he could see that "the burning of cloth heaped up before the very eyes of our motherland shivering and ashamed at her nakedness".

The reasons behind such differences in temperament and outlook can be traced back to their heredity and upbringing. Tagore hailing from a family of writers, artists, social reformers and saint-like personalities, fashioned his life and activities on the teachings of the Upanisads and immortal creations of the literary genius of ancient India without any regular schooling. Gandhi, on the other hand, being modelled after the Western education in a systematic manner and influenced by the simple life of his mother followed a spartan simplicity of life having given up flesh and wine with the practical sense and shrewd understanding of man.[2]

Indeed the controversy between Tagore and Gandhi is of great interest. "For on the one side", in the words of Romain Rolland, "we have the spirit of religious faith and charity seeking to found a new humanity. On the other, we have intelligence, free-born, serene and broad, seeking to unite aspirations of all humanity in sympathy and understanding.

In spite of all the dissimilarities and differences stated above, in certain ideas and outward activities both these great minds were keenly alike. An undercurrent of

1. Tagore, Rabindranath. Satyer Ahavan (The call of Truth), read at the Calcutta University Institute on the 29th Aug., 1921.
2. Gandhi Marg, Vol. V, No. II, April, 1961, p. 168.

unity of thought and outlook flows in both of them. Sri Nehru illustrates two basic factors of similarity in them : "Both in their different ways, had a world outlook, and both mere at the same time wholly Indian. They seemed to represent different but harmonious aspects of India and to complement one another".[1] Besides, both of them were great humanists and often were moved for oppressed mankind anywhere and everywhere. The essence of their teachings was fearlessness and truth and action related to these, always keeping the all-round prosperity of the countrymen in view.

Both Tagore and Gandhi thought that the wealthy must hold their wealth in trust for their fellow-brothers. Gandhi declared, "We are thieves in a way if we take anything that we do not need for immediate use, and keep it from somebody else who needs it".[2] Gandhiji also agreed with Tagore on the point that the State was an organisation based on force, and that to be best governed was to be least governed by the State. Both of them became much afraid of the increasing power of the State, as it may do the greatest injury to mankind by suppressing individuality which is at the root of all prosperity. Thus Tagore's anti-state outlook and the ideal of political independence (Svaraj) were essentially the same as those of Gandhi.[3]

Truly Indian in life and outlook, the fruits of their activities were extended throughout the world, never confined to their home-country alone. Tagore with his frequent travels, international outlook and contacts became almost "an unofficial ambassador of India" and served as the bridge between the East and the West. Gandhi, on the other hand, set free his ideals of Satyagraha, nationalism, truth and non-violence from all narrowness and made these applicable to all countries and peoples. His international attitude was revealed in a letter to Tagore : "I do not want my house to be walled in all sides, and my windows to be stuffed.........I want the culture of all the lands to be blown about my house as freely as possible. But I refuse to be blown off my feet by any."

Besides these, both were rebels in their own way—fearless, attached to truth and fully conscious of the modern world. Being liberated from the clutches of tradition, superstition and ritualism, they looked for a spiritual basis of their activities and laying a great stress on India's hoary heavy mental and spiritual treasures.[4] They were great spiritualists, no doubt. Hence they tried to attract the minds of the people towards spiritualism[5]. Gandhi like Tagore believed in "the inexorableness of the universal law in the working of which God Himself never interferes".

After giving an account of their similarities and dissimilarities it is interesting to note how one thought of the other. It is amusing that both were close to each other and one had the greatest affection and admiration for the other. Mahatma Gandhi in his numerous speeches and writings expressed his deep regard for Rabindranath Tagore, the nationalist poet. He wrote : "In common with thousands of his

1. Nehru, Jawaharlal. The Discovery of India, p. 405.
2. Speeches and writings of Mahatma Gandhi, published by G. A. Nateson & Co., Madras.
3. Sen, Sachin. The political thought of Tagore, p. 30.
4. Sahitya Akademi. Rabindranath Tagore : a centenary volume, p. xiv.
5. Visvabharati Patrika, 18th year, No. 1, 1368 B. S. pp. 6-24.

countrymen I owe much to one who by his poetic genius and singular purity of life has raised India in the estimation of the world. But I owe also more.........I regard the poet (Rabindranath) as a sentinel warning us against the approach of enemies called Bigotry, Lethargy, Intolerance, Ignorance and other members of that brood." Thus with all such laudatory as well as sincere remarks Gandhi was really an admirer, follower and patron of this great poet. In moments of great strain he always sought peace in Tagore. In a letter to Tagore he wrote : "This is early morning 3'O clock of Tuesday. I enter the fiery gate at noon. If you can bless the effort[1], I want it. You have been to me a true friend, because you have been a candid friend often speaking your thoughts aloud......... I will yet prize your criticism if your heart condemns my action. I am not too proud to make an open confession of my blunder, whatever the cost of the confession, if I find myself in error. If your heart approves of my action I want your blessing. It will sustain me". This open statement shows that Gandhi himself was aware of the differences. Yet in spite of such dissimilarities of thought and action Gandhi throughout his career had great admiration and respect for Rabindranath. "Gandhi's attitude to Tagore", writes Romain Rolland, "is one of loving regard, and it does not change even when the two disagree". Gandhi addressed the poet as the Gurudeva—the Great Teacher. Mahatma thought that "the bard of Santiniketan" was Gurudeva for him as he was for the inmates of that great institution. He was, however, conscious about the dissimilarities that separate them : .... "But Gurudeva and I early discovered certain differences of outlook between us. Our mutual affection has, however, never suffered by reason of our differences and it cannot suffer by Gurudeva's utterance on my linking Bihar calamity with the sin of Untouchability."

Rabindranath also, on the other hand, had a very high opinion of Mahatma Gandhi. His occasional meetings will show how the poet was moved by the noble deeds and exemplary career of Mahatma. In spite of his criticism of Gandhi's political activities Tagore offered a wonderful tribute to Gandhi : "Then at the crucial moment, Mahatma Gandhi came and stood at the door of India's destitute millions, clad as one of themselves, speaking to them in their own language. It was a real happening, not a tale on a printed page. That is why he has been so aptly named Mahatma, Great soul. Who else has so unreservedly accepted the vast masses of the Indian people as his own flesh and blood ? At the touch of truth the pent-up forces of the spirit are set free".[2] Tagore was greatly enchanted by the moral ascendancy that was reached by Gandhi. He wrote : "Through the grace of Mahatma Gandhi we have discovered the infinite prowess of Truth". It is equally interesting to quote a few lines from a verse composed by Tagore in praise of Gandhi in 1940 :

> "We who follow Gandhi Maharaj's lead
> Have one thing in common among us ;
> We never fill our purses with spoils from the poor,
> Nor bend our knees to the rich.

1. The effort is the "fast unto death" on 20th September, 1932, soon after his return from the Round Table Conference in London.
2. Tagore, Rabindranath. The call of Truth.

* * *

And when these crowd the path of the prison gate
Their strains of insult are washed clean,
Their age-long shackles drop to the dust,
And on their forehead are stamped Gandhiji's blessings."

This is not merely a laudatory statement, but an outburst of deep love and veneration of Tagore towards Mahatma. The poet was fully satisfied when he found that Gandhi, too, like him was striving hard for truth. That is why his adoration was directed to Gandhi : "Our reverence goes out to the Mahatma whose striving has ever been for Truth ; who to the great good fortune of our country at this time of its entry into the new Age, has never, for the sake of immediate results, advised or condoned any departure from the standard of universal morality. He has shown the way how, without wholesale massacre, freedom may be won......... The Mahatma who has realised this in his own life, compels our belief in this Truth."[1] Tagore indeed is much charmed by the non-violent policy and sublime penance embraced by Gandhi for realising the truth. He was aware of a great awakening in India "under the inspiration of Mahatma Gandhi's singular purity of will and conduct". Rabindranath further related : "Gandhi as he is as a politician, as an organiser, as a reformer, he is greater than all these as a man, because none of these aspects and activities limits his humanity. This man seems greater than his virtues, great as they are". Tagore really could trust Gandhi for some ideals. He thought that Mahatma could achieve freedom for India by a non-violent, peaceful means and that terrorism, bloody activities as well as bullets were not the weapons for real emancipation—the all-round emancipation. "Tagore always looked upon Gandhi as a saint".[2] He often spoke of him with a deep feeling of respect. The poet further was overpowered by the noble deeds of Gandhi and thus wrote : "...... Mahatma is the one person who has done most to raise the people up from slough of despondency and self-abasement servitude. His message of hope and faith has changed the entire outlook of the people, as if overnight. He has inspired courage and self-respect into the hearts of those who for centuries had patiently borne the load of indignity upon their heads and believed it to be eternal, and we cannot but offer our homage of admiration to one who has worked this miracle".[3]

In the foregoing discussion we have endeavoured to trace the points of similarity and difference between these two great souls of India. It may be that they differed widely on certain points. Their actions might be totally opposite sometimes. But an acute analysis really illumines often an unnoticed point of similarity that existed between them. Both of them with a creative outlook came forward to serve the mother-country with all their efforts. The remnants of such an exertion can be traced now in the Sabarmati Asram and Visva-Bharati—which still speak of the unique constructive activities of these two great men. Rabindranath, the poet laureate, dealt rather with ideals ; while Gandhi, the father of the nation, roamed in the

1. Visva-Bharati Quarterly, November, 1937, Tagore's speech.
2. Rolland, Romain. Mahatma Gandhi, pp. 96-97.
3. Dasgupta, S. B. Tolstoy, Gandhi, Rabindranath p. 172.

mundane earth with practical aims. They both represented ideals which supplement one another.[1] Both as men of religion always thought about the spiritual elevation of the innumerable Indians. It is indeed a blessing that these great souls represent the constructive power of the Indian people in the moral and cultural domains. C. F. Andrews also wrote : "These two outstanding personalities—Tagore and Gandhi—are the living examples in our own generation whereby the West may test its capacity to understand the East."[2]

1. Rolland, Romain, Mahatma Gandhi, pp. 90-95.
2. Andrews, C. F. ed. Mahatma Gandhi at work.

LET OUR MUSEUMS GO TO CLASS ROOMS

SAMAR BHOWMIK

Let our museums go to class rooms.

But, can a museum really do so ? From my personal experience I say—yes ! 75 p.c. museums in the U. K. go to schools and colleges and a lot of teaching load of educational institutions is borne by the museums in the United States. In India this movement started very feebly which ceased to react due to strange reasons and conditions. We should now try to revive this movement. But —why ?

A museum is an educational institution which teaches through visual aids. It is not unusual for teachers to hold classes in museums for specific lectures on subjects correlated with the curriculum, and for creating a satisfactory atmosphere for the students. From my experience I can venture to deal with the idea of the museum's service to the educational institutions—the loan collections which could be circulated without any change or with a minimum possible change. Teachers of this country are not aware of this type of collections as museum authorities here often fail to realise the diverse aims and purposes of the museum. Loan collections can be utilised regularly by the average teachers for school teaching. For this purpose they have no parallel. No other institution excepting museums can illustrate vividly and practically the life and customs of people in our country and in foreign lands.

Miniature Dioramas

Nearly every country in the world and many cultures can be represented in portable boxes which include : miniature dioramas—small scale, three dimensional representations of historical events, Indian culture, both modern and historic—commercial processes, animal habitats, places of interest abroad, etc. ; boxes of materials —house-hold utensils, clothing, dolls in native dress, pictures, art works, etc. ; models—these cover many subjects such as buildings, transportations, pre-historic life, spinning wheels, etc. ; mounted pictures —these may be hand painting, photographs, or magazine illustrations covering a multitude of subjects, product maps, specimens and other types of visual aids.

The above list of items, showing the extreme diversity of subject matter should be sufficient to suggest the many and varied uses of these loan materials.

The history teachers, in addition to the teachers in social studies, will find useful exhibits such as Kalighat Pat paintings illustrating the social and economic

condition of the Indian people during the British reign, and early Indian cities. Numerous other dioramas and models of historic places and events can be arranged.

For Science Teaching

For the general science teachers, there could be arranged dioramas showing industrial and commercial subjects such as—a blast furnace, a fertiliser, dams, hydro-electric power houses, coach factory, modern town planning, geological, biological and other scientific objects, specimens of insects—(life cycle, beneficial and harmful) and of leaves—(leaf types, leaves harmful to man, etc.) ; mounted specimens of animals and birds as well as miniature dioramas showing animal habitats.

Aid To Art Teaching

The art teacher may find many things in loan collection which may provide good subject matter for sketching. Life forms can be better appreciated after seeing mounted animals in life positions or mounted birds in the attitudes of perching, flying or pecking ; primitive designs, colours and textures of fabrics in the Indian or foreign collections provide inspiration for modern design ; lovely examples of antiques—pewter, metal ware, furniture—will be interesting subjects for still life.

Even the language arts can be served. Inspiration for compositions can be drawn from many items which stimulate creativity in the observer. The mystery of the Indian civilization can be captured from the boxes of materials : from India—saris, jewellery, brass pieces and art works are some of the contents ; from China or Japan beautiful silk robes, scrolls and porcelains.

Recalling the Past

Early utensils of the primitive people, stone, wood and ivory, bead work and similar objects will bring into the class room some of the romance of far-away lands and bygone days. Africa, the Polynesian islands, much of Asia and Europe are represented—developing in the young people an excitement out of discovery which turns into creativeness.

Perhaps these ideas will help us to consider how the museum's loan materials could bring the greatest satisfaction to the teachers and pupils.

Museum Corners

It may be suggested that the class room should have a corner where loan materials may be displayed. Materials in dioramas and cases may be issued for a week so that students may fully use. them as educational materials. By related materials, charts, pictures, and notes the teachers may explain the stories of the exact materials. Then, the specimens, as mentioned previously, may be distributed among the students to evoke inquisitiveness. But this programme should be main-

tained in close collaboration of the teachers and the museum guides. The loan collections can serve the purpose of a visit to the museum.

Undoubtedly, it is always better to bring the class to the museum, but due to travelling inconvenience and restrictions inside the museum, field trips are hard to arrange. Therefore, in between occasional field trips to the museum, loan materials can considerably help the teacher within the school. The teacher is required to use them judiciously and liberally for a direct and lasting impression on his pupils.

BOOK REVIEW

The Diary of A Westward Voyage—An English translation of Rabindranath's *Paschim Yatrir Diary* by Mrs. Indu Dutta. Asia Publishing House. Rs. 10.00

Mrs. Dutta is not new to it. This is her third attempt at putting Rabindranath across to non-Bengali readers. To translate an author into a tongue that differs in almost all respects from the original is a staggering affair. It is all the more so in a case where a Titan like Rabindranath is concerned. Prospero's "bones" suffered a sea-change and turned into corals. That is certainly a welcome transformation. But this is indeed very unwelcome in a translation where such a possibility needs to be studiously avoided. On the other hand a translation must not look such. If it does it fails of its purpose. The translator's position is, consequently, not in the least an enviable one. Rabindranath himself, when he translated his poems or stories, often took liberties which only he could be allowed and which proved their worth by their effectiveness. And one must remember, at the same time, Rabindranath's extraordinary grasp of the English language, whatever Bridges or Yeats might say to the contrary. The poet, while translating, condensed, elaborated, cut short and added whenever he chose. The mature artist's instinct always led him along the right path. He was a fastidious craftsman and there never was any end to his efforts towards improvement and better communication. The process of making went on in him ceaselessly. We may choose samples at random to illustrate the point. The opening of **The Cabuliwallah** in the original and in translation is a case in point. Rabindranath condenses the whole of the big second sentence of the original "পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ..." into "I really believe that in all her life she has not wasted a minute in silence." This is, again, not condensation in the strictest sense of the term but a piece of *re-creation.* This is the method he follows in the main in his "**Song offerings.**"

For any other translator such a method is not permissible. He or she must be pre-eminently faithful. Yet in the case of a book like the **Paschim Yatrir Diary** faithfulness does not take one far enough. Rabindranath calls it a diary, but it is not what we usually mean by it. It is a diary in so far as it is a record of what passed through his mind during the voyage but at the same time it lacks the occasional character a diary has. The book is almost a complete statement of the poet's views on the most serious issues in life and that in a language which surpasses even **Ghare-Baire** in complexity, in sustained knotty imagery, in rhapsodic exaltation shading off into mystic soliloquies. The peak is reached at the close of the entry for Feb. 12, 1925. It begins with

"দিনের আলো যখন নিবে আসছে, সামনের অন্ধকারে যখন সন্ধ্যার তারা…." A translator may be said to have passed the test if he or she succeeds in doing justice to such a passage—so unique in its registration of the inmost feelings of the great poet and so rich in its inclusion of concrete details and elusive nuances. Mrs. Dutt has proved herself equal to the task. She has tried to reproduce even the rhythm of the original : "When daylight begins to wane, and the evening star is visible through the approaching darkness, when the mind discharging the burdens of one's life-journey starts preparing for the few essentials leaving out so much, I have noticed what a lot of anxiety the mind has to go through to sort things out." One can only suggest, diffidently of course, "gathering up" for "preparing for".

With such success to her credit she won't mind if one objects to "nature of the universe" (p. 3) as a rendering of Rabindranath's বিশ্বপ্রকৃতি or to simple "nightmare" as an equivalent of ক্ষোভের দুঃস্বপ্ন। She translates "তার থেকে বোধ হচ্ছে etc" by " From this it can be easily surmised " (p. 3). A simple "It seems" might do. The same thing happens with 'সে তো আমার কবির পরিচয় নয়'। Mrs. Dutta has it thus : "That is not how I can introduce myself as a poet." This is a far cry from Rabindranath's colloquial terseness. May it not do if one translates "This is not how I may be known as a poet" ? By the way "ontologist" for entomologist in para 5 on page 4 is a printer's howler and the publishers ought to have been more careful.

One word more about Mrs. Dutt's rendering of two major poems of Rabindranath that do not form part of the book she undertakes to translate. Her book starts with an equilinear translation of No. 11 in Sesh Lekha and ends with an almost similar translation of শাজাহান from Valākā. No 11 in S'esh Lekha is granite-like in its condensed solemnity and searing in its expression of the intensity of the human situation in the context of death. Such a thing is better left untranslated. Take for example 'আমৃত্যুর' in the 13th line. Mrs. Dutt's "Till the very end" can by no means substitute it, neither in the interplay of the vowels with the long 'আ' at the start nor in its terseness. শাজাহান presents other difficulties. She has not solved them but the poet in Mrs. Dutt comes out in lines that, when not compared with the original, have a beauty of their own, e.g.,

Like the rose-tinted evening that ushers in sleep

Or

With a sway and song, so exquisite and miraculous.

Sitansu Maitra

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ

সম্পাদিত

রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা

পত্রিকা-পর্ষদ

ভবরঞ্জন দে কর্তৃক সাধনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৭৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট : কলিকাতা ১২ হইতে মুদ্রিত ও ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন : কলিকাতা ৭ হইতে প্রকাশিত

প্রচ্ছদ : তরুণ দাশ

রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা

প্রথম বর্ষ ★ চতুর্থ সংখ্যা ⁘ কার্তিক—পৌষ ★ তেরশ' সত্তর

ENGLISH SECTION

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকলা

অজিতকুমার ঘোষ

॥ ১ ॥

সাহিত্যের সমস্ত বিভাগের মধ্যে নাটক বোধ হয় সর্বাপেক্ষা কঠোর কলাবিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নাটক একটি নির্দিষ্ট সময়ে সম্মিলিত দর্শকচিত্তকে ভাবরসে উদ্দীপিত করিবার জন্যই রচিত। সেজন্য ইহার ঘটনা, চরিত্র ও সংলাপসৃষ্টি সংহত ও একটি বিশেষ নাট্য-উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। নাট্যকলা বলিতে নাটকের বৃত্তগঠনরীতি প্রধানত বুঝায়। বিশদভাবে বলিতে গেলে একটি নাট্যঘটনার উপস্থাপনা, বিবর্তন ও পরিণতি, সেই ঘটনার শাখাপ্রশাখা, অঙ্ক ও দৃশ্যের পারস্পরিক যোগ, নাট্যদ্বন্দ্ব ও ঘটনাবেগের বিশেষ রূপ, চরিত্রের আগমন ও নির্গমনরীতি, সংলাপের বিশিষ্ট রীতি সব কিছুই নাট্যকলার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। এই নাট্যকলার রূপ ও রীতি যুগে যুগে পরিবর্তিত হইতে থাকে। মঞ্চপ্রয়োগরীতি, অভিনয়ের সুযোগ-সুবিধা ও সম্ভাবনা, দর্শকদের রুচি ও রসবোধ প্রভৃতি অনেক কিছুর উপর নাট্যকলার পরিবর্তন নির্ভর করে। প্রত্যেক নাট্যকারই তাঁহার নাটকে নিজস্ব নাট্যকলা উদ্ভাবন করিতে পারেন বটে, কিন্তু সাধারণত দেখা যায়, এক একটি বিশেষ যুগে নাট্যকলার এক একটি সাধারণ এবং সর্বজনস্বীকৃত রূপ গড়িয়া উঠে। আবার ইহাও দেখা যায় যে, এক একজন অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী নাট্যকারের প্রবর্তিত নাট্যকলাই তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্তী নাট্যকারদের দ্বারা অনুসৃত হইয়াছে। এমনি ভাবে সফোক্লিস, শেক্‌সপীয়র ও ইবসেনের নাট্যকলা সাধারণভাবে গ্রীক, এলিজাবেথীয় ও আধুনিক যুগের নাট্যকলার আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকলা লইয়া আলোচনা করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাইব যে, তাঁহার নিজস্ব নাট্যচিন্তা, মঞ্চচেতনা, আঙ্গিকপ্রয়োগরীতি সেই নাট্যকলার মধ্যে কিছু কিছু প্রতিফলিত হইলেও মোটামুটি তাহা শেক্‌সপীয়রের নাট্যকলারূপ অনুবর্তন করিয়াছে। 'কীর্তিবিলাস' ও 'ভদ্রার্জুন' রচনার সময় হইতেই বাংলা নাটক শেক্‌সপীরীয় নাট্যরীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। মধুসূদন, দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি সকল প্রসিদ্ধ নাট্যকারই শেক্‌সপীয়রকে প্রধানত আদর্শ করিয়া

নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। পৌরাণিক ও সামাজিক নাটকের মধ্যে শেক্‌সপীয়রের নাটকের বাহ্য রীতি কিছু কিছু অবলম্বিত হইলেও ঐতিহাসিক অথবা কাল্পনিক ইতিবৃত্তমূলক নাটকে শেক্‌সপীরীয় নাটকের বাহ্যরীতি ও অন্তঃপ্রকৃতি সর্বাপেক্ষা সার্থক ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী', জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী' ও 'সরোজিনী', গিরিশচন্দ্রের 'চণ্ড', 'সিরাজদ্দৌলা', ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' ও 'আলমগীর', রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' এবং দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলি শেক্‌সপীয়রের নাটকের সহিত সর্বাপেক্ষা বেশি সাধর্ম্যযুক্ত। দ্বিজেন্দ্রলাল যে সচেতন-ভাবে শেক্‌সপীয়রের নাটকের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার বিভিন্ন উক্তির মধ্য দিয়া আমরা জানিতে পারি। নিজের নাট্যজীবনের কথা আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি শেক্‌সপীয়রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শেক্‌সপীয়রের নাটক তিনি যে কত বেশি পড়িতেন তাহা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, 'বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া ক্রমাগত Wordsworth ও Shakespeare বার বার পড়িতাম এবং শেষোক্ত কবির যে যে অংশ কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ বোধ হইত, মুখস্থ করিতাম।' শেক্‌সপীয়রের নাটকের অভিনয় দেখিয়া তিনি অভিনয়ের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার কথায়, '·········Shakespeare-এর Julius Caesar-এর আংশিক অভিনয় দেখি, সেই সময় হইতেই অভিনয় ব্যাপারটিতে আমার আসক্তি হয়।' ঐতিহাসিক নাটক রচনার সূচনাপর্বে তিনি শেক্‌সপীয়রের অমিত্রাক্ষর ছন্দও গ্রহণ করিতে চাহিলেন,— 'প্রথমে Shakespeare-এর অনুকরণে Blank Verse-এ নাটক লিখিতে আরম্ভ করি।' 'কালিদাস ও ভবভূতি' নামক প্রবন্ধে তিনি শেক্‌সপীয়রকে জগতের আদর্শ কবি (নাট্যকার) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'এই পরিবর্তনশীল অন্তর্জগৎ মন্থন করিয়া তাঁহার অপূর্ব নাটকগুলি রচনা করিয়াছেন বলিয়াই শেক্‌সপীয়র জগতের আদর্শ কবি।' নাটকত্ব নামক প্রবন্ধে তিনি নাটকের গুণগুলি বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রধানত শেক্‌সপীয়রের নাটকের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। শেক্‌সপীয়রের নাটকগুলি সম্মুখে রাখিয়াই তিনি নাটকের মৌলিক গুণগুলি নির্ধারণ করিয়াছেন।

॥ ২ ॥

উইলিয়াম আর্চার তাঁহার 'Play-Making' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, নাটকরচনার গোড়াতেই নাট্যকারকে একটি মূল বর্ণনীয় বস্তু (Theme) নির্বাচন করিতে হইবে। অবশ্য আর্চার বিশদ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শুধু কেবল

একটি ভাব অথবা তত্ত্বই যে নাট্যকার সব সময় তাঁহার নাটকে পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্য লইয়া নাটক রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন তাহা নহে। কোনো একটি সাময়িক ঘটনা, কোনো সামাজিক পরিবেশ, অথবা কোনো বিশেষ চরিত্রকে রূপায়িত করিবার উদ্দেশ্য লইয়াও নাট্যকার নাটক রচনা করিতে পারেন। কিন্তু আর্চার যাহাই বলুন না কেন, নাট্যকারকে নাটক রচনা করিবার পূর্বে নিশ্চয়ই জীবনের কোনো ভাবসত্য অবলম্বন করিতে হইবে। সেই ভাবসত্য চরিত্র, ঘটনা. পরিবেশ যাহাই আশ্রয় করুক না কেন তাহা অনিবার্যভাবে নাট্যকারের মনে অবস্থান করে। এই ভাবসত্য আছে বলিয়াই নাটকের মধ্যে এক চিরন্তন ও বিশ্বজনীন জীবনরূপ ফুটিয়া উঠে। Othello নাটকে প্রেমের করুণ নিষ্ঠা ও নিষ্ঠুর সন্দেহ রূপ পাইয়াছে, Macbeth-এ অদম্য উচ্চাশার শোচনীয় পরিণতি চিত্রিত হইয়াছে। King Lear-এ কৃতঘ্নতার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত পিতৃস্নেহের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, Antony and Cleopatra নাটকে কামনাতাড়িত প্রেমের উচ্চভাবায়িত আত্মোৎসর্গ দেখান হইয়াছে। নাটকের একটি মূল ভাব সম্বন্ধে নাট্যকারের সচেতনতা থাকিলে তিনি সেই ভাবটির উপস্থাপনা, বিকাশ ও পরিণতিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকের এই মূল ভাবের রূপায়ণে যে সচেতন ছিলেন তাহা তাঁহার নাট্য-আলোচনা হইতে বুঝা যায়। নাটকত্ব প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 'নাটকের আকার মোচার মত, একস্থান হইতে বাহির হইয়া পরে বিস্তৃত হইয়া একস্থানেই তাহা শেষ হইতে হইবে। প্রেম নাটকের মুখ্য বিষয় হইলে সেই প্রেমের পরিণামেই নাটক শেষ করিতে হইবে; যেমন রোমিও ও জুলিয়েট। লোভ মুখ্য বিষয় হইলে, সেই লোভের পরিণামেই নাটক শেষ করিতে হইবে, যেমন ম্যাকবেথ।' নাটকের ভাববস্তু (Theme) সম্বন্ধে এত সচেতন ছিলেন বলিয়াই বোধহয় দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার প্রায় সব নাটকের গোড়াতেই একটি ভূমিকা লিখিয়া নাটকের অন্তর্নিহিত ভাব বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'রাণা প্রতাপসিংহ' নাটকে প্রতাপসিংহের চরিত্র অবলম্বনে জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম এবং সেই স্বদেশপ্রেমের অপরিসীম দুঃখ এবং মহৎ আত্মোৎসর্গ নাট্যকার দেখাইতে চাহিয়াছেন। নাটকের আরম্ভ ও পরিণতি একই সূত্রে গাঁথা রহিয়াছে। 'দুর্গাদাস' নাটকে নাট্যকারের বক্তব্য মানুষের সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের রূপটি পরিস্ফুট করা, কিন্তু বহুতর ঘটনা ও চরিত্রের ভিড়ে মূল ভাবটি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। 'নুরজাহান' ও 'সাজাহান' নাটক দুইটি বক্তব্য বস্তুর সার্থক রূপায়ণের দিক দিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ। দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি নারীজীবনকে কিভাবে উচ্চতম শিখরের দিকে টানিয়া অবশেষে নিম্নতম তলদেশে নির্মমভাবে নিক্ষেপ করে, 'নুরজাহান' নাটকে তাহা আমরা দেখিলাম। 'সাজাহান' নাটকে সন্তানের প্রতি পিতার অপরিমেয় স্নেহ এবং নানা বেদনা ও বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া সেই

স্নেহেরই অন্তিম করুণ জয় বর্ণিত হইয়াছে। ‘চন্দ্রগুপ্ত’ নাটকের নামকরণ হইতেই বুঝা যায় যে নাট্যকার চন্দ্রগুপ্তের শৌর্য ও রাজ্যবিস্তারের কাহিনী বর্ণনা করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু নাটকের মধ্যে চাণক্যের দ্বিধাবিভক্ত সত্তার দ্বন্দ্বই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এই নাটকে নাট্যকারের একটি বিশেষ ভাব অনন্যপ্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। ‘মেবারপতন’ নাটকেও ভাবঐক্য ব্যাহত হইয়াছে। নাট্যকার বলিয়াছেন, ‘এই নাটকে ইহাই কীর্তিত হইয়াছে যে, বিশ্বপ্রীতি সর্বাপেক্ষা গরীয়সী।’ কিন্তু নাট্যকারের এই ভাব নাটকের মধ্যে শুধুমাত্র একটি চরিত্রের মধ্য দিয়া আরোপিত হইয়াছে। নাটকের ঘটনাদ্বন্দ্ব, চরিত্র-সংঘাত ও রসসৃষ্টির মধ্যে এই ভাবের কোনো অস্তিত্ব নাই। সুতরাং এই নাটকেও নাট্যকারের বক্তব্যবস্তু নাটকের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই। বরং যাহাকে তিনি নিম্নে রাখিতে চাহিয়াছেন সেই দেশপ্রেমের ভাবই নাটকে মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে।

॥ ৩ ॥

এলিজাবেথীয় রোমান্টিক নাটকের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে আখ্যানবস্তুর ঐক্য থাকিলেও ইহা বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, অথবা ঐক্যমুখীন বৈচিত্র্য—ইহাই রোমান্টিক নাটকের ধর্ম। সেজন্য মূল ভাবের সঙ্গে আনুষঙ্গিক ভাব মিশিয়া থাকে, মূল কাহিনীর ধারার সহিত উপকাহিনীর ধারা মিলিত হয়। শেক্‌সপীয়রের ঘটনাপ্রধান কমেডির তো কথাই নাই, চরিত্রপ্রধান ট্র্যাজেডি, যথা King Lear প্রভৃতি নাটকে মূল কাহিনীর সহিত উপকাহিনী যুক্ত হইয়াছে। কিন্তু একাধিক কাহিনী থাকা সত্ত্বেও মূল কাহিনীর গতি ও প্রাধান্য যদি কোথাও ব্যাহত হয় তাহা হইলে নাটক ঐক্যভ্রষ্ট, উদ্দেশ্যহীন ও আবেগ-উত্তেজনাবিরহিত হইয়া পড়ে। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই বলিয়াছেন, ‘নাটকের গতি নদীর স্রোতের মত,—অন্যান্য উপনদী তাহার উপর আসিয়া পড়িয়া তাহাকে পরিপুষ্ট করিতেছে মাত্র।’ এবার তাঁহার নিজের নাটকে এই নদী ও উপনদীর ধারা কিভাবে মিলিত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করা যাক। ‘প্রতাপসিংহ’ নাটকে প্রতাপসিংহের কাহিনীর সহিত আরও দুইটি কাহিনী যুক্ত হইয়া রহিয়াছে। একটি হইল শক্তসিংহ—দৌলত ও মেহেরের কাহিনী এবং আর একটি হইল পৃথ্বীরাজ ও যোশীর কাহিনী। শক্তসিংহের কাহিনী এই নাটকের মধ্যে অধিকতর গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। শক্তসিংহের জটিল চরিত্র, তাহার শৌর্য, পরাক্রম ও প্রতিশোধ-স্পৃহা, তাহার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও নিষ্ফলতা প্রভৃতি নাট্যঘটনার মধ্যে যতখানি গতি ও আবেগ সঞ্চার করিতে পারিয়াছে প্রতাপসিংহের মহৎ কাহিনী ততখানি পারে নাই। সেজন্য

নাট্যঘটনা-সংস্থাপনায় একটু ত্রুটি এখানে রহিয়া গিয়াছে। ‘দুর্গাদাস’ নাটকেও মূল কাহিনীর প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। দুর্গাদাস অথবা মাড়বারের কাহিনী নাটকের প্রধান কাহিনী। কিন্তু ইহার সহিত মেবার, মারাঠা ও মোগল কাহিনীগুলি যুক্ত হওয়ার ফলে মূল কাহিনীর অব্যাহত গতি নষ্ট হইয়াছে। নাট্যকারের নিজের কথিত সূত্র ধরিয়া ব্যাখ্যা করিতে গেলে এ-নাটকে নদীর স্রোত অপেক্ষা উপনদীর স্রোত প্রবলতর হইয়াছে। ‘মেবারপতন’, ‘নুরজাহান’ ও ‘সাজাহান’ এই তিনটি নাটকের ঘটনা-সংস্থাপনায় নাট্যকারের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ‘মেবারপতনে’ মূল কাহিনীর সহিত গোবিন্দসিংহের পারিবারিক জীবনের ট্র্যাজিক কাহিনী এবং সগরসিংহ-সত্যবতী-মহাবৎখাঁর কাহিনী অতি সুন্দর ভাবে সংযুক্ত হইয়াছে। মূল কাহিনীর মধ্যে যে স্বদেশপ্রেমের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে তাহাই গোবিন্দসিংহের পরিবারের মধ্যে, পিতা ও পুত্রকন্যার মধ্যে শোচনীয় বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছে, ঐ স্বদেশপ্রেমের ধারার সহিত সত্যবতীর জ্বলন্ত ভাবোদ্দীপনা মিলিত হইয়াছে এবং উহাই আবার সগরসিংহের চরিত্রের পরিবর্তন এবং মহাবৎখাঁর সহিত তাঁহার বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং নাটকের মূল কাহিনীর অন্তর্নিহিত ভাব উপকাহিনী দুইটির মধ্যেও সঞ্চারিত হইয়া জটিলতা ও সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছে। নুরজাহানের মধ্যে শেক্‌সপীয়রের Macbeth নাটকের ন্যায় সর্বাপেক্ষা ঋজু, সংহত, দৃঢ়সংবদ্ধ ও দ্রুতগতিশীল কাহিনী সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে নুরজাহানের চরিত্রই তাহার অনন্য জ্যোতির প্রভায় ভাস্বর হইয়া উঠিয়া পার্শ্ববর্তী আর সব ঘটনা ও চরিত্রকে নিষ্প্রভ করিয়া ফেলিয়াছে। নুরজাহানের কাহিনী হইতে একটু স্বতন্ত্র হইয়া অপর কোনো ঘটনাই নাটকের মধ্যে নিজস্ব ক্ষেত্র রচনা করিতে সমর্থ হয় নাই। তবে নাট্যকারের কাহিনীরচনার নৈপুণ্য সর্বাপেক্ষা সার্থক হইয়া উঠিয়াছে ‘সাজাহান’ নাটকে। ‘সাজাহানে’ উপকাহিনীর বৈচিত্র্য খুব বেশি, অথচ নাট্যকার অতি সুকৌশলে উপকাহিনীগুলি মূল কাহিনীর সহিত অনিবার্য ভাবে যুক্ত করিয়া দিয়া একটি অখণ্ড কাহিনী-ঐক্য গড়িয়া তুলিয়াছেন। নাটকের মূল কাহিনীর সহিত দারা, সুজা, যশোবন্তসিংহ প্রভৃতির উপকাহিনীগুলি অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হইয়াছে এবং মূল কাহিনীর বিষাদময়তার সহিত উপকাহিনীগুলির বিষাদময়তার চমৎকার Parallelism অর্থাৎ সমানধর্মিতার সৃষ্টি হইয়াছে। সাজাহানের অন্তহীন বেদনা ও হাহাকারের সহিত দারা, সুজা, মোরাদ, সোলেমান, মহম্মদ প্রভৃতি চরিত্রের করুণ ভাগ্যবিপর্যয় একসঙ্গে মিলিত হইয়া এক সুগভীর ও সর্বব্যাপী ট্র্যাজিক জগৎ সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। ‘চন্দ্রগুপ্তে’র মধ্যে নাট্যকারের বৃত্তগঠনের দুর্বলতা পুনরায় ধরা পড়িয়াছে। ‘চন্দ্রগুপ্ত’ নাটকে মূল কাহিনীর সহিত আরও দুইটি কাহিনী সংলগ্ন

রহিয়াছে যথা, গ্রীক কাহিনী ও মলয়রাজ চন্দ্রকেতু ও তাহার ভগ্নী ছায়ার কাহিনী। চন্দ্রকেতু ও ছায়ার কাহিনী মূল কাহিনীর সহিত যুক্ত হইয়া নাটকের রসবৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে। ছায়ার সুনিবিড় ভালোবাসা এবং তাহার করুণ ব্যর্থতা নাটকের বড় বড় ঘটনার উচ্চ কোলাহলের মধ্যে এক মৃদু অথচ বক্ষবিদারী ক্রন্দনের মতই অবিরাম ধ্বনিত হইতে থাকে। কিন্তু এই নাটকের গ্রীক কাহিনীটি অনিবার্যভাবে মূল কাহিনীর সহিত যুক্ত হইতে পারে নাই, সমান্তরাল ধারায় যেন অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। দুইটি কাহিনীর এই পারস্পরিক সংযোগের অভাব লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবত নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় অভিনয়ের সময় গ্রীক কাহিনীটি বাদ দিতেন। অবশ্য গ্রীক কাহিনীটির স্বতন্ত্র নাট্যমূল্য নিশ্চয়ই রহিয়াছে। এই কাহিনী লইয়া একটি আকর্ষণীয় দ্বন্দ্বজটিল নাটক রচনা করা চলিত। মূল কাহিনীর সহিত এই কাহিনীর রসগত বৈপরীত্য রহিয়াছে। মূল কাহিনীর পরিণতি মিলনে—চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে হেলেনের এবং চাণক্যের সঙ্গে তাঁহার হারানো কন্যার; কিন্তু গ্রীক কাহিনীর পরিণতি সেলুকাসের পরাজয়ে এবং ভাগ্যলাঞ্ছিত এন্টিগোনসের মর্মছেঁড়া সত্যের উপলব্ধিতে। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের ভাব-ঐক্য নষ্ট হইবার আর একটি কারণ নাটকের ঘটনাস্থলগুলির বহু দূরবর্তিতা। গ্রীস, আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষ এই সব স্থলে নাটকের ঘটনা আবর্তিত হইয়াছে এবং তাহার ফলে দর্শকদের মনের মধ্যে ভাবকল্পনার বিক্ষিপ্ততা ঘটে এবং একটি অখণ্ড ভাবানুভূতি দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে না।

॥ ৪ ॥

অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, সম্পূর্ণ (complete) ও সামগ্রিক (whole) ঘটনার অনুকরণই ট্র্যাজেডি। এই সামগ্রিক ঘটনা ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলিয়াছেন, 'Now a whole is that which has beginning, middle and end.' শেক্‌সপীয়রের নাটকেও তিনটি অংশ দেখা যায়। প্রথম অংশ হইল নাট্যসংঘাতের উপস্থাপনা—Exposition। দ্বিতীয় অংশ এই সংঘাতের বিবর্তন। সাধারণত দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কে এই দ্বিতীয় অংশ বিস্তারিত হয়। তৃতীয় অংশ হইল, সংঘাতের পরিণতি—catastrophe. ব্র্যাডলে তাঁহার Shakespearean Tragedy-তে এই বিষয়টি লইয়া আলোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, 'The first of these sets forth or expounds the situation, or state of affairs, out of which the conflict arises, and it may, therefore, be called the Exposition. The second deals

with the definite beginning, the growth and the vicissitudes of the conflict. It forms accordingly the bulk of the play, comprising the second, third and fourth Acts and usually a part of the first and a part of the fifth. The final section of the tragedy shows the issue of the conflict in a catastrophe.' দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকও শেক্‌সপীয়রের নাটকের ধারা অনুসরণ করিয়া প্রধানত তিন অংশে বিভক্ত, ইহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো যাইতে পারে।

Exposition, অর্থাৎ উপস্থাপনা-অংশে চরিত্রগুলির প্রকৃতি ও পরিবেশ, উহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারি এবং উহাদের ভাব ও ক্রিয়া সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠি। সাধারণত প্রথম অঙ্কের মধ্যেই এই উপস্থাপনা সীমাবদ্ধ থাকে। আর্চার বলিয়াছেন, 'The first act may be regarded as the porch or vestibule through which we pass into the main fabric—solemn or joyous, fantastic or austere—of the actual drama'. শেক্‌সপীয়রের কমেডিগুলি সাধারণত সহজ কথোপকথনে আরম্ভ হয় এবং তারপর ধীরে ধীরে নাট্যসঙ্কট (Crisis) জমিয়া উঠে। কিন্তু শেক্‌সপীয়রের ট্র্যাজেডিগুলির আরম্ভ দ্রুত ও উত্তেজনাজনক ঘটনার মধ্যে। ব্র্যাডলের কথায়, 'from the very beginning of the play, though the conflict has not arisen, things are happening and being done which in some degree arrest, startle and excite, and in a few scenes we have mastered the situation of affairs without perceiving the dramatist's designs upon us.' এই যে সংঘাতের তীব্র ও প্রবল অবস্থা হইতে নাটক আরম্ভ করা, শেক্‌সপীয়রের এই রীতি দ্বিজেন্দ্রলালও অনুসরণ করিয়াছেন। সেজন্য শেক্‌সপীয়রের নাটকের ন্যায় তাঁহার নাটকের প্রথম দৃশ্যেই একটি উত্তেজনাজনক পরিস্থিতির অবতারণা হইয়াছে। 'প্রতাপসিংহ' নাটকের প্রথম দৃশ্যেই কালীমাতার সম্মুখে প্রতাপসিংহ ও রাজপুত সর্দারগণের কঠোর সঙ্কল্পগ্রহণ দেখানো হইয়াছে। নাটকের মধ্যে রাজপুত ও মোগলের যে সংঘাত রূপায়িত হইয়াছে নাট্যকার সেই সংঘাতের কারণ এবং পূর্ববর্তী অবস্থার কোনো উল্লেখ না করিয়া একেবারে সংঘাতের সূচনাতেই নাটক আরম্ভ করিয়াছেন। 'দুর্গাদাস' নাটকের আরম্ভ হইয়াছে আরও উত্তেজনাজনক পরিস্থিতিতে, ঔরংজীবের সহিত দুর্গাদাস ও সমরদাসের প্রত্যক্ষ সংঘাতেই নাটকের প্রথম দৃশ্য তীব্র নাটকীয় উত্তেজনাপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। 'মেবারপতন' নাটকের প্রথম দৃশ্যেই মোগল সৈন্যের

মেবার আক্রমণের কথা উল্লেখ করিয়া এবং বৃদ্ধ গোবিন্দসিংহের বীর্যদীপ্ত স্বদেশপ্রাণতার উদ্বোধন করিয়া নাট্যকার নাট্যঘটনাকে উত্তেজনাজনক করিয়া তুলিয়াছেন। 'সাজাহান' নাটকেরও আরম্ভ হইয়াছে সংঘাতজনিত তীব্র উৎকণ্ঠার মধ্যে। সুজা, মোরাদ ও ঔরংজীব একই সঙ্গে রাজধানীর দিকে তিনটি অশুভ বাহুবিস্তার করিয়াছে, পুত্রস্নেহাতুর সাজাহান বাধ্য হইয়া বিদ্রোহদমন করিবার জন্য দারাকে নিয়োগ করিলেন। ভ্রাতৃবিরোধ এবং পিতৃদ্রোহের নিষ্ঠুর ও পীড়াদায়ক রূপ এই প্রথম দৃশ্যেই পরিস্ফুট হইয়াছে। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের আরম্ভ হইয়াছে সেলুকস ও এন্টিগোনসের সংঘাতে; তবে মূল সংঘাত, অর্থাৎ চাণক্য ও নন্দের বিরোধ প্রথম দৃশ্যে দেখানো হয় নাই। অন্যান্য নাটকগুলিতে প্রধান চরিত্রকে প্রথম দৃশ্যেই আনা হইয়াছে। 'নুরজাহান' নাটকের প্রথম দৃশ্যের আরম্ভ হইয়াছে বঙ্গদেশের সৌন্দর্যবর্ণনায় ও শান্তমধুর রসে। কিন্তু আসফের আগমনের পরেই পরিস্থিতির মধ্যে উদ্বেগ ও উত্তেজনা জমিয়া উঠিল। সেলিম ভারতের সম্রাট হইয়াছেন শুনিয়া নুরজাহানের মানসিক উত্তেজনা শুরু হইল এবং সম্রাট শের খাঁকে আগ্রায় ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন শুনিয়া সেই উত্তেজনা একটা আকস্মিক বিস্ফোরণের আকারে ফাটিয়া পড়িল।

শেক্সপীয়রের নাটকের প্রথম দৃশ্য সাধারণত সংক্ষিপ্ত কিন্তু তীব্র নাটকীয়তাপূর্ণ। তাঁহার বড় ট্র্যাজেডিগুলির প্রথম দৃশ্য লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, কোনো কোনো নাটকের প্রথম দৃশ্যে নায়কের আবির্ভাব হয় নাই কিন্তু অপেক্ষাকৃত অপ্রধান চরিত্রের উত্তেজিত কথাবার্তার মধ্য দিয়া নায়ক সম্বন্ধে দর্শকদের আগ্রহ গড়িয়া ওঠে। Julius Caesar, Macbeth, Hamlet ও Othello নাটকগুলিকে এই শ্রেণীভুক্ত করা চলে। শেক্সপীয়রের দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্র্যাজেডির মধ্যে প্রথম দৃশ্যে স্বয়ং নায়কের আবির্ভাব ঘটে। এই শ্রেণীর ট্র্যাজেডির মধ্যে আমরা King Lear নাটকটির নাম উল্লেখ করিতে পারি। King Lear নাটকের প্রথম দৃশ্যে কেণ্ট, গ্লস্টার ও এডমণ্ডের কথোপকথন খুবই সাধারণ ও অনুত্তেজিত ভাবে চলিয়াছে। রাজা লীয়রের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই নাটকের ঘটনা আবেগ ও উত্তেজনাপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু Macbeth-এর প্রথম দৃশ্যের বোধহয় তুলনা নাই। মাত্র এগার লাইনের এই দৃশ্যটির মধ্যে নাটকের ভবিষ্যৎ ঘটনা আভাসিত হইয়া উঠে এবং এই নাটকের আত্যন্তিক দুর্যোগপূর্ণ ও বিপর্যয়জনক পরিবেশের জন্য দর্শকচিত্ত এই প্রথম দৃশ্য হইতেই উৎকণ্ঠিত আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিতে থাকে। দ্বিজেন্দ্রলাল কিন্তু অপ্রধান চরিত্রের কথোপকথনে নাটক আরম্ভ করেন নাই। তিনি প্রধান চরিত্র হইতে উৎসারিত নাট্যসংঘাত লইয়াই নাটক শুরু করিয়াছেন। সেজন্য দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের

অভিনয় দেখিতে দর্শক যদি একটু বিলম্বে আসেন তাহা হইলে তিনি অনেক কিছু হইতে বঞ্চিত হইবেন। 'প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস', 'নুরজাহান' ও 'সাজাহান' নাটকের প্রথম দৃশ্যে প্রধান চরিত্রগুলি তাহাদের ভাব, প্রবৃত্তি ও বিশিষ্ট ক্রিয়াশীলতা লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'প্রতাপসিংহ' নাটকের প্রধান দুইটি চরিত্র প্রতাপসিংহ ও শক্তসিংহকে আমরা এই প্রথম দৃশ্যেই দেখিয়াছি। প্রতাপসিংহের সুগভীর স্বদেশপ্রেম ও শক্তসিংহের অভিমানী সংশয়বাদী মনোভাব এখানে আমরা দেখিয়াছি। উভয় ভ্রাতার এই বৈশিষ্ট্যগুলি নাটকের ঘটনার মধ্যে রূপায়িত হইয়াছে। 'দুর্গাদাস' নাটকের প্রধান দুইটি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্রকে আমরা এই প্রথম দৃশ্যেই দেখিয়াছি। অবশ্য দুর্গাদাসের প্রতি পক্ষপাতিত্বের ফলে নাট্যকার ঔরংজীব চরিত্রকে একটু অনুচিতভাবে দুর্বল ও অক্ষম দেখাইয়াছেন। দুর্গাদাসের প্রভুভক্তি, চাতুর্য, নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণগুলির পরিস্ফুরণ এই গোড়াতেই আমরা দেখিলাম। 'নুরজাহান' নাটকের প্রারম্ভিক দৃশ্যে নুরজাহান চরিত্রের উপস্থাপনা অতি সুন্দর ভাবে হইয়াছে। শের খাঁর ভালোবাসার মধ্যে কো:না খাদ নাই। তাই তিনি তাঁহার সরল প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'কি সুখী আমরা মেহের।' কিন্তু এই উচ্ছ্বাসে নুরজাহান সাড়া দিলেন না। তাঁহার অন্তরের মধ্যেই কোথায় একটা বাধা, একটা ভিন্নমুখী প্রবাহ ছিল, সেজন্য তিনি বলিলেন, 'কিন্তু এত সুখ বুঝি সৈবে না।' কিন্তু তাঁহার অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত দ্বিধা ও সংশয় একটি স্পষ্ট অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপ নিল সেলিমের সিংহাসনপ্রাপ্তির সংবাদে—'সেলিম সম্রাট। আবার সেকথা কেন মনে আসে?—না, সে চিন্তাকে আমি মনে আসতে দিব না—না না না।' কিন্তু এই প্রচ্ছন্ন অন্তর্দ্বন্দ্ব একটি প্রকাশ্য উত্তেজিত প্রতিবাদে পরিণত হইল শের খাঁর আগ্রা যাইবার সম্ভাবনার কথা শুনিয়া। ডাইনীদের ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া ম্যাকবেথের উচ্চাশাবদ্ধ অপরাধী অন্তর কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। নুরজাহানের সেলিমের প্রতি দুর্বল মনও আগ্রায় যাওয়ার সম্ভাবনায় আশঙ্কায় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। নুরজাহানের নিজের মনের উপর তাঁহার কোনো আস্থা ছিল না, আগ্রায় সেলিমের সান্নিধ্যে তাঁহাদের দাম্পত্যজীবনের উপর আঘাত আসিতে পারে, এই কথা মনে মনে চিন্তা করিয়াই নুরজাহান অতখানি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। নাটকের মধ্যে স্বামীর প্রতি সচেতন মনের শ্রদ্ধা এবং জাহাঙ্গীরের প্রতি অবচেতন মনের দুর্দমনীয় কামনার যে তীব্র অন্তঃসংঘাত নুরজাহান চরিত্রের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহার আভাস এই প্রথম দৃশ্যেই আমরা দেখিতে পাইলাম। 'সাজাহান' নাটকের প্রথম দৃশ্যে সাজাহান, দারা, জাহানারা ও নাদিরাকে আনা হইয়াছে। সাজাহানকে এই দৃশ্যে পুত্রস্নেহাতুর পিতারূপেই উপস্থাপিত করা হইয়াছে,

সাজাহানের ট্র্যাজেডি হইল এই পুত্রস্নেহেরই ট্র্যাজেডি। সেই ট্র্যাজেডির সূচনা এই প্রথম দৃশ্যেই দেখিয়াছি। বিদ্রোহী পুত্রদের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য তিনি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে। তিনি বলিয়াছেন, 'কিন্তু এ শাস্তি তাদের একা নয়, এ শাস্তি আমারও।' 'মেবারপতন' ও 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের প্রথম দৃশ্যে নায়কচরিত্র উপস্থাপনা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে। 'মেবারপতন' নাটকের প্রথম দৃশ্যে গোবিন্দসিংহকে আমরা দেখিয়াছি। কেহ কেহ বলিতে পারেন রাণা অমরসিংহই এই নাটকের নায়ক, অথচ প্রথম দৃশ্যে আমরা তাঁহাকে দেখি নাই। অমরসিংহ তাঁহার পদমর্যাদাবলে নাটকের নায়কত্বের উপর দাবী করিতে পারেন বটে, কিন্তু মেবারের কঠোর সংগ্রাম ও সর্বস্বত্যাগের আদর্শ সর্বাপেক্ষা সার্থকভাবে রূপায়িত হইয়াছে গোবিন্দসিংহের মধ্য দিয়া। নাটকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুঃখময় ও প্রাণবন্ত চরিত্র যে গোবিন্দসিংহ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। সেজন্য প্রথম দৃশ্যেই এই চরিত্রটির উপস্থাপনা সম্পূর্ণ সঙ্গত হইয়াছে। কন্যার সহিত গোবিন্দসিংহের বিরোধের ফলে যে পারিবারিক ট্র্যাজেডি ঘটিয়াছে তাহারও পূর্বাভাস এই প্রথম দৃশ্যে দেখিয়াছি। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের প্রধান চরিত্র নিঃসন্দেহে চাণক্য। কিন্তু 'চন্দ্রগুপ্ত' ঐতিহাসিক নাটক এবং ইতিহাসে সর্বপ্রধান চরিত্র অবিসংবাদিতভাবে চন্দ্রগুপ্ত। সেই ঐতিহাসিকতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই নাট্যকার সম্ভবত চন্দ্রগুপ্তের নাম অনুযায়ী নাটকের নামকরণ করিয়াছেন। সেজন্য প্রথম দৃশ্যে চন্দ্রগুপ্তকেই আমরা দেখিয়াছি, এবং চন্দ্রগুপ্তের সহিত নন্দের বিরোধের উল্লেখও এই দৃশ্যে রহিয়াছে। অবশ্য এই দৃশ্যে সেকেন্দার সাহকে প্রধান চরিত্ররূপে উপস্থাপিত করিবার ফলে দৃশ্যটিকে নাটকেরই কোনো অনিবার্য দৃশ্যরূপে মনে না হইয়া প্রস্তাবনা দৃশ্যরূপেই মনে হয়। নাটকের ঘটনাগতি তীব্রভাবে প্রকাশ পাইয়াছে দ্বিতীয় দৃশ্য হইতে—যে দৃশ্যে চাণক্যের প্রথম আবির্ভাব হইয়াছে।

প্রথম অঙ্কের মধ্যে ফ্রেতাগ কথিত erregende Moment, অর্থাৎ নাট্যসঙ্কটের সূচনা দেখাইতে হইবে। আর্চারের কথায়, 'It means the germination of the crisis, the appearance on the horizon of the cloud no bigger than a man's hand'. 'প্রতাপসিংহ' নাটকের প্রথম অঙ্কে প্রতাপ, শক্ত, পৃথ্বীরাজ, যোশী, ইরা, রেবা, মেহের, দৌলৎ, মানসিংহ ও আকবর প্রভৃতি সকল প্রধান চরিত্রেরই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। নাটকের পরিণাম অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে প্রথম অঙ্কের অষ্টম দৃশ্যে, যেখানে প্রতাপ কর্তৃক মানসিংহ অপমানিত হইয়াছেন। প্রতাপ স্বয়ং বলিয়াছেন, 'বন্ধুগণ! এতদিন সমরের যে উদ্যোগ করেছি, এখন তার পরীক্ষা হবে। আজ স্বহস্তে আমি যে অনল জ্বালিয়েছি বীররক্তে সে অগ্নি নির্বাণ কর্বো।'

'দুর্গাদাস' নাটকের প্রথম অঙ্কে চরিত্রের পরিচিতি ও সংঘাতের পূর্বাভাস নাই, নাটকের মূল সংঘাত এই অঙ্কে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। নাটকের মূল কাহিনী মোগল ও মাড়বারের সংঘাত অবলম্বন করিয়াছে। প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে উভয় পক্ষের প্রবল যুদ্ধই বর্ণিত হইয়াছে। এই যুদ্ধে মোগল পক্ষের পরাজয়ের মধ্যে প্রথম অঙ্কের ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার পরিসমাপ্তি ঘটানো হইয়াছে। 'মেবারপতন' নাটকেও প্রথম অঙ্কে শুধু পরিচিতি নহে, সংঘাতের একটি স্তর উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। গোবিন্দসিংহ, অমরসিংহ, অজয়সিংহ, সত্যবতী, মানসী প্রভৃতি প্রধান চরিত্র এই অঙ্কে তীব্র সংঘাতের মধ্যেই নামিয়া পড়িয়াছেন। মেবার ও মোগলের সংঘাত একটি প্রকাশ্য যুদ্ধের চরম উত্তেজনাজনক শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছিয়াছে এবং অবশেষে সত্যবতী ও চারণদলের সঙ্গীতে সেই সংঘাতের উত্তেজনা সাময়িকভাবে প্রশমিত হইয়াছে।

'নুরজাহান' নাটকের প্রথম অঙ্কে নাট্যঘটনা প্রবল ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া শের খাঁর মৃত্যুতে সাময়িক বিরতি লাভ করিয়াছে। প্রথম অঙ্কের মধ্যে শের খাঁর বীর, উদার, প্রেমিক রূপ ও তাঁহার ট্র্যাজিক পরিণতি নাটকের ঘটনায় অনেকখানি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এই অঙ্কের মধ্যে জাহাঙ্গীরের প্রতি নুরজাহানের গোপন দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও শের খাঁর প্রতি তিনি তাঁহার সচেতন মনের সমস্ত ভক্তি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য রক্ষা করিয়া চলিতে চাহিয়াছেন। প্রথম অঙ্কে নুরজাহানের মেহেরউন্নিসা পর্ব শেষ হইল এবং দ্বিতীয় অঙ্ক হইতে সম্রাজ্ঞী পর্বের নূতন দ্বন্দ্ব ও জটিলতা শুরু হইল।

'সাজাহান' নাটকের প্রথম অঙ্কেও সংঘাতময় ঘটনার একটি স্তর সমাপ্ত হইল। প্রথম অঙ্কে মূল কাহিনী ও উপকাহিনীগুলির প্রায় সব চরিত্রগুলিই তাহাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসহ উপস্থাপিত হইয়াছে। এই অঙ্কে আমরা দেখিলাম, পুত্রস্নেহাতুর সাজাহানকে, পিতৃভক্ত উদারহৃদয় দারাকে, তেজস্বিনী পিতৃপ্রাণা জাহানারাকে, আশঙ্কাকাতরা পতিপরায়ণা নাদিরাকে, যুদ্ধপ্রিয়, পত্নীপ্রেমিক সুজাকে, কৌতুকময়ী প্রেমানুরক্তা পিয়ারাকে ; স্বদেশপ্রাণা বীরাঙ্গনা মহামায়াকে, কূটবুদ্ধি, সাম্রাজ্যলোভী ঔরংজীবকে এবং গূঢ়ার্থগর্ভ হাস্যসৃষ্টিকারী দিলদারকে। প্রথম অঙ্কে সাজাহানের সম্রাটসত্তা ও পিতৃসত্তার সহাবস্থান আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু এই অঙ্কের শেষ দৃশ্যে সাজাহানের বন্দিত্ব এবং তাঁহার সম্রাটসত্তার বিলোপ আমরা দেখিলাম। দ্বিতীয় অঙ্ক হইতে ঘটনার নিয়ন্তা আর সাজাহান নহেন, শক্তিমান নিয়ন্তা হইলেন ঔরংজীব। সুতরাং প্রথম অঙ্কে ঘটনা দ্রুতগতিতে একটি বিশেষ পরিণতিতে পৌঁছিয়াছে এবং দ্বিতীয় অঙ্ক হইতে ঘটনা পুনরায় নূতন জটিলতার পথে অগ্রসর হইয়াছে।

'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের প্রথম অঙ্কে চরিত্রগুলির পরিচিতি এবং সংঘাতের প্রস্তুতিপর্বই

শুধু উল্লিখিত হইয়াছে। মগধরাজ্য-উদ্ধারে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্কল্প, নন্দ কর্তৃক চাণক্য ও মুরার অপমান। চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য, কাত্যায়ন ও চন্দ্রকেতুর সংযোগ। নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া এক মহাসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন—'সে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তুমি, আর তার পুরোহিত এই দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ চাণক্য।' চাণক্যের এই স্বপ্ন ও সঙ্কল্পই নাটকের পরবর্তী অঙ্কগুলির মধ্যে রূপায়িত হইয়াছে।

শেক্‌সপীয়রের নাটকের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কে নাট্যঘটনার মধ্যভাগ, অর্থাৎ সংঘাতের ক্রমোচ্চগতি, Climax অথবা শীর্ষবিন্দু ও গতিবেগ ও উত্তেজনার শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়। শেক্‌সপীয়রের নাটকের প্রথম ও চতুর্থ অঙ্কে সাধারণত ঘটনাগতি কিছুটা শান্ত ও শ্লথ, কিন্তু তৃতীয় অঙ্কে ঘটনাগতি তীব্রতম আবেগে ধাবমান। 'প্রতাপসিংহ' নাটকে মধ্যবর্তী তিনটি অঙ্কে প্রতাপ ও আকবরের সংঘাত, সেলিম ও শক্তসিংহের বিরোধ প্রভৃতি দেখানো হইয়াছে। প্রতাপসিংহের ভাগ্যের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া নাট্যঘটনার বৈচিত্র্য ও কৌতূহলোদ্দীপকতা বজায় রহিয়াছে। 'দুর্গাদাস' নাটকের সংঘাত প্রথম দৃশ্যেই আরম্ভ হইয়াছে, ইহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে রাজপুত ও মোগলের যুদ্ধ এবং উভয় যুদ্ধেই মোগলদের পরাজয় বর্ণিত হইয়াছে। দুর্গাদাসের প্রতি গুলনেয়ারের অনুরাগ এবং শম্ভুজীর ঘটনায় নাটকে নূতন জটিলতার সৃষ্টি। 'মেবারপতন' নাটকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে মেবার ও মোগলের সংঘাতে মেবারের জয়। চতুর্থ অঙ্কে মেবারের পতনের সূচনা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে সগরসিংহের কাহিনী নাটকের মধ্যে বৈচিত্র্য ও ভাবোদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছে। স্বদেশব্রতী বীরশ্রেষ্ঠ গোবিন্দসিংহের পারিবারিক ট্র্যাজেডিও এই তিন অঙ্কে পরিস্ফুট হইয়াছে। 'নুরজাহান' নাটকের ঘটনাগতি শেক্‌সপীয়রের নাটকের অনুরূপ। শেক্‌সপীয়রের ট্র্যাজেডির নায়ক অথবা নায়িকা একটি বিশেষ স্তর পর্যন্ত ক্রমাগত উচ্চে উঠিতে থাকে এবং তারপর তাহার নিম্নমুখী পতন শুরু হয় এবং সেই পতন শেষ হয় একেবারে নিম্নতম সোপানে। 'নুরজাহান' নাটকেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত তাহার উত্থান এবং চতুর্থ অঙ্কে তাহার পতনের সূচনা দেখা গিয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কে নুরজাহানের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিণতি ঘটিল জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তাঁহার বিবাহে। তৃতীয় অঙ্কে সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের সর্বময় কর্তৃত্ববিস্তার। চতুর্থ অঙ্কে বিরোধী শক্তির প্রথম জয় ঘটিল। 'সাজাহানে'র গঠনরীতি অনেকটা King Lear-এর অনুরূপ। প্রথম অঙ্কের পর রাজা লীয়র আর ঘটনাধারার চালক নহেন—গনেরিল, রিগ্যান ও এডমণ্ডই হইলেন ঘটনার গতিবিধানের দিক দিয়া প্রধান চরিত্র। ব্র্যাডলে বলিয়াছেন, 'It is impossible, I think, from the point of view of construction, to

regard the hero as the leading figure.' 'সাজাহান' নাটকেও প্রথম অঙ্কের পর সাজাহান রাজা লীয়রের ন্যায় দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ঘটনাবেগ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় অঙ্ক হইতে ঘটনানিয়ন্তা হইয়াছেন ঔরংজীব। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কে ঔরংজীব তাঁহার প্রতিকূল শক্তিকে পরাজিত করিয়া নিজের সাম্রাজ্য নিষ্কণ্টক করিতে চাহিয়াছেন। চতুর্থ অঙ্কের শেষে তিনি দারার মৃত্যুদণ্ড দিয়া নিজেকে বোধ হয় সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ভাবিয়াছেন। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে উত্তেজনাজনক ঘটনার অবতারণা হইয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কে নন্দের বন্দী হওয়া এবং তৃতীয় অঙ্কে নন্দবংশ ধ্বংস, চাণক্যের প্রতিহিংসা চরিতার্থ। চতুর্থ অঙ্ক হইতে চাণক্যের হৃদয়বত্তার প্রাধান্য এবং তাঁহার বুদ্ধিজীবী সত্তার ধীরে ধীরে অবলোপ।

নাটকের ক্রমোচ্চগতিশীল ঘটনা একটি বিশেষ শীর্ষবিন্দু পর্যন্ত দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। এই শীর্ষবিন্দুকে Climax, Crisis, Critical Point, Turning Point প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়। ফ্রেতাগ নাট্যঘটনাকে পাঁচ অংশে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা, Introduction, Rise, Climax, Fall ও Catastrophe. এই পাঁচ অংশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ব্র্যাডলে শেক্‌সপীয়রের ট্র্যাজেডির নাট্যঘটনা পাঁচ স্তরে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা '(1) a situation not yet of conflict, (2) the rise and development of the conflict, (3) the crisis, (4) the decline (5) the catastrophe.' আধুনিক নাট্যসূত্ররচয়িতারা কিন্তু তৃতীয় অঙ্কে 'ক্লাইম্যাক্সে'র অবস্থান স্বীকার করেন না। 'ক্লাইম্যাক্সে'র পর নাট্যঘটনা পুনরায় নিম্নগামী ধারা অনুসরণ করিয়া বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইলে নাট্যঘটনা দর্শকদের আগ্রহ ও উত্তেজনা ধরিয়া রাখিতে পারে না, ইহাই তাঁহাদের বক্তব্য। লসন (John Howard Lawson) তাঁহার 'Theory and Technique of Play-Writing' নামক গ্রন্থে 'ক্লাইম্যাক্স' ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, 'controlling point in the unification of the dramatic movement'। লসন সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, 'I have assumed that this event is the end of the action, and have given no consideration to the idea of falling action, wherein the cycle of events is concluded through catastrophe or solution.' লসনের মতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়াও বলা যায় যে, শেক্‌সপীরীয় নাটকে falling action-এর অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া উপায় নাই, অধিকাংশ নাটকেই পঞ্চম অঙ্কের বহুপূর্বেই 'ক্লাইম্যাক্স' ঘটিয়া গিয়াছে। নায়ক অথবা নায়িকার ভাগ্য যে-পর্যন্ত উর্ধ্বগামী সে-পর্যন্ত নাটকের গতি ক্রমোচ্চতা লাভ করিয়াছে, কিন্তু যেখান হইতে তাহার ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হইল

সেখানেই 'ক্লাইম্যাক্স'। ভাগ্যবিপর্যয়ের অর্থ হইল তাহার প্রতিরোধী শক্তির ক্রমিক প্রাধান্য। 'ক্লাইম্যাক্স' হইতে 'ক্যাটাসট্রফি' পর্যন্ত এই প্রতিরোধী শক্তির প্রাধান্য-বিস্তারের ঘটনাই নাট্যঘটনাকে কৌতূহল ও উত্তেজনার আবেগে ধরিয়া রাখে। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে বুদ্ধিসর্বস্ব চাণক্যচরিত্রের চরম পরিণতি—প্রথম অঙ্ক হইতে নাটকটি এই পরিণতির দিকেই দ্রুত আগাইয়া আসিতেছিল। প্রতিহিংসা চরিতার্থ হইবার পরেই চাণক্যের প্রখর বুদ্ধিসর্বস্ব সত্তা নিস্তেজ হইয়া আসিল। তৃতীয় অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্য হইল অনিবার্য দৃশ্য (obligatory scene) এবং ঐখানেই নাটকের 'ক্লাইম্যাক্স'। 'সাজাহান' নাটকের নায়ক সাজাহানকে ধরিলে নাটকের প্রথম অঙ্কের শেষে অর্থাৎ সাজাহানের বন্দী হওয়ার দৃশ্যেই নাটকের 'crisis'। আবার অন্যদিক দিয়া ঔরংজীবকে নাটকের প্রধান চরিত্র ধরিয়া নাটকের 'ক্লাইম্যাক্স' সন্ধান করিতে হইবে চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে দারার মৃত্যুতে। তারপর ঔরংজীবের অনুতপ্ত, অন্তর্দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ, অনুকম্পা-উদ্রেককারী চরিত্রই আমরা দেখিয়াছি। 'মেবার-পতন' নাটকে মেবারসত্তার জয় দেখা গিয়াছে তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত। তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে মহাবৎ খাঁর যুদ্ধের সঙ্কল্প গ্রহণের পরেই মেবারপতনের সূচনা। মহাবৎ খাঁকে এই নাটকের মূল বিরোধী শক্তি বলা যাইতে পারে। চতুর্থ অঙ্ক হইতে নাটকের 'falling action' শুরু হইল, কারণ এই অঙ্ক হইতেই মেবারশক্তির পরাজয় এবং বিরোধী শক্তির জয়ের সূচনা। 'নুরজাহান' নাটকের তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত অসামান্যা সুন্দরী এবং অনন্যা শক্তিশালিনী নুরজাহানের গতি ক্রমাগত ঊর্ধ্বদিকে প্রসারিত হইয়াছে, কিন্তু চতুর্থ অঙ্ক হইতে মহাবৎ-কর্ণসিংহ-সাজাহানের সম্মিলিত বিরোধী শক্তির জয় সূচিত হইয়াছে। তবে যথার্থ ভাবে বিচার করিতে গেলে নুরজাহানের 'crisis' ঘটিয়াছে চতুর্থ অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে—যে-দৃশ্যে প্রকাশ্য সংগ্রামক্ষেত্রে নুরজাহানের পরিচয় ঘটিল। তারপর ধীরে ধীরে চরিত্রটি ধাপের পর ধাপ নামিয়া পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে করুণ 'catastrophe'-র মধ্যে শেষ হইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলির মধ্যে 'চন্দ্রগুপ্তে'র পরিসমাপ্তি মধুর ও প্রীতিকর মিলনে। চাণক্যের হারানো কন্যার পুনঃপ্রাপ্তিতে এবং চন্দ্রগুপ্ত ও হেলেনের বিবাহে এই নাটকের শেষ হইয়াছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে সেকেন্দার সাহ যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, 'তুমি হৃতরাজ্য উদ্ধার কর্বে। তুমি দুর্জয় দিগ্বিজয়ী হবে'।—তাহা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছে। 'দুর্গাদাস' নাটকে দুর্গাদাস যদিও পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে অজিতসিংহ কর্তৃক বর্জিত হইয়াছে, তবুও এই বর্জনজনিত কোনো দুঃখ দুর্গাদাস চরিত্রে দেখা যায় নাই, এবং অন্তিম দৃশ্যে তাঁহার পরিপূর্ণ মহত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,

সুতরাং এই নাটকের পরিণতিও দুঃখময় নহে। 'প্রতাপসিংহ' নাটকের শেষ দৃশ্যে প্রতাপসিংহের মৃত্যু দেখানো হইয়াছে বটে, কিন্তু এই মৃত্যু নাটকের ঘটনাধারার অনিবার্য পরিণাম নহে, সুতরাং এই মৃত্যু কোনো ট্র্যাজিক দুঃখ উদ্রেক করিতে পারে নাই। 'মেবারপতন' নাটকের শেষ দৃশ্যদুইটিতে বিশ্বপ্রীতি ও উদার মনুষ্যত্বের জয়গান করা হইয়াছে। অমরসিংহ ও মহাবৎ খাঁর মধ্যে অসঙ্গত ও অনৈতিহাসিক মিলন সাধন করিয়া 'গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ'—এই সঙ্গীত শোনানো হইয়াছে। কিন্তু এই পরিণতি ও ভাবমাদকতা নাট্যঘটনার প্রথম ও মধ্যবর্তী অংশের অনিবার্য পরিণতি নহে। এ-নাটকের সত্যকার পরিণতি মেবারের শোকাবহ পতনে, হিন্দুমুসলমানের সস্তা মিলনে নহে। প্রথম দৃশ্যে যে সংঘাতের আভাস দেখিয়াছিলাম, তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিল পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে। মেবারের পরাজয় ঘটিয়াছে, কিন্তু মেবারের শেষ বীর বৃদ্ধ সেনাপতি গোবিন্দসিংহ রহিয়াছেন মেবাররক্ষায় শেষ অস্ত্র উত্তোলন করিবার জন্য। মৃত্যুর সম্মুখে মুখোমুখি দাঁড়াইয়া তিনি গর্জন করিয়াছেন, 'মেবারের শেষ বীর আমি। আমি একা দাঁড়িয়েছি, আজ উদয়পুরে মোগলবাহিনীর গতিরোধ কর্তে। আমায় বধ না ক'রে উদয়পুর দুর্গে প্রবেশ কর্তে পারবে না। অস্ত্র নাও।' মেবারের প্রতিরোধ আরম্ভ হইয়াছিল নাটকের প্রথম দৃশ্যে, যেখানে প্রতাপসিংহ তাঁহার কম্পমান অথচ কঠোর মুষ্টিতে তরবারি ধারণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'প্রিয় সঙ্গী আমার! দেখো! তুমি আমার হাতে থাকতে মহারাণা প্রতাপসিংহের অপমান না হয়।' পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে সেই প্রিয় সঙ্গীটির সহিত গোবিন্দসিংহের বিচ্ছেদ ঘটিল মৃত্যুতে। তখন মেবারের পতন সম্পূর্ণ হইল। নাটকের প্রকৃত সমাপ্তি ঘটিয়াছে এই দৃশ্যে। শেষ দৃশ্যে গভীর তত্ত্ব আছে, উদার নীতি আছে, কিন্তু কোনো নাটক নাই।

'সাজাহান' নাটকের শেষ দৃশ্যে আমরা প্রথম দৃশ্যের সাজাহান চরিত্রেরই স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত পরিণতি দেখি। প্রথম দৃশ্যে সাজাহানের মুখে আমরা শুনি, 'আমার হৃদয় এক শাসন জানে। সে শুধু স্নেহের শাসন। বেচারী মাতৃহারা পুত্র-কন্যারা আমার! তাদের শাসন করবো কোন্ প্রাণে জাহানারা!' সেই সাজাহানই আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও শেষ দৃশ্যে বলিয়াছেন, 'কথা কস নে জাহানারা! পুত্র আমার পা জড়িয়ে আমার ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছে। আমি কি তা না দিয়ে থাকতে পারি? হা রে বাপের মন! এতদিন ধ'রে তোর হৃদয়ের নিভৃতে বসে এইটুকুর জন্য আরাধনা কর্চ্ছিলি! এক মুহূর্তে এই ক্রোধ গ'লে জল হ'য়ে গেল।' 'সাজাহান' নাটকের শেষ দৃশ্যে সাজাহান ঔরংজীবকে ক্ষমা করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই ক্ষমা

এবং সাজাহান ও ঔরংজীবের অন্তিম মিলন নাটকের সীমাহীন শোকাবহতা লঘু করিতে পারে নাই। দারা, সুজা, মোরাদ—সাজাহানের প্রিয়তম পুত্রগণ তাঁহারই সম্মুখে একের পর এক মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। সাজাহানের বক্ষপঞ্জরের একটির পর একটি অস্থি খসিয়া গিয়াছে, দীর্ঘ কারাবাসের দুঃখ তাঁহার বক্ষবায়ু নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে। ঔরংজীবকে ক্ষমা করিয়া যখন তিনি আলিঙ্গন করিলেন, তখন তাঁহার অস্থিহীন, শূন্য বক্ষদেশ হইতে শুধু কেবল একটি অন্তহীন হাহাকারই উত্থিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

'সাজাহান' নাটকে অবিচ্ছিন্ন বিষাদের সুর অন্তিম দৃশ্যের মিলনে একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে সত্য। কিন্তু 'নুরজাহান' নাটকের অপরিসীম দুঃখময়তা শেষ দৃশ্যে অতলস্পর্শী গভীরতা লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ক্ষমতার উত্তুঙ্গ শিখর হইতে মহাশূন্যতার গর্ভে পতন—নুরজাহান চরিত্রের এই নিদারুণ পরিণতি আমাদের অন্তর কঠিন আঘাতে নিস্তব্ধ করিয়া দেয়। অপ্রকৃতিস্থা নুরজাহানচরিত্র মানসিক বিপর্যয়গ্রস্তা লেডি ম্যাকবেথের মতই ট্র্যাজেডির গভীরতম স্তর স্পর্শ করিয়াছে। নাট্যকাহিনীর উপস্থাপনা ও বিবর্তনের মধ্য দিয়া নুরজাহানের এই পরিণতি অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে।

॥ ৫ ॥

নাটকের প্রতিটি দৃশ্য যেন ছোটখাট একটি সম্পূর্ণ নাটক। অর্থাৎ সমগ্র নাটকের মধ্যে যে তিনটি ভাগ রহিয়াছে—সূচনা, বিবর্তন ও সমাপ্তি—সেই ভাগগুলি খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের মধ্যেও দেখা যায়। আকস্মিকতা, নাট্যোৎকণ্ঠা ও পরিস্থিতির পরিবর্তনশীলতার মধ্য দিয়া নাট্যকাহিনীতে যে গতিবেগ সঞ্চারিত হয়, তাহা প্রতিটি দৃশ্যগত ঘটনার মধ্যেও সৃষ্টি করা প্রয়োজন। লসন নাটকীয় গতিবেগ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, 'Dramatic action is activity combining physical movement and speech, it includes the expectation, preparation and accomplishment of a change of equilibrium which is part of a series of such changes'. এই গতি, প্রত্যাশা, প্রস্তুতি ও পরিবর্তনের ফলে নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল সমগ্র নাট্যকাহিনীর মধ্যে ঘনীভূত নাট্যরসসৃষ্টিতে যে কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন তাহার নিদর্শন বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের মধ্যেও যথেষ্ট লক্ষ্য করা যায়। কয়েকটি উদাহরণ দিয়া বিষয়টি বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। 'দুর্গাদাস' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের অষ্টম দৃশ্যের কথাই আলোচনা করা যাক। কারাগারের মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ দুর্গাদাস—ঘটনা শান্ত ও করুণ। সুসজ্জিত গুলনেয়ারের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই দৃশ্যটির মধ্যে গতি ও চাঞ্চল্য আসিল।

গুলনেয়ারের প্রেমনিবেদন ও দুর্গাদাসের প্রত্যাখান—দুই বিরোধী ভাবের সংঘাতে উত্তেজনা বর্ধিত হইল। পরিস্থিতির আবার পরিবর্তন যখন করুণাভিখারিণী গুলনেয়ার সম্রাজ্ঞীর শাসনদণ্ড উদ্যত করিলেন—'বেছে নাও বেগম গুলনেয়ার কিংবা মৃত্যু।' দুর্গাদাস মৃত্যুই বাছিয়া লইলেন। নাট্যোৎকণ্ঠা চরম পর্যায়ে উঠিল। গুলনেয়ার পুত্র কামবক্সকে আদেশ দিলেন দুর্গাদাসকে বধ করিবার জন্য। দুর্গাদাস প্রস্তুত। কামবক্স তরবারি উঠাইলেন, দর্শকদের নিশ্বাস নিরুদ্ধ ও চক্ষু মুদিত হইল। কিন্তু মুহূর্তমধ্যে আবার পরিস্থিতির পরিবর্তন। দিলীর খাঁ হঠাৎ প্রবেশ করিয়া পিস্তল উঁচাইয়া বলিলেন, 'সাবধান, কামবক্স। নহিলে ' দর্শকদের উত্তেজনা কিছুটা স্বস্তিলাভ করিল। আস্তে আস্তে পরবর্তী কথোপকথনে সেই উত্তেজনা নামিয়া আসিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় পৌঁছিল।

'সাজাহান' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যের নাটকীয়তা লইয়া আলোচনা করা যাক। ঔরংজীব সিংহাসনে আরূঢ়, আত্মশক্তিতে তিনি পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। যশোবন্ত সিংহের আস্ফালন তিনি উপেক্ষা করেন। কিন্তু সায়েস্তা খান যশোবন্ত সিংহের 'কে ভারতের সম্রাট'—এই প্রশ্নের উত্তরে যখন বলিলেন 'পাদশাহা গাজী ঔলমগীর', তখনই জাহানারার প্রবেশ। তিনি বলিলেন—'ভারতের সম্রাট ঔরংজীব নয়। ভারতের সম্রাট সাহা সাজাহান।' নাটকীয় দৃশ্য দুই বিরোধী সত্তার বিরোধে উত্তেজনাচঞ্চল হইয়া উঠিল। জাহানারার দীর্ঘ, তেজোগর্ভ উক্তিতে ঔরংজীবের প্রতি অনুগত সভাসদগণই সম্পূর্ণরূপে সাজাহানের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'জয় সম্রাট সাজাহানের জয়।' মনে হইল ঔরংজীবের বুঝি পরাজয় ঘটিল। তখন তিনি তাঁহার সূক্ষ্মতম অস্ত্র—সুনিপুণ ছলনার আশ্রয় নিলেন। সিংহাসন ত্যাগ করিয়া তিনি মক্কায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ছলনামুগ্ধ সভাসদগণ তখন বলিয়া উঠিলেন, 'জয় সম্রাট ঔরংজীবের জয়।' ঔরংজীবের অন্তিম জয় সিদ্ধ হইল। দৃশ্যটির মধ্যে পুনঃপুনঃ পরিস্থিতির পরিবর্তন করিয়া তীব্র নাটকীয়তা সৃষ্টি করিলেন।

আর একটি অতি তীব্র নাটকীয়তাপূর্ণ দৃশ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্য। প্রতিহিংসার বহ্নিমান রূপ চাণক্য এবং তাঁহার সম্মুখে বন্দী রাজা নন্দ। যূপকাষ্ঠ, খড়্গ প্রভৃতি দর্শনে এক ভয়াবহ সম্ভাবনার চিন্তায় দর্শকের চিত্ত শিহরিত। কাত্যায়ন নন্দকে ক্ষমা করিলেন। উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত। কিন্তু চাণক্যের হাত হইতে কাত্যায়নেরও নিস্তার নাই। কাত্যায়ন খড়্গ লইলেন, গলিত লাভার মত চাণক্যের মুখ দিয়া বাক্য নির্গত হইতে লাগিল। কাত্যায়ন খড়্গ উঠাইলেন।

অসহনীয় ভয় ও উৎকণ্ঠার অনুভূতিতে দর্শকচিত্ত নিস্পন্দ। কিন্তু সেই মুহূর্তেই বেগে চন্দ্রকেতুর প্রবেশ। স্বস্তিতে দর্শক আবার নিশ্বাস ফেলিলেন। চাণক্য ও চন্দ্রকেতুর বিরোধী উক্তি-প্রত্যুক্তি। কিন্তু দর্শকের উৎকণ্ঠা আবার বাড়িল মুরার আগমনে। মুরার কাছে চন্দ্রকেতুর আত্মসমর্পণ। অতিশয় পীড়াদায়ক হত্যা ও চাণক্যের বীভৎস আচরণে দর্শকচিত্ত ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত। পুনরায় পরিস্থিতির পরিবর্তন চন্দ্রগুপ্তের আগমনে। অবশেষে চন্দ্রগুপ্তের মাতৃভক্তিতে দৃশ্যের স্নিগ্ধ ও শান্ত পরিণতি।

দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকীয়তার মোহে আকৃষ্ট হইয়া মাঝে মাঝে অত্যধিক দ্রুততা, আতিশয্য ও অবিশ্বাস্য আকস্মিকতা আনিয়া ফেলিয়াছেন। সে জন্য তাঁহার নাটকে স্থানে স্থানে অতিনাটকীয় অংশ আসিয়া পড়িয়াছে। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে এন্টিগোনসের হাতে বন্দী হইয়া সেলুকস আনীত হইয়াছেন। এন্টিগোনস হেলেনের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত ও সেলুকসের দ্বারা অপমানিত। প্রতিশোধ গ্রহণে দৃঢ়সঙ্কল্প থাকাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। অথচ দৃশ্যটির উৎকণ্ঠিতমুহূর্তেই তিনি ফস করিয়া সেলুকসকে ক্ষমা করিয়া মুক্ত করিয়া দিলেন। এন্টিগোনসের এই উদারতা বড় বেশি আকস্মিক ও অতর্কিত। 'মেবার-পতন' নাটকের শেষ দৃশ্যে রাণা অমরসিংহ মরিয়া হইয়া বলিয়া উঠিয়াছেন, 'আজ ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ—যা জগতে কেউ কখন দেখে নি। পৃথিবীতে প্রলয় হোক।' অথচ এই প্রবল প্রস্তুতি মানসীর কথায় নিমেষের মধ্যে জল হইয়া গেল। অমর ও মহাবৎ পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—

রাণা। মহাবৎ!

মহাবৎ। অমর!

রাণা। তোমার কোন দোষ নেই। আমাদেরই দোষ, ক্ষমা কর।

মহাবৎ। ক্ষমা কর ভাই।

এই পরিবর্তন এত দ্রুত ও অতর্কিত যে আমাদের বিশ্বাসপ্রবণতাকে রূঢ় ভাবে আঘাত করে। ইহাই অতি-নাটকীয়।

অনেক সময় দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে নেপথ্যবর্তী কোনো চরিত্র হঠাৎ মঞ্চে আসিয়া মঞ্চের কোনো চরিত্রের কথার উত্তরে স্পর্ধিত মন্তব্য করে। ইহাতে চমক লাগে বটে। কিন্তু ইহাও সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করে। 'মেবার-পতন' নাটকের প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে রাণা সন্ধির উদ্দেশ্য লইয়া বলিতেছেন, 'মোগলদূত! তোমাদের সেনাপতিকে বল যে, আমরা সন্ধি কর্তে প্রস্তুত।' তখনই বেগে সত্যবতী প্রবেশ করিয়া বলিলেন, 'কখন না। সামন্তগণ! তোমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।' সত্যবতী প্রবেশ

করিবার আগে রাণার কথা কি ভাবে শুনিয়া ফেলিলেন তাহা সত্যই রহস্যময়। 'নুরজাহান' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের অষ্টম দৃশ্যে নুরজাহান মহাবৎ খাঁকে বন্দী করিতে উদ্যত হইয়া বলিতেছেন, 'দেখি, ভারত-সম্রাজ্ঞী নুরজাহানকে বাধা দেয়, সে সাধ্য কার।' অমনি নেপথ্য হইতে লয়লা লাফাইয়া পড়িলেন, 'সে সাধ্য আমার।' এই ধরনের উক্তিতে দর্শকদের চিত্তে আকস্মিক আঘাত লাগে বলিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের পরবর্তী বহু নাট্যকার এ-ধরনের নাট্যরীতি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তবুও বলিতে হয় এই নাট্যরীতি অস্বাভাবিক ও অতি-নাটকীয়।

শরৎ-তর্পণ

৺নলিনীমোহন শাস্ত্রী

১

বাংলাভাষার তুমি শ্রীকান্ত—
চঞ্চল অস্থির,
শরচ্চন্দ্র পরশো দরদে
লজ্জানতের শির।
দেবদাস তব সাগ্নি ভস্ম,
কৈলাস তব চিরনমস্য,
মতিমান্ রাম তোমারি বশ্য—
গর্ব ধরিত্রীর!
আর শুনিব না তব জল্পনা-
কল্পনা গম্ভীর?

২

থামিয়াছে আজি বাংলার মাঠে
মহেশের চলাচল?
গোফুরের তরে ফেলে গেলে না কি
দু ফোঁটা চোখের জল?
গুণী তুমি শুধু গুণটুকু ধরো,
সমবেদনায় সব দোষ হরো।
ব্যথা-মন্থর তব অন্তর
ভাষা ছিল মরমীর!
উঠিবে না আর মধু ঝঙ্কার
পল্লীর সেই শ্রীর?

৩

সংস্কার তুমি ভেঙ্গেছ অনেক—
তবু দৃঢ় সংস্কার
বিপ্রদাসের নির্ভীক করে
লভিয়াছে জয়হার!
আইবুড়ো নাম বহিবার দুখে
সঙের মত রঙ মাখে মুখে
অভাগা কে মেয়ে—আঁকো কৌতুকে
চাপা নয়নের নীর!
অগ্নিমন্ত্র ভাষায় তোমার
করুণা বাল্মীকির।

রমণীর মাঝে মহিমায় যাহা
পেয়েছে অর্ঘ্য তব,
বিষ তার যত স্থধা হ'য়ে ফুটে
অভয় মন্ত্রে নব।
বাঙালীর মেয়ে হোক্ 'পোড়া কাঠ'—
হেঁট কর নাই কাহারো ললাট ;
অবলারে দেছ বলীয়ান্ ঠাট—
মান রাজ-লক্ষ্মীর!
লজ্জায় তারা হোক্ কুঁড়িফুল
মজ্জায় তারা বীর।

৫

কে জানিত বল বাঙালীর ঘরে
জনমে ইন্দ্রনাথ,
অন্নদা দিদি, অভয়া-বিজয়া—
চারিপাশে দিন রাত

বাংলার কোন্ সরসী অঙ্কে
মৃণাল কমল তুলিছে পঙ্কে,
কে রাখিত খোঁজ কুরঙ্গসম
গন্ধ মৃগনাভির ?
অকূলে যখন কূল মেলে নাই
তুমি দেখায়েছ তীর।

৬

আজ বাণী তব হ'ল কি নীরব—
মোহনমন্ত্র শেষ ?
লবে না লেখনী ? মেলিবে না আঁখি ?
কাঁদিছে যে সারা দেশ
পরদুখে কভু পারনি থাকিতে—
আজ সে ক্ষমতা গেল কি চকিতে ?
মুখ চেয়ে শত অভাগা থাকিতে
পালালে কর্মবীর ?
ধ্বনি অলঙ্ঘ্য শুনিলে বুঝি বা
নিষ্ঠুর নিয়তির !

●

ভাব ও রস

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের দেশের সাহিত্যে ও নাট্যশাস্ত্রে ভাব ও রস এই দুটি কথার পারিভাষিক ব্যবহারের একাধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে, বিভিন্ন অর্থে তাদের প্রয়োগ থাকায় অনেক ক্ষেত্রে তাদের অর্থ গ্রহণ করা শক্ত হয়ে পড়ে। এই জন্য মনে হয় এই দুটি কথা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে যে অর্থে পারিভাষিক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে তাদের সুস্পষ্ট পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। এই প্রবন্ধে তারই চেষ্টা করা হবে।

ভাব ও রস এই দুটি শব্দেরই ভরতনাট্যশাস্ত্রে প্রয়োগ আছে। এই গ্রন্থখানির বিষয়বস্তু খুব ব্যাপক। তা নৃত্য এবং অভিনয় সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য প্রাচীন প্রামাণ্য পুস্তক। নৃত্য বা অভিনয় হল বিভিন্ন রূপকর্মগুলির অন্যতম। কাজেই রূপকর্মের ব্যাখ্যা সম্পর্কেই তাদের প্রয়োগ। আমরা প্রথমে আলোচনা ক'রে দেখব তাদের পারিভাষিক অর্থ কি।

ভরতনাট্যম্-এ আটটি ভাব এবং তাদের প্রতিটির সঙ্গে সংযুক্ত আটটি রসের উল্লেখ আছে। এদের সঙ্গে অন্যতম রসশাস্ত্রকার উদ্ভট, শাম ভাব ও তার সহিত সংযুক্ত শান্ত রস যুক্ত করে দিয়েছেন। ফলে আমরা নয়টি ভাব ও তাদের সঙ্গে সংযুক্ত নয়টি রসকে পাই। এই নয় জোড়া পরস্পর সংযুক্ত ভাব ও রসের সম্বন্ধ এইরূপ ঃ

ভাবের শ্রেণী	সংশ্লিষ্ট রস
রতি	শৃঙ্গার
হাস্য	হাস্য
শোক	করুণ
ক্রোধ	রৌদ্র
উৎসাহ	বীর
ভয়	ভয়ানক
জুগুপ্সা	বীভৎস
বিস্ময়	অদ্ভুত
শাম	শান্ত

অভিনয়ের ক্ষেত্রে ভাব ও রসের পারস্পরিক সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করতে হলে আমাদের প্রথমে মনে রাখতে হবে অভিনয় হল সেই ধরনের রূপকর্ম, অনুকরণ হল যার প্রধান অঙ্গ। এখানে অভিনেতা আলাপ, আলোচনা, অঙ্গভঙ্গি এবং ঘটনা-প্রবাহের মধ্য দিয়ে যার রূপ দেন তা হল মনের এক একটি বিশেষ অবস্থার। শিল্পী হিসাবে তিনি যা সৃষ্টি করেন তাকে বলা হয় ভাব। মনের বিশেষ বিশেষ অবস্থা হল তার বিষয়বস্তু। মানুষ কখনো কৌতুক বোধ করে, কখনো রাগে, কখনো ভয় পায়, কখনো শোকগ্রস্ত হয়। এদের তুটি দিক আছে। একটি মনের অবস্থা, অপরটি তার আচরণ, দেহভঙ্গি, কথার মাধ্যমে প্রকাশ। একটি অন্তরের দিক, অপরটি বাহিরের দিক। বাক্যের সহিত অর্থের যে সম্বন্ধ এখানে আচরণের সহিত মনের অবস্থার সেই সম্বন্ধ।

এখন শিল্পী হিসাবে অভিনেতার কাজ হল মনের বিশেষ বিশেষ অবস্থাকে বাহিরের আচরণের দ্বারা ফুটিয়ে তোলা। এরিস্টটল যে বলেছেন যে অভিনয় হল প্রধানত অনুকরণভিত্তিক তার কারণই হ্য এই। মনের এই অবস্থাটির চিত্র ফোটাতে অভিনেতা প্রধানত স্বাভাবিক পথে মানুষ যে রূপের মনের অবস্থার অভিব্যক্তি দেয়, তাকেই প্রধানত অবলম্বন করে। ক্রোধান্ধ ভাবের চিত্রণে অভিনেতার চোখ হয় বিস্ফারিত, গলার স্বর হয় উত্তেজনাপূর্ণ, অঙ্গ হয় কম্পমান ইত্যাদি। যে সামগ্রিক চিত্রটি অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে তাকেই শাস্ত্রের পরিভাষায় ভাব বলা হয়।

এইরূপে অভিনেতা যার অভিব্যক্তি দেন তা হল শিল্পকর্মের স্থানীয়। রূপকার হিসাবে তিনি অনন্তের অবস্থার চিত্র ফুটিয়ে তোলেন। এখানে এই চিত্রণ নির্জন স্থানে বা অরণ্যে করার কোনো সার্থকতা নাই। তাকে সার্থক করতে হলে দ্রষ্টা চাই। সুতরাং অভিনয়ে তুটি বিভিন্ন দলের সম্বন্ধ বর্তমান আছে। এক দিকে অভিনেতা, অপর দিকে দ্রষ্টা। এক দিকে শিল্পী, অপর দিকে সমঝদার। শিল্পী যা দেন দ্রষ্টা তা গ্রহণ করেন। অভিনয়ের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও ঠিক তাই নির্দেশ করে। এখানে শিল্পী যা সৃষ্টি করেন তাকে দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে চান। শিল্পী পেঁছে দেন বলেই তা অভিনয় এবং দ্রষ্টা তাকে গ্রহণ করেন বলেই আমাদের শাস্ত্রে নাটক, বিশেষ করে নৃত্যনাট্য দৃশ্যকাব্য। শিল্পী যা পৌঁছে দেন তার বাহন ততটা মুখের ভাষা নয় যতটা দেহের অঙ্গভঙ্গির ভাষা। তাই এখানে শিল্পী ও সমঝদারের মধ্যে সংযোগসূত্র ততখানি শ্রবণেন্দ্রিয় নয় যতখানি দর্শনেন্দ্রিয়।

শিল্পীর অভিনয় দর্শন ক'রে দর্শক যা উপভোগ করেন তাই হল রস। প্রত্যেকটি ভাবের সঙ্গে একটি রস বিশেষভাবে সংযুক্ত থাকায় তাদের সম্বন্ধটি ঠিক রকম বুঝতে

একটু অসুবিধা হয়। মনে হয় যেন বিভিন্ন ভাব সম্পর্কে দর্শকের মনে প্রত্যেক ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক রসের উপলব্ধি হয়। কিন্তু ঠিক তা নয়। ভাবের আবেদন মনের বুদ্ধিবৃত্তির নিকট নয়, অনুভূতিবৃত্তির নিকট। ঠিক বলতে, আবেদনটি আমাদের মনের মধ্যে যে সৌন্দর্যবোধ গ্রথিত আছে তার প্রতি। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। শিল্পী যখন ক্রোধের ছবি আঁকেন, তখন তিনি অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে যা ফুটিয়ে তোলেন তা হল ক্রোধের ভাব। রসশাস্ত্র বলে তা দেখে দর্শকের মনে যে প্রতিঘাত ফুটে ওঠে তা হল রৌদ্র রস। তার অর্থ এই নয় যে দর্শকের মনেও ক্রোধ সংক্রামিত হয়। তার অর্থ হল শিল্পীর চিত্রণকে দর্শক তাঁর সৌন্দর্যবোধবৃত্তি দিয়ে উপভোগ করেন। দর্শকের মন বলে ক্রোধের যে ছবি শিল্পী ফুটিয়েছেন তা সুন্দর।

এই ভিন্ন ভিন্ন ভাবের পরিস্ফুরণে দর্শকের মনে যে প্রতিক্রিয়া হয় তাও যে প্রতিক্ষেত্রে বিভিন্ন হয় তা নয়। দর্শকের কাছে অবশ্য শিল্পী বিভিন্ন ভাবের বিভিন্ন চিত্র স্থাপন করেন, কিন্তু পরিণতিতে সর্বক্ষেত্রেই এক ফল। দর্শকের সৌন্দর্যবোধ সাড়া দিয়ে প্রতিক্ষেত্রে একই উত্তর দেয়। তা বলে 'সুন্দর'। তার কারণ দর্শক যা দিয়ে ভোগ করেন তা হল তাঁর সৌন্দর্যবোধ।

আমি একটি বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল প্রজাপতি দেখি। আমার সৌন্দর্যবোধ উল্লসিত হয়ে বলে ওঠে, 'সুন্দর'। যখন চাঁপাফুলের গন্ধ বায়ুচালিত হয়ে আমার নাকে যায়, আমি তার সুগন্ধ পাই এবং আমার মন বলে ওঠে, 'সুন্দর'। আমি কালবৈশাখীর ঝড়ের উন্মাদনার তাণ্ডব দেখি। মাথায় তার কালো মেঘের উষ্ণীষ। তাতে বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে। ঝড়ের অশ্ব তার বাহন। পথে যা পায় সব ভেঙে চুরে দিয়ে, ধুলোয় চোখ অন্ধ ক'রে দিয়ে তারা ছুটে চলে। তা দেখেও আমি বলি, 'সুন্দর'। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বিভিন্ন সুন্দর বস্তুর সংবাদ আমাদের মনকে এনে দেয়। রূপ তাদের বিভিন্ন। কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে যে সৌন্দর্যবোধ আছে তা সাড়া দেয় সর্বক্ষেত্রে একই ভাবে। অভিনয়ের ক্ষেত্রেও ঠিক সেই রকম ঘটে।

সুতরাং অভিনেতার কাজ হল শিল্পী হিসাবে বিভিন্ন ভাবকে চিত্রিত করা এবং দর্শকের কাজ হল সেই চিত্রিত রসকে সৌন্দর্যবস্তু হিসাবে উপভোগ করা। ভাবের পরিণতি রসে, রসের পরিণতি আনন্দ-উপভোগে। রসের রূপ বিভিন্ন হলেও সর্বক্ষেত্রেই সৌন্দর্যবস্তু হিসাবে তার উপলব্ধি একই। সেই কারণে রসশাস্ত্রকার বলেন সবারই পরিণতি সৌন্দর্য-আস্বাদ এবং তা এত আনন্দময় যে ব্রহ্মপ্রাপ্তির আনন্দের সমান। তাকে তাই তাঁরা বলেন, 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর।'

সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যের সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা ও 'রস' পরিভাষাটির

ব্যবহার আছে। সেখানে কাব্যকে ‘রসাত্মক বাক্য’ বলা হয়েছে। তার ছন্দ থাক বা নাই থাক, রস থাকার অবশ্য প্রয়োজন। সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্যকাব্যও আছে। ‘সাহিত্যদর্পণ’ গ্রন্থে বিশ্বনাথ বলেন কাব্যের প্রাণই ত হল রস। তার কারণ তার আবেদন আমাদের বুদ্ধিশক্তির নিকট নয়, আমাদের হৃদয়বৃত্তির নিকট। অনুভূতিই তার প্রাণ। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থও সেই কারণে বলেছেন যে কবিতা হল, ‘নির্জনে স্মরণ ক’রে লিপিবদ্ধ-করা অনুভূতি।’ এখানে রসের অর্থ মাধুর্য। যা সুন্দর তাকে অনুভব ক’রে আমরা আনন্দ পাই। তাই তাকে আমরা মধুরও বলি। এখানে রস অর্থে মাধুর্যও বোধ হয় বলতে পারি। দণ্ডী বলেন মধুর হল তাই যা রসবান। রসবত্তা ও মাধুর্য একই বস্তু।

বৈষ্ণব সাহিত্যেও আমরা ‘রস’ কথাটির ব্যবহার দেখতে পাই। এখানে রসের যা পারিভাষিক অর্থ তা নাট্যশাস্ত্র হতে স্বতন্ত্র এবং তার প্রয়োগের ক্ষেত্রও স্বতন্ত্র। বৈষ্ণব সাহিত্যে যে রসতত্ত্বের আলোচনা হয়েছে তার সম্পর্ক বিশেষ করে ধর্মসাধনার সঙ্গে। এক দিকে ঈশ্বর ও অপর দিকে ভক্ত। এই দুয়ের মধ্যে সাধনক্ষেত্রে যে সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে সেই সম্পর্কেই এই কথাটির ব্যবহার। এক একটি বিভিন্ন সম্পর্ক সূচিত করতেই সেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর রসের নামকরণ হয়েছে। অভিনয়ে ব্যবহৃত রস হতে তা সম্পূর্ণ পৃথক। দুই ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট সত্তার মধ্যে যে সম্বন্ধ তাকেই বৈষ্ণবশাস্ত্র-ব্যবহৃত রস কথাটি সূচিত করে।

‘চৈতন্যচরিতামৃতে’ তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে শ্রীচৈতন্য স্বয়ং কৃষ্ণ। তাঁর সঙ্গে ভক্তদের যে সম্বন্ধ তা চার প্রকারের হতে পারে। এই চার প্রকার সম্বন্ধের ভিতর দিয়েই ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সংযোগ স্থাপন হতে পারে। তাই বলা হয়েছে ঃ

যশোদানন্দন হইল শচীর নন্দন
চতুর্বিধ ভক্তকে করে আস্বাদন।

সুতরাং এখানে বিভিন্ন রস সূচিত করে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধের বিভিন্নতা। ভক্ত ভগবানের নিকট নিজেকে দাসভাবে স্থাপন করতে পারে, সন্তান হিসাবে স্থাপন করতে পারে, বন্ধু হিসাবে স্থাপন করতে পারে, আবার প্রেমিক হিসাবেও স্থাপন করতে পারে। তাই ‘চৈতন্যচরিতামৃতে’ বলা হয়েছে ঃ

দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার চারি রস।
চারি ভাবের ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ।

সুতরাং উপাসনার ক্ষেত্রে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের যে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগত

সম্বন্ধ সম্ভব তার ভিত্তিতেই বৈষ্ণব সাহিত্যে এই চার রসের উৎপত্তি। এখানে দাস্য রসে ভগবান প্রভুর মত আচরণ করবেন, বাৎসল্য রসে পিতার মত, সখ্য রসে বন্ধুর মত এবং শৃঙ্গার রসে প্রেমিকের মত।

বৈষ্ণব শাস্ত্রের মতে শৃঙ্গার রস সব থেকে মধুর। কারণ সেখানে ভক্ত ঈশ্বরের সহিত সাম্যের ভিত্তিতে প্রেমের সম্বন্ধে বদ্ধ হন। সেইজন্য এখানে প্রেমের সম্বন্ধ নিগূঢ়তম। সেইজন্যই শৃঙ্গার রসকে মধুর রসও বলা হয়ে থাকে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাই ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন ঃ

তটস্থ হইয়া হৃদে বিচার যদি করি
সব রস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী।

এখন তাহলে আমরা নাট্যশাস্ত্রের রসের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্রের রসের তুলনা করতে পারি। আপাতদৃষ্টিতে তাদের একটা সাদৃশ্য দেখা যায় যে উভয় ক্ষেত্রেই দুটি বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তির সংযোগ বিদ্যমান। নাট্যশাস্ত্রের রসে শিল্পীর সহিত দর্শকের একটি সংযোগ বিদ্যমান। শিল্পীর রূপকর্ম দর্শকের মনে রসরূপে অনুভূত হয়। বৈষ্ণব শাস্ত্রে দু'টি ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট সত্তার একটি সম্বন্ধ বিদ্যমান। এ ছাড়া আর সব বিষয়ে তারা পৃথক।

একটির প্রয়োগ রূপকর্মে, অন্যটির প্রয়োগ ধর্মসাধনায়; একটি সূচিত করে রূপ-কর্মের সংঘাতে দর্শকের মনে যে অনুভূতি জাগে তাই। অপরটি সূচিত করে ভক্ত-ভগবানের মধ্যে উপাস্য-উপাসক রূপে যে সম্বন্ধগুলি সম্ভব তাই। একটির সংখ্যা নয়, অপরটির সংখ্যা চার।

●

ডাঃ জিভাগো

পিনাকীরঞ্জন চক্রবর্তী

সমাজতন্ত্রের দেশ সোভিয়েট রাশিয়া। মেহনতী মানুষের দেশ। সোভিয়েট সোশ্যালিষ্ট রিপাব্লিকের সংবিধানে প্রথম অধ্যায়ের বারো নম্বর ধারায় লিখিত আছে ঃ—

এক, He who does not work, neither shall he eat.

দুই, From each according to his ability, to each according to his work.

আর নাগরিকদের অধিকার সম্বন্ধে দশম অধ্যায়ের একশো তেইশ নম্বর ধারায় লিখিত আছে—

"Equality of rights of citizens of the U. S. S. R. irrespective of their nationality or race, in all spheres of economic, government, cultural, political and public activity, is an indefeasible law."

সংবিধানের উপরিলিখিত ধারাগুলো হতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান, সেখানে ব্যক্তি-মানুষের কণ্ঠরোধ করা হয় না এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য খর্ব হয় না। তা'হলে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার লোকেরা বেশ শান্তিতে আছে। এবং ঐ শান্তির ললিতবাণী দিক্ হতে দিগন্তরে অচিরকাল মধ্যে ধ্বনিত হবে। ললিত বাণীর এমনিই ত' গুণ হয়ে থাকে। সোভিয়েট রাশিয়ায় একনায়কত্ব অনুপস্থিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও স্মর্তব্য, মেহনতী মানুষের, শোষিত জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, তৎসঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তর করবার জন্য সংগ্রাম ছাড়া চলবে না। একটা বিপ্লব চাই। ধীরে ধীরে ক্রমবিবর্তন নয়। আমূল পরিবর্তনের জন্য চাই বিপ্লব।

মুক্ত দুনিয়ায় একনায়কত্ব অনুপস্থিত। মুক্ত দুনিয়ায় একনায়কত্ব উপস্থিত—সে একনায়কত্ব হচ্ছে, সর্বহারার একনায়কত্ব। মেহনতী মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক্ না, হোক্ না সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। তার সঙ্গে আবার ডিক্টেটারশিপ অব দি পার্টি কেন? মালটিপার্টি সিষ্টেম অনুপস্থিত কেন? ঐ অমূল্য চিন্তামণির 'পর নাগরিকদের গভীর আস্থা না ত্রস্ত বিশ্বাস—ভেবে দেখবার মত। যে সমাজে মত-সংগঠনের স্বাধীনতা নেই সেখান হতে সমাজতন্ত্র নির্বাসিত। যে সমাজে বিরোধী দল গঠনের কথা অস্বীকৃত

সেখানে শাসক পয়গম্বর বা ধর্মাবতার হয়ে যে এক পথ প্রদর্শন করবেন, সেই পথ রয়েছে চিরন্তন মুক্তিলাভের জন্য এবং মুক্তিলাভেচ্ছুরা ঐ পথপানে চেয়ে থাকবেন সোৎসুক দৃষ্টিতে —সেখানে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ অনিবার্য।

ষ্ট্যালিনী স্বৈরাচারের কেচ্ছা ষ্ট্যালিন আমলে প্রকাশিত হয়নি। মহামতি ক্রুশ্চেভ সম্প্রতি ফাঁস করেছেন এককালীন রাশিয়াপতি ষ্ট্যালিনের কীর্তি-কাহিনী। আকাশবাণী ওয়ারশ' উনত্রিশে মার্চ উনিশ শ' ছাপ্পান্নতে বলা হয়েছে: "How monstrous and pathologically suspicious must have been the thoughts of a man who could suppose that numerous members of the Cultural Committee were enemies or imperialist agents." আঠাশে মার্চ উনিশ শ' ছাপ্পান্ন'র 'ট্রাইবুনা লুডু'তে বলা হয়েছে: Many honest activists who opposed Stalin in various matters fell victim to repression. Methods of provocation were used; false accusation were forged; abuses took place during investigations in order to bring about the condemnation of the accused."

এছাড়াও রোজা লাক্সেমবার্গ বিপ্লবোত্তর যুগে এক সময় বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে যে কথা বলেছিলেন তা স্মরণীয়: "Without unrestricted freedom of press and assembly, without a free struggle of opinion, life dies out in every public institution in which only bureacracy remains as the active element." সক্রিয় উপাদান হিসেবে যেখানে বুরোক্র্যাসির প্রাধান্য সে জীবন-প্রদীপ ফুৎকারে নিবে যায়। অথচ, এই সমাজতন্ত্রের দুনিয়ার কর্তাব্যক্তির মুখনিঃসৃত হল সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব। নিঃসন্দেহে তা বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলকর। আবার এই রাশিয়াপতির গোঁসাতেই প্যারিসের শীর্ষসম্মেলন ভেঙ্গে গেল। সুতরাং সেই দেশের অভ্যন্তরে পরিপূর্ণ শান্তির বদলে একটা শংকাগ্রস্ত ভাব বর্তমান নয়, একথা আমরা জোর করে বলতে পারি না। উনিশ শ' ছাপ্পান্ন'র চৌঠা এপ্রিলের 'প্রাভ্‌দা' পত্রিকায় বলা হয়েছে: Communist party rules give every Communist the right to discuss all questions of party freely. But the party cannot permit the freedom to discuss problems to be interpreted as the freedom to propagate views alien to the spirit of Marxism-Leninism because this contradicts the provision of party rules and party principles." এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই,

এক, কম্যুনিষ্ট হওয়া

দুই, হয়ে তবে দলীয় সমস্যাবলীর আলোচনার সুযোগ লাভ করা

তিন, কম্যুনিষ্ট হলেও মার্কসিসম্ ও লেনিনিসম্-এর বিরোধী চিন্তাধারা অর্থাৎ 'ভিউজ টু দি স্পিরিট' পোষণ করা চলবে না।

সুতরাং পার্টি প্রিন্সিপল্‌সের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ না করে দণ্ডবৎ হও। দলের দলীয় মতবাদের স্তবকীর্তনে নিদ্রাকর্ষণ না করতে পারলেই বিপত্তি ঘটবে।

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার এই নজীরগুলো হাতে নিয়ে নোবল্ পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক বোরিস পাস্তেরনাকের বহুবিতর্কিত পুস্তক 'ডাঃ জিভাগো' সম্বন্ধে আলোচনা করব।

অমাত্য প্রভুদের কাছে অবহেলা ঘটল বলে শাপ দিলেন প্রভু। তোমার নির্বাসন। তোমার নাগরিকত্ব বরবাদ হ'ল। তোমার বই নিষিদ্ধ হ'ল। কারণ তুমি লৌহ-যবনিকার অন্তরালে যে অদৃশ্য এবং গোপন ক্রিয়াকলাপ চলছে তা লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরেছ। তারই সত্যনিষ্ঠ বর্ণনা করেছ। 'ডাঃ জিভাগো'-প্রণেতার ঘটল অশেষ দুর্গতি। কালিদাসের 'মেঘদূতে' কাজে অবহেলা ঘটেছিল বলে যক্ষকে প্রভু শাপ দিয়েছিলেন। প্রভুশাপগ্রস্ত যক্ষের নির্বাসন ঘটেছিল রামগিরি পর্বতে। (নির্বাসন মেঘদূত-প্রণেতা কালিদাসের নয়)।

পাস্তেরনাক প্রাইজ পেলেন ; হর্ষোৎফুল্ল হলেন। নোব্‌ল প্রাইজ কমিটিকে টেলিগ্রাম করলেন, —'immensely thankful, proud, astonished and abashed'. আবার পরেই তিনি জানাচ্ছেন যে তিনি পুরস্কার গ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি প্রাইজ প্রত্যাখ্যান করেন। তা না করলে তাকে তাঁর দেশের নাগরিকত্ব খোয়াতে হবে।

পুস্তকপ্রকাশের পূর্বে তিনি প্রকাশকদের কাছ থেকে, কম্যুনিষ্ট পত্রিকাগুলোর কাছ থেকে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরেছেন। শেষে ইতালীয় পাবলিশার ফেলত্রেনেলীর চেষ্টায় বই ছাপা হল। যদিও ফেলত্রেনেলী নিজে কম্যুনিষ্ট তবু তিনি এই বই ছেপে বার করলেন। 'ডাঃ জিভাগো'কে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উপন্যাস হিসাবে বিচার করলে ভুল করা হবে। পাস্তেরনাক—সমাজমানুষের সমাজত্বের চাপে ব্যক্তিমানুষের ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুটনে অন্তরায় হোক এ তিনি চাননি।

উনিশ শ' তিন সালে উরি আন্দ্রেয়িভিচ্ জিভাগো দু' বছরের শিশু। রাশিয়ার বিপ্লব আর সে সমবয়সী। চোখের সামনে সে দেখেছে বিপ্লবের নানা অভিব্যক্তি—এবং তাতে ব্যক্তিগতভাবে জড়িয়ে পড়েছে তারই স্পর্শাঘাতজনিত আশা-নিরাশা, শোক, হর্ষ-বিষাদের সংশয়াতুরতা। তিনি এই উপন্যাসে বিপ্লবকে মুখ্য উপজীব্য করেন নি।

বিরাট বিপ্লবের মধ্যে এক কবি-চিত্তের সুগভীর দাহ, তারই রূপায়ন। প্রলয়ঝড়ের তাণ্ডবের মাতনেই ঝড়ের প্রকোপ নয় বরং তরুকোটরে আসীন পক্ষীশাবকদের ত্রস্ত কম্পান্বিত ভাবেই তার চরম প্রকাশ। তাই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ চলে না, তুমি বিপ্লবের বাণীকে, আদর্শকে মসীলিপ্ত করেছ। উপন্যাসের আরম্ভে পাঠক হিসাবে আমরা দেখছি শবাধারের সঙ্গে বহু লোক চলেছে। এ শবাধার কার। উপন্যাসের নায়ক উরি আন্দ্রেয়িভিচ্ জিভাগোর মা'র। শবাধারের মৃতদেহটি এক স্বামী-পরিত্যক্তা নারীর। বালকের জ্ঞানোদ্রেকের সময় তার পিতার কাহিনী অল্প অল্প মনে পড়ে। তার বাবা মদে চুর। মেরেছে তাকে উকিল কোমারোভস্কি মদ খাইয়ে খাইয়ে।

কোমারোভস্কী লোকটা কেমন? সে মাদাম গুইসাকে রেখেছে। মাদাম গুইসা মেয়ে লারাকে পাঠান কোমারোভস্কীর সঙ্গে। সামাজিক নিমন্ত্রণরক্ষার্থে। কোমারোভস্কী গুইসার মেয়ে লারার অভিভাবকবিনির্মুক্ত অবস্থার সুযোগ নিল। কোমারোভস্কী রক্তপায়ী সরীসৃপ। সে আদিম রিপুর মত লালার শুচিতাপহরণ করল। তার দেহের রক্তমাংসের সকল সম্বল লুটে নিল। লারা আস্তে আস্তে বুঝতে শিখল সে পাপব্যূহে ঢুকছে। তার অবস্থা অজগরকবলিত হরিণের। কেমন করে সে বের হবে এ পাপব্যূহ থেকে। ব্যূহের নিষ্ক্রমণের পথে স্বয়ং কোমারোভস্কী। সে তাকে পাতালান্ধকারে ঠেলে দিল। মুক্তি তার মিলল। সে সেন্‌টেটস্কীদের বাড়ীতে উৎসবে গিয়ে কোমারো-ভস্কীকে রিভলবারের গুলিতে শেষ করল।

উপন্যাসে আরও ঘটনা আছে। ডাঃ জিভাগো. উরি যার ডাক নাম সে আর টোনিয়া রয়েছে। তাদের প্রথম যৌবনের সোনালী দিনগুলি। ডাঃ জিভাগোর পিতার মৃত্যু। মামা নিকোলের কাছে তার শিক্ষা। দেশজোড়া দারিদ্র্য সম্পর্কে, সেক্স সম্পর্কে তার শিক্ষা। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি মস্কো শহরের কারখানায় শ্রমিকদের ধর্মঘট। একটা ত্রস্ত ভাব। বেগবান্ অভিজ্ঞতার এই আয়ুধধারণ এবং তার মানসদ্বন্দ্বের নিরন্তর ক্রমবর্ধমানতা এবং তৎপরে দ্বন্দ্বাতীত এক সত্যে বিরাজমান। সেখানে কোনো 'ইজম্' নেই, বাগ্‌বিতণ্ডা নেই, শুধু মুক্তি। মুক্তি। তাই—

যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল,
যত অশ্রুজল
যত হিংসা হলাহল
সমস্ত উঠিছে তরঙ্গিয়া
কূল উল্লঙ্ঘিয়া
উর্ধ্ব আকাশেরে ব্যঙ্গ করি···।

তবু— বেয়ে তরী
সব ঠেলে হতে হবে পার · ·
সুতরাং— শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয় পারাবার
নূতন সৃষ্টির উপকূলে···
নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে

রবীন্দ্র-সঙ্গীত

অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায়

আমার রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ হয় শ্যামসুন্দর মিশ্রের কাছে। শ্যামসুন্দর মিশ্র বেনারসের একজন নামজাদা ওস্তাদ ছিলেন এবং তাঁদের বংশ গায়কদের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে মাইনে করা ওস্তাদ রাখতেন তাঁর উপসনার সঙ্গে, বিশেষ ১১ মাসের উৎসবে, ব্রহ্মসঙ্গীত করার জন্য। শ্যামসুন্দর মিশ্র ঐ ওস্তাদদের অন্যতম ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-সঙ্গীত ও স্বদেশী গান ইত্যাদি তিনি পেয়েছিলেন, ঐভাবে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ থাকায়।

এছাড়া লেডী চৌধুরীর অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ভাইঝি প্রতিভা দেবীর বাড়ীতে কনসার্ট ইত্যাদিতে গাইবার জন্য আমি যেতাম। সেখানে যে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতাম তার কিছু শ্যামসুন্দরবাবুর কাছে শেখা, কিছু ইন্দিরা দেবীর কাছে। নতুন গান ইন্দিরা দেবীই সে সময় বেশী শেখাতেন, ঐ কনসার্টে Solo গাইবার জন্য।

এসবের কিছু পরে, ১৯১১ সালে, রবীন্দ্রনাথের ৫০ বৎসরের জন্মোৎসবে আমরা শান্তিনিকেতন যাই। সেইখানে কবির কণ্ঠে তাঁর স্বরচিত গান প্রথম শুনি এবং সেখানেই আমার তাঁর কাছে গান শেখা আরম্ভ হয়। তারপর প্রতি বৎসরই আমরা শান্তিনিকেতন যেতাম অন্ততঃ তিনচারবার এবং কবিও কলকাতায় আসতেন বেশ কয়েকবার। প্রতিবারেই ছয় সাতটি কি তারও বেশী গান শেখা হোতো আমার তাঁর কাছ থেকে। ১৯১৭ সালে রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিং-এ আমার বাবার বাড়ীতে অনেক দিন ছিলেন। সেখানে একটানা অনেক গান আমি শিখেছিলাম এবং তাঁর মুখে নিজের গানের সম্বন্ধে অনেক কথাও শুনেছিলাম।

এরপর আরম্ভ হয় বর্ষামঙ্গল ইত্যাদি কলকাতায় জনসাধারণের জন্য—টিকিটের ব্যবস্থা কোরে। বর্ষামঙ্গল যে ক'বার কলকাতায় হয়েছে—এবং 'শেষ বর্ষণে'র বেলায়ও উনি নিজেই গান শেখাবার জায়গায়—বিচিত্রার বড় হলে—গিয়ে বস্‌তেন। দিনুবাবু শেখাতেন কিন্তু মাঝে মাঝে কবি নিজে শেখাতেন। একক গীতিগুলি আমি ওঁর কাছেই শিখেছিলাম, উনি নিজে গেয়ে ও আমায় গাইয়ে সে সবই শেখাতেন।

এইভাবে রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর নিজের কাছে শেখা চলে ১৯১১ থেকে ১৯৩২-৩৩

পর্যন্ত। তারপর তাঁর শরীর অশক্ত হয়ে পড়ে এবং তাঁর কাছে গান শেখার সুযোগ আর বিশেষ ছিল না।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আমায় শিখিয়েছিলেন—এবিষয়ে এতকথা আমি বল্‌লাম শুধু এই জন্য যে তাঁর গান শেখা বা গাওয়া সম্বন্ধে আমি আপনাদের কাছে যা কিছু নিবেদন করি সে সব তাঁরই কথা। আমি দীর্ঘদিন ধরে শিখে ও শুনে যা পেয়েছি তাই তাঁরই authority দিয়ে আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি।

কবি ওঁর নিজের গান গাওয়া সম্বন্ধে দুঃখ করে বল্‌তেন যে অনেক সময় ওঁরই রচিত গান পরের মুখে শুনে নিজের গান বলে তিনি চিনতেই পারতেন না। শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবী একথা এক জায়গায় লিখেও গিয়েছেন। আজ আমরা অনেক সময় যে গান তাঁর কণ্ঠে ও দিনুবাবুর কাছে বহুবার শুনেছি এবং নিজেরাও বহুবার গেয়েছি এরকম গান অন্যের মুখ থেকে শুনে চিনতে পারি না।

রবীন্দ্রনাথের মতে গান গাইবার সময় এই কয়টি বিষয়ের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার যথা, সুর, তাল, লয় এবং উচ্চারণ। হ্রস্ব-দীর্ঘের প্রভেদ বিশেষে ই ও ঈ'র মধ্যে উচ্চারণের প্রভেদ খুব স্পষ্ট থাকা প্রয়োজন। এছাড়া প্রত্যেকটি শব্দের বিভিন্ন অক্ষরের উচ্চারণ সুস্পষ্ট হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। "হৃদয় নন্দন-বনে"র জায়গায় "রিদয় নন্দনবনে" উচ্চারিত হলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হতেন। উচ্চারণের বিকৃতিও তাঁর নিতান্ত অপছন্দ ছিল।

যাঁরা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর ইতিহাস জানেন তাঁরা বুঝবেন যে হ্রস্ব-দীর্ঘ ও উচ্চারণের স্পষ্টতার উপর কবির এই ঝোঁক তাঁর পিতৃদত্ত শিক্ষার অঙ্গ। মহর্ষিদেব তাঁর সন্তানদের শিক্ষক-পণ্ডিতদের নিজের খরচে দীর্ঘদিন কাশীতে পাঠিয়ে এই উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য শিখিয়ে এনেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজে যখন গান শেখাতেন তার সঙ্গে কোনও রকম বাদ্যযন্ত্র থাকত না। তিনি মুখে মুখে শেখাতেন এবং যতক্ষণ না ঠিক হোতো বারে বারে গাইতে বল্‌তেন। তিনি নিজে কখনও স্বরলিপি দেন নি বা স্বরলিপি (অন্যের করা) সংশোধন করেন নি। আমার শিক্ষা ও আমার দিদি নলিনীর শিক্ষা ঐভাবে সাক্ষাৎ রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনে এবং তাঁর সামনে বার বার গেয়ে হয়েছে। এবং এই শেখানোর মধ্যে ঐ চারটি বিষয়ের উপর, অর্থাৎ সুর, তাল, লয় ও উচ্চারণের উপর তিনি সমানে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখতেন।

---

* রবীন্দ্র ভারতীতে পঠিত, ৭ই আগষ্ট, ১৯৬৩

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে প্রেক্ষাগৃহ ও রঙ্গভূমি

ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য

আধুনিক রঙ্গমঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি, যখন দেখি, আমাদের থিয়েটারের ইতিহাস—রঙ্গমঞ্চে ও প্রেক্ষাগৃহে-নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস ইংরেজ রাজত্বের সময় থেকে—উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আরম্ভ করা হয়, যখন দেখি, গ্রীকদের মতো প্রাচীন কোন প্রেক্ষাগৃহের বা রঙ্গমঞ্চের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়ে সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করতে পারা যায় না, তখন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মন দৈন্যে ভরে যায় ; মনে হয়—প্রেক্ষাগৃহে-রঙ্গমঞ্চে অভিনয় আমাদের দেশে কোনকালে ছিল না, ইংরেজরাই আমাদের দেশে প্রথম প্রেক্ষাগৃহে ও রঙ্গমঞ্চে নাট্যাভিনয় আমদানী করেছে। কিন্তু বর্তমানের ইতিহাস যাই হোক, প্রাচীন ভারতের নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস পুনর্গঠিত করতে গেলে দেখা যাবে সেখানে সুপরিকল্পিত প্রেক্ষাগৃহ ও রঙ্গমঞ্চের ব্যবস্থা ছিল এবং সেই প্রেক্ষাগৃহ ও রঙ্গমঞ্চ নিয়ে ভারতবাসী হিসাবে উল্লসিত ও গর্বিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ভারতের দুর্ভাগ্য যে তার অতীত ইতিহাসের অনেক পৃষ্ঠাই হারিয়ে গেছে ; সেই ইতিহাস সম্বন্ধে শুধু এই কথাই বলা যায়—"হারিয়ে গেছে সে সব অব্দ। ইতিবৃত্ত আছে স্তব্ধ। পণ্ডিতেরা বিবাদ করে নিয়ে তারিখ সাল।" কিন্তু শত দুর্ভাগ্যের মধ্যেও বড় সৌভাগ্য এইটুকু যে এমন সব লুপ্ত পুঁথি উদ্ধার করা হয়েছে যাদের সাহায্যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুনর্গঠিত করা সম্ভব।

ভরতের নাট্যশাস্ত্র তেমনি একখানি পুঁথি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে নাট্যশাস্ত্রের যে ৪০ খানি পুঁথি পাওয়া গিয়েছে, তাদের মধ্যে শ্লোকসংখ্যার পার্থক্য এবং পাঠ-ভেদের পার্থক্য যতই থাক তাদের ভিত্তি করেই ভরত-প্রণীত নাট্যশাস্ত্র সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়েছে, তথা প্রাচীন ভারতের নাট্যাভিনয়রীতির উপরে যে যবনিকার আচ্ছাদন পড়েছিল সেই যবনিকা অপসারিত হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রের সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে আমরা জানতে পারি—প্রাচীন ভারতে নাট্যকলার পরিপাটি চর্চাই হ'য়েছিল—নাট্যাভিনয়ের উন্নত ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল—প্রেক্ষাগৃহের ও রঙ্গমঞ্চের গঠন-কৌশলে যথেষ্ট উৎকর্ষ দেখা দিয়েছিল। নাট্যের যে সব বিভিন্ন দিক নিয়ে মহামুনি ভরত আলোচনা করেছেন তা

নাট্যসংগ্রহ-শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে। আমরা দেখি, সমগ্র নাট্য-জিজ্ঞাসাকে ভরত তেরোটি বিষয়ে ভাগ করেছেন এবং সেই ১৩টি বিষয় হচ্ছে—

নাট্য-সংগ্রহ

রসা ভাবা হ্যভিনয়াঃ ধর্মীবৃত্তি প্রবৃত্তয়ঃ।
সিদ্ধিঃ স্বরাস্তথাতোত্থং গানং রঙ্গশ্চ সংগ্রহঃ॥
উপচারস্তথা বিপ্রা মণ্ডপাশ্চেতি সর্বশঃ
ত্রয়োদশবিধো হ্যেষঃ হ্যাদিষ্টো নাট্যসংগ্রহঃ।

(১) রস (২) ভাব (৩) অভিনয় (৪) ধর্মী (৫) বৃত্তি (৬) প্রবৃত্তি (৭) সিদ্ধি (৮) স্বর (৯) আতোত্থ (১০) গান (১১) রঙ্গ (১২) উপচার (১৩) মণ্ডপ—এই ১৩টি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার নামই নাট্যবিদ্যাশিক্ষা।

(ক) শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-ভয়ানক-বীভৎস-অদ্ভুত—এই ৮টি নাট্য-**রস** সম্বন্ধে; (খ) রতি-হাস-শোক-ক্রোধ-উৎসাহ-ভয়-ঘৃণা-বিস্ময় এই ৮টি **স্থায়িভাব,** নির্বেদ-গ্লানি-শংকা-অসূয়া-মদ-শ্রম-আলস্য-দৈন্য-চিন্তা-মোহ-ধৃতি-স্মৃতি-ব্রীড়া-চপলতা-হর্ষ-আবেগ-জড়তা-গর্ব-বিষাদ-ঔৎসুক্য-নিদ্রা-অপস্মার-সুপ্ত-বিবোধ-অমর্ষ-অবহিত্থা-উগ্রতা-মতি-ব্যাধি-উন্মাদ-মরণ-ত্রাস-বিতর্ক প্রভৃতি ৩৩টি **ব্যভিচারী-ভাব** এবং স্তম্ভ-স্বেদ-রোমাঞ্চ-স্বরভঙ্গ-বেপথু-বৈবর্ণ্য-অশ্রু-প্রলয়-এই ৮টি **সাত্ত্বিকভাব** সম্বন্ধে, অর্থাৎ মোট ৪৯টি ভাব সম্বন্ধে, (গ) আঙ্গিক-বাচিক-আহার্য-সাত্ত্বিক এই চার প্রকার **অভিনয়** সম্বন্ধে, (ঘ) লোকধর্মী এবং নাট্যধর্মী—২টি **ধর্মী** বিষয়ে, (ঙ) ভারতী-সাত্বতী-কৈশিকী-আরভটি -এই ৪টি **বৃত্তি** সম্বন্ধে, (চ) আবন্তী-দাক্ষিণাত্যা-ওড্র-মাগধী-পাঞ্চালী-মধ্যমা—এই ৫ প্রকার **প্রবৃত্তি** সম্বন্ধে (ছ) দৈবিকী এবং মানুষী—দুই প্রকার **সিদ্ধি** সম্বন্ধে, (জ) সপ্ত **স্বর** সম্বন্ধে, (ঝ) তত-অবনদ্ধ-ঘন-সুষির এই চার প্রকার **আতোত্থ বা বাদ্য** সম্বন্ধে (ঞ) প্রবেশ-আক্ষেপ-নিষ্ক্রাম-প্রাসাদিক-অন্তর—এই পাঁচ প্রকার **গান** সম্বন্ধে (ট) বাহ্য ও আভ্যন্তর দুই প্রকার **উপচার** সম্বন্ধে (ঠ) বিকৃষ্ট-চতুরস্র-ত্র্যস্র এই তিন প্রকার **রঙ্গ-মণ্ডপ সম্বন্ধে** জ্ঞানলাভ যিনি করতেন, তাঁকেই প্রকৃত নাট্যবিদ বলা হ'তো।

এই প্রবন্ধে আমি শুধু রঙ্গমঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রে যে বিবরণ আছে সেই বিবরণটি থেকে প্রাচীন ভারতের রঙ্গমঞ্চের ও প্রেক্ষাগৃহের রূপটি নির্ধারণ করার চেষ্টা করছি। প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে—রূপটি কি এখনও নির্ধারিত হয়নি যে আপনি নির্ধারণ করার চেষ্টা করছেন? সমস্যা কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে অর্থাৎ কেন এই চেষ্টা সেই সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলা আবশ্যক। ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের বিশিষ্ট রূপটি নির্ধারণ করতে হ'লে—**রঙ্গপীঠ, রঙ্গশীর্ষ, মত্তবারণী** এবং **নেপথ্য**—এই চারটির সংস্থান কোথায় এবং তাদের রূপটিই বা কি তা বিশেষভাবে জানা দরকার বটে, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যই

ব'লতে হবে—ঐগুলির সংস্থান এবং পরিমাণ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ধারণার অভাব আজও আছে—রঙ্গমঞ্চ বল্‌তে সুস্পষ্ট কোন ছবি মনের মধ্যে ফুটে ওঠে না। তাই এই প্রবন্ধে আমি ভরতের উক্তি এবং অভিনবগুপ্তের টীকা উদ্ধৃত করে রঙ্গপীঠ, রঙ্গশীর্ষ, নেপথ্য, মত্তবারণী এবং প্রেক্ষামণ্ডপ সম্বন্ধে যতটুকু যা জানবার আছে তাই উপস্থাপিত ক'রতে এবং ভরত-নির্দেশিত রঙ্গমঞ্চের ও প্রেক্ষামণ্ডপের গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করতে চেষ্টা করছি। এই চেষ্টার ফলে আর কিছু হোক বা না হোক, ভরতের উক্তির এবং অভিনবগুপ্তের টীকার সঙ্গে যে পাঠকদের পরিচয় হবে এবং সমস্যার জড় কোথায় তা পাঠকরা বুঝতে পারবেন এ বিষয়ে কোন ভুল নেই।

নাট্যশাস্ত্রের প্রথমাধ্যায়ে নাট্যোৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গেই, নাট্যগৃহ-নির্মাণের প্রয়োজন কেন হয়েছিল তার বিবরণ আছে। সেখান থেকে জানা যায়—

নাট্যগৃহ নির্মাণের ইতিহাস

মহেন্দ্র-বিজয়োৎসবে যখন প্রথম নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছিল এবং দেবাসুর যুদ্ধের অনুকৃতি উপস্থাপিত হয়েছিল, অসুরগণ অভিনয়ে বিঘ্ন-সৃষ্টি করে অভিনয় পণ্ড করে দিয়েছিল, বিঘ্নকারীরা রঙ্গপীঠের উপরে উঠে সূত্রধর ও অভিনেতা-অভিনেত্রীকে সংজ্ঞাহীন ও জড়ীকৃত করে দিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত ইন্দ্র জর্জর-দণ্ড দিয়ে বিঘ্নকারী অসুরদের নিহত ও বিতাড়িত করেছিলেন। এই অবস্থা ঘটলে, ভরত সুতসহ ব্রহ্মার কাছে যেয়ে নাট্যরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করতে বললেন এবং ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে ডেকে 'নাট্যবেশ্ম' নির্মাণ করার নির্দেশ দিলেন। ব্রহ্মার নির্দেশানুসারে বিশ্বকর্মা যে নাট্যগৃহ ও রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করলেন, নাট্যশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তার বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথমতঃ প্রেক্ষাগৃহের পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে ভরত লিখছেন ঃ--

নাট্যগৃহের বিধি ও প্রমাণ

বিকৃষ্টশ্চতুরস্রশ্চত্র্যস্রশ্চৈব তু মণ্ডপঃ।
তেষাং ত্রীণি প্রমাণাণি জ্যেষ্ঠং মধ্যং তথাবরম্।

অষ্টাধিকং শতং জ্যেষ্ঠ চতুঃষষ্টিস্তু মধ্যমম্
কণীয়স্তু তথা বেশ্ম হস্তা দ্বাত্রিংশদিষ্যতে॥
দেবানাং তু ভবেজ্জ্যেষ্ঠং নৃপাণাং মধ্যমং ভবেৎ।
শেষাণাং প্রকৃতীনাং তু কণীয় সংবিধীয়তে॥
[প্রেক্ষাগৃহাণাং সর্বেষাং ত্রিপ্রকারো বিধিঃ স্মৃতঃ
বিকৃষ্টশ্চতুরস্রশ্চ ত্র্যস্রশ্চৈব প্রযোক্তৃভিঃ

কণীয়স্তু স্মৃতং ত্র্যস্রং চতুরস্রং তু মধ্যমম্
জ্যেষ্ঠং বিকৃষ্টং বিজ্ঞেয়ং নাট্যবেদ প্রয়োক্তৃভিঃ ॥]

অর্থাৎ—প্রেক্ষাগৃহ তিন প্রকার—(১) বিকৃষ্ট (২) চতুরস্র (৩) ত্র্যস্র। বিকৃষ্টকে বলা হয় 'জ্যেষ্ঠ'—১০৮ হাত লম্বা এবং ত্র্যস্রকে বলা হয় অবর বা কণীয়—৩২ হাত লম্বা। দেবতাদের প্রেক্ষাগৃহ হবে 'জ্যেষ্ঠ' (বিকৃষ্ট), নৃপদের—মধ্যম (চতুরস্র) এবং অবশিষ্ট জনসাধারণের হবে—কণীয় (ত্র্যস্র)। এই চতুরস্র প্রেক্ষাগৃহের ভিত্তি হবে"—শ্লিষ্টেষ্টকাদৃঢ়া"।

প্রেক্ষাগৃহগুলির মধ্যে মধ্যম অর্থাৎ চতুরস্রই প্রশস্ত, কারণ—

তত্র পাঠ্যং চ গেয়ং চ সুখশ্রাব্যতরং 'ভবেৎ'।

দৈর্ঘ্যে ৬৪ হাত প্রস্থে ৩২ হাত এই আয়তনই বাঞ্ছনীয়—

চতুঃষষ্টিকরান্ কুর্যাদ্ দীর্ঘত্বেন তু মণ্ডপম্।
দ্বাত্রিংশতং চ বিস্তারান্ মর্ত্যানাং যে ভবেদিহ ॥
অত উর্ধ্বং ন কর্তব্যঃ কর্তৃভির্নাট্যমণ্ডপঃ
যস্মাদব্যক্তভাবং হি তত্র নাট্যং ব্রজেদিতি ॥
মণ্ডপে বিপ্রকৃষ্টে তু পাঠ্যমুচ্চরিত স্বরম্
অনিস্সরণ ধর্মত্বাদ্বিস্বরত্বং ভৃশং ব্রজেৎ।
যশ্চাপ্যাস্যগতো ভাবো নানাদৃষ্টি সমন্বিতঃ
স বেশ্মনঃ প্রকৃষ্টত্বাদ্ ব্রজেদব্যক্ততাং পরাম্।

অর্থ—মর্ত্য মানুষের মণ্ডপ দৈর্ঘ্যে ৬৪ হাত এবং বিস্তারে ৩২ হাত হবে। তার বেশী বড় নাট্যমণ্ডপ নির্মাণ করা ঠিক নয়, কারণ তাতে অভিনয় করলে ভাবগুলি সুব্যক্ত হবে না। পাঠ্য ও গান উচ্চৈঃস্বরে করতে হবে বলে বিস্বর বা বেসুরো হয়ে যাবে এবং চোখমুখের ভাবাভিব্যক্তি দেখা যাবে না। অতএব প্রেক্ষাগৃহাণাং সর্বেষাং তস্মান্ মধ্যমমিষ্যতে—মধ্যম প্রেক্ষাগৃহই বাঞ্ছনীয়।

ত্র্যস্র প্রেক্ষাগৃহের গঠনগত বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। বিকৃষ্ট চতুরস্র এবং ত্র্যস্র শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিক দিয়ে দেখলে বিকৃষ্ট বলতে বুঝাবে এমন একটি বৃহৎ ক্ষেত্র যার দৈর্ঘ্য ১০৮ এবং বিস্তার ৬৪, চতুরস্র বলতে বুঝাবে—সমচতুষ্কোণ বা চতুর্ভুজ কোন ক্ষেত্র এবং ত্র্যস্র বলতে বুঝাবে—ত্রিকোণ ক্ষেত্র। ত্র্যস্র—কথাটি সেই অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে। ভরত লিখেছেন—

ত্র্যস্রং ত্রিকোণং কর্তব্যং নাট্যবেশ্ম প্রযোক্তৃভিঃ
মধ্যে ত্রিকোণমেবাস্য রঙ্গপীঠং তু কারয়েৎ ॥

দ্বারং তেনৈব কোণেন কর্তব্যং তস্য বেশ্মনঃ
দ্বিতীয়ং চৈব কর্তব্যং রঙ্গপীঠস্য পৃষ্ঠতঃ ॥

অর্থাৎ—ত্র্যস্র প্রেক্ষাগৃহ হবে ত্রিকোণ। এই ত্রিকোণ গৃহের মধ্যে—ত্রিকোণ রঙ্গপীঠ নির্মাণ করতে হবে। প্রেক্ষাগৃহের দরজা থাকবে কোণে এবং আর একটি দরজা থাকবে—রঙ্গপীঠের পৃষ্ঠে অর্থাৎ পিছনে।

আগেই বলা হয়েছে বিকৃষ্ট, চতুরস্র এবং ত্র্যস্র—এই তিন প্রকার প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে—মধ্যম বা চতুরস্রই বাঞ্ছনীয়।

এই মধ্যম প্রেক্ষাগৃহকে কত ভাগে ভাগ করতে হবে এবং কোন্ ভাগে রঙ্গপীঠ, রঙ্গশীর্ষ, নেপথ্য এবং মত্তবারণী থাকবে—এখন সেই আলোচনায় প্রবেশ করা যাক।

প্রেক্ষাগৃহের বিভাগ

বলা দরকার এখানেই সমস্ত সমস্যার—বহু রকম বাদ-বিসংবাদের জটিলতা রয়েছে। সুতরাং ভরতের উক্তি এবং অভিনবগুপ্তের টীকা দু'দিকেই সমান সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

বিভাগ সম্বন্ধে ভরতের বচন—

চতুষ্‌ষষ্টিকরান্ কৃত্বা দ্বিধাভূতান্ পুনস্ততঃ
পৃষ্ঠতো যো ভবেদ্‌ভাগো দ্বিধাভূতস্য তস্য তু
*সমমর্ধবিভাগেন (তস্যাপ্যর্ধার্ধভাগেন) রঙ্গশীর্ষং প্রকল্পয়েৎ ॥
পশ্চিমে চ বিভাগেঽথ নেপথ্য গৃহমাদিশেৎ—

অর্থাৎ ৬৪ হাত মেপে নিয়ে তাকে দু'ভাগে ভাগ করবে। পিঠের দিকে যে ভাগ পড়বে তাকে আবার দু'ভাগে ভাগ করবে (এক এক ভাগ হবে ১৬ হাত) এবং তার পিঠে যে ভাগ পড়বে তাকে আবার সমান দুভাগে ভাগ করবে—এক এক ভাগ হবে আট হাত করে। এই আট হাতের এক ভাগে হবে—"রঙ্গশীর্ষ" এবং তার পশ্চিমে থাকবে—"নেপথ্য"। এই অংশের টীকা করতে গিয়ে অভিনবগুপ্ত লিখেছেন—"চতুষ্‌ষষ্টির্হস্ত দৈর্ঘ্যাদ্ বিস্তারাচ্চ দ্বাত্রিংশৎকরং ক্ষেত্রং গৃহীত্বা মধ্যে সূত্রং বিস্তারেণ দদ্যাৎ। তত্র যৎ প্রযোক্তুঃ পৃষ্ঠতো ভবিষ্যতি—তৎ পৃষ্ঠম্। তস্য মধ্যে বিস্তারেণ সূত্রং দদ্যাৎ। ততঃ ষোড়শহস্তৌ দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ। পৃষ্ঠগতং ভাগমর্ধেন বিভজ্য অষ্টহস্তং রঙ্গশিরঃ প্রবিশতাং পাত্রাণাং চান্তস্স্থানং নাট্যমণ্ডপস্য হ্যন্তানস্তুপবদবস্থিতস্য রঙ্গপীঠমুখাং তদষ্টহস্তংশিরঃ। তৎপৃষ্ঠে তু দৈর্ঘ্যাদ্ধি ষোড়শহস্তং নেপথ্যগৃহং ভবতি বিস্তারাত্তু দ্বাত্রিংশৎকরম্॥ ননু নৈপথ্যাদিকং চ তত্র গৃহ্যতে তদাহ পশ্চিমে চেতি। তত্র রঙ্গপীঠং বিস্তারতঃ ষোড়শ দৈর্ঘ্যতস্ত্বষ্টহস্তা ইতি কেচিৎ। অন্যে তু এতদেব বিপর্যাসয়ন্তি। বঙ্গানুবাদ—"দৈর্ঘ্যে ৬৪ হাত, বিস্তারে ৩২ হাত ক্ষেত্র গ্রহণ করে, মধ্যে আড়াআড়ি সূত্র ধরবে। তখন

প্রযোক্তার পিঠের দিকে যে ক্ষেত্র থাকবে তার নাম "পৃষ্ঠ"। সেই পৃষ্ঠভাগের মধ্যে আড়াআড়ি সূত্র ধরতে হবে। তাতে ষোল হাত ক'রে দুই ভাগ হবে। পৃষ্ঠগত ভাগকে দু'ভাগে ভাগ করলে এক ভাগ হবে—রঙ্গশির,—প্রবেশকারী পাত্রদের অন্তঃস্থান এবং চিৎ-হয়ে-শুয়ে-থাকা নাট্যমণ্ডপের রঙ্গপীঠমুখ্য (রঙ্গপীঠ-মুখ) আট হাত মাথা (শির)। তার পৃষ্ঠে ১৬ হাত দীর্ঘ- এবং ৩২ হাত বিস্তৃত 'নেপথ্যগৃহ'।…(কেউ কেউ বলেন রঙ্গপীঠ হবে বিস্তারে ১৬ হাত এবং দৈর্ঘ্যে ৮ হাত, কেউ কেউ উল্‌টো কথা বলেন—অর্থাৎ বিস্তারে ৮ দৈর্ঘ্যে ১৬)। সব সময়ে রঙ্গপীঠকেই বড় করা উচিত এই তাঁদের বক্তব্য।" লক্ষণীয় রঙ্গপীঠের দৈর্ঘ্য-বিস্তার নিয়ে অভিনবগুপ্তের সময়েই মতভেদ দেখা দিয়েছিল, কা'রো মতে রঙ্গপীঠের বিস্তার হবে ১৬ হাত, দৈর্ঘ্য হবে ৮ হাত এবং কারো মতে বিস্তার হবে ৮ হাত, দৈর্ঘ্য হবে ১৬। এখানেই ব'লে রাখা ভাল—দৈর্ঘ্য-বিস্তার ঠিক করবার সময় মনে রাখতে হবে, দৈর্ঘ্য বলতে বুঝাবে—প্রেক্ষাসনের দিক থেকে নেপথ্য-গৃহের অভিমুখে যেতে যে দিক সেই দিকটি এবং বিস্তার বলতে বুঝাবে—৩২ হাত বিস্তারের একদিক থেকে আর একদিক। সে যাই হোক—এ পর্যন্ত যে পরিকল্পনা পাওয়া গেল—তা'তে দেখা যায়—৩২ হাত ক্ষেত্রে দর্শকাসন এবং তার সামনে ৩২ হাত রঙ্গপীঠ, রঙ্গপীঠের পিছনে ৮ হাত রঙ্গশীর্ষ এবং তার পিছনে ১৬ হাত নেপথ্যগৃহ।

এবার দেখা যাক—মত্তবারণীর সংস্থান কোথায়। এ সম্পর্কে যে বচন পাওয়া যায় তা এই—

রঙ্গপীঠস্য পার্শ্বে তু কর্তব্যা মত্তবারণী
চতুস্তম্ভসমাযুক্তা রঙ্গপীঠ প্রমাণতঃ
অধ্যর্ধহস্তোৎসেধেন কর্তব্যা মত্তবারণী।
উৎসেধেন তয়োস্তুল্যং কর্তব্যং রঙ্গমণ্ডপম্‌॥

এ ক্ষেত্রে পাঠভেদ যা' আছে তা' অবশ্যই লক্ষণীয়। রঙ্গপীঠস্য 'পার্শ্বে'……বল্‌লে এক রকম সংস্থান হয়, রঙ্গপীঠস্য 'পশ্চাৎ' বল্‌লে ভিন্ন সংস্থান হয়। কোন কোন পুঁথিতে 'পশ্চাৎ' পাঠ আছে। এই অংশের টীকা করতে গিয়ে অভিনবগুপ্ত লিখছেন—"পার্শ্ব ইতি বিশেষানুপাদানাৎ তয়োস্তুল্যমিতি চ দ্বিবচনাল্লিঙ্গাদ্‌ভাবিনোর্দ্বয়োঃ পার্শ্বয়োরিতি লভ্যতে। স্তম্ভাশ্চত্বারো বহির্মণ্ডপান্নিষ্কাসনং কৃত্বা ধ্রিয়ন্তে মণ্ডপক্ষেত্রাদ্‌বহিস্তেন ভিত্তিচ্ছেদাবধৌ স্তম্ভদ্বয়ং ততোঽপি বহির্ভিত্তেরষ্টহস্তান্তরং স্তম্ভাপেক্ষয়াপ্যষ্টহস্তান্তরং স্তম্ভদ্বয়মিত্যেবমিত্যষ্টহস্তবিস্তারা সমচতুরস্রা মত্তবারণী ভবতি॥ আয়ামস্তু প্রমাণমিতি যে বদন্তি তেষামৃতে দৈর্ঘ্যাদষ্টহস্তং বিস্তারাৎষোড়শহস্তমিত্যেকং বিকৃষ্টতা রঙ্গপীঠস্য ভবতি।

অন্যেষাং হস্তমানোঽত্র যথা রঙ্গপীঠাপেক্ষয়া চ সার্ধহস্তপরিমাণ উচ্ছ্রায়ঃ কার্যো মত্তবারণ্যাঃ॥ তয়োরিতি দ্বিবচনং জ্ঞাপকং তং চরিতার্থমিতীঽ নোপেক্ষিত ইতি, 'তস্যা এব যাবান্নুৎসেধ-স্তাবানরঙ্গপীঠস্য, তেন ব্রধ্নভূভাগাপেক্ষয়া সার্ধহস্তপ্রমাণোন্নতং রঙ্গপীঠমিত্যুক্তং ভবতি। তেন মত্তবারণ্যালোকেনাত্যর্থং রঙ্গপীঠস্য দুষ্প্রেক্ষতা। এতচ্চোৎসেধেনেত্যেকবচনেন সূচিতম্। অন্যথোৎসেধাভ্যামিত্যুচ্যেত॥" প্রথমে ভরত যা' বলেছেন বাংলায় বলা যাক। "রঙ্গপীঠের পার্শ্বে (পশ্চাতেও ?) মত্তবারণী নির্মাণ করতে হবে। মত্তবারণী হবে চতুস্তম্ভসমাযুক্ত এবং রঙ্গপীঠের সমপ্রমাণ অর্ধহস্তোন্নত (রঙ্গপীঠ থেকে আধ হাত উঁচু ?) দুই মত্তবারণীর উচ্চতার তুল্য হবে রঙ্গমণ্ডপের উচ্চতা॥" অধ্যায়ের শেষে মত্তবারণী সম্পর্কে ভরতের আর একটিমাত্র বচন আছে ঃ—

পূর্বপ্রমাণনির্দ্দিষ্টা কর্তব্যা মত্তবারণী।
চতুস্তম্ভসমাযুক্তা বেদিকায়াস্ত পার্শ্বতঃ॥

অর্থাৎ পূর্বোল্লিখিত প্রমাণ অনুসারে মত্তবারণী নির্মাণ করতে হবে। মত্তবারণী হবে চতুস্তম্ভসমাযুক্ত এবং রঙ্গপীঠবিন্যস্ত বেদিকার পার্শ্বে। এবার অভিনবগুপ্তের বক্তব্য শোনা যাক। তিনি বলছেন—পার্শ্বে মানে রঙ্গপীঠের দুই পাশে, কারণ এর পরে দ্বিবচনান্ত "তয়োঃ" পদটি ব্যবহার করা হয়েছে। চারটি স্তম্ভ। মণ্ডপের বর্হিভাগে অবস্থিত—মণ্ডপক্ষেত্র থেকে বহির্ভাগে, সুতরাং ভিত্তিচ্ছেদ অবধি দু'টি স্তম্ভ এবং বহির্ভিত্তির আট হাত অন্তরে অবস্থিত স্তম্ভের অনুসারে আটহাত-অন্তর দু'টি স্তম্ভ। অতএব অষ্টহস্ত-বিস্তার সমচতুরস্র বা চতুষ্কোণ মত্তবারণী। যাঁরা বলেন আয়তনই প্রমাণ, তাঁদের মতে—রঙ্গপীঠের বিকৃষ্টতা হচ্ছে দৈর্ঘ্যে ৮ হাত, বিস্তারে ১৬ হাত। অন্যেরা বলেন—মত্তবারণীর উচ্ছ্রায় বা উচ্চতা হবে রঙ্গপীঠ থেকে সার্ধহস্ত পরিমাণ। 'তয়ো' শব্দটি দ্বিবচন-জ্ঞাপক। মত্তবারণীর যতখানি উচ্চতা (উৎসেধ) রঙ্গপীঠের উচ্চতাও ততখানি, সুতরাং এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যাচ্ছে—ভূমি থেকে—রঙ্গপীঠের উচ্চতা হচ্ছে—সার্ধহস্ত প্রমাণ। ....."

মত্তবারণী সম্পর্কে টীকাকারের আর একটি উল্লেখ পাওয়া যায় 'রঙ্গশীর্ষের দারুকর্ম-বর্ণনা প্রসঙ্গে। টীকাকার লিখছেন—

"দ্বে ভূমী রঙ্গপীঠস্যাধস্তনোপরিতনরূপেনেতি কেচিৎ। মত্তবারণী বহির্নিগমন-প্রমাণেন সর্বতো দ্বিতীয়ভিত্তিনিবেশেন দেবপ্রসাদাদ্ধারিকা (দেবপ্রসাদাট্টালিকা ?) প্রদক্ষিণ সদৃশী দ্বিতীয়া ভূমিরিতি অন্যে। উপরিমণ্ডপান্তরনিবেশনাদিত্যপরে.......... ॥ কেউ কেউ বলেন রঙ্গপীঠ দ্বিভূমিক—এক ভূমি নীচুতে, অন্য ভূমি উপরে। কেউ বলেন মত্তবারণী থেকে বাইরে যাওয়ার যে দুয়ার সেই দুয়ারের উচ্চতার প্রমাণ অনুসারে দেবপ্রসাদ-অট্টালিকার চারদিক ঘুরিয়ে যে রকম প্রদক্ষিণ ভূমি থাকে, সেই রকম

রঙ্গপীঠের চারদিকের প্রদক্ষিণ সদৃশী ভূমি। কেউ বলেছেন—মণ্ডপের উপরে আর একটি মণ্ডপ তৈরি করা ……॥ অবশ্য এখানে মত্তবারণীকেই দ্বিতীয় ভূমিরূপে গণ্য করা হয়েছে এমন অর্থ করলে টীকার ঐ অংশের অর্থ দাঁড়াবে—বহির্গমন অর্থাৎ বাইরে যাওয়ার দরজার উচ্চতার প্রমাণে রঙ্গের চারিদিকে যে প্রদক্ষিণ সদৃশী ভূমি তৈরী করা হয় তারই নাম মত্তবারণী (আধুনিক গাড়ী বারান্দার মতো একটা কিছু?)। এ ব্যাখ্যা করা হোক না-হোক, মত্তবারণী সম্পর্কে ভরত এবং তাঁর টীকাকার অভিনবগুপ্ত এই কয়টি কথাই বলেছেন।

তা'হলে মত্তবারণী সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্য পাওয়া গেল ঃ—

(ক) রঙ্গপীঠের **পার্শ্বে**—উভয় পার্শ্বে—মত্তবারণীর সংস্থান।

(খ) রঙ্গপীঠের **পশ্চাতে** (?)মত্তবারণীর সংস্থান (কোন কোন পুঁথি অনুসারে)।

(গ) রঙ্গপীঠের **বেদিকার পার্শ্বে** মত্তবারণীর সংস্থান।

(ঘ) মত্তবারণী চতুস্তম্ভসমাযুক্তা।

(ঙ) অষ্টহস্তবিস্তারা সমচতুরস্রা মত্তবারণী। (কারণ—রঙ্গপীঠের সমপ্রমাণ)

(চ) মত্তবারণী রঙ্গপীঠ থেকে সার্ধহস্ত পরিমাণ উচ্চ হবে।

(৬) রঙ্গপীঠের যতখানি উচ্চতা মত্তবারণীর উচ্চতাও ততখানি।

(৭) মত্তবারণী দু'টির উচ্চতার প্রমাণ অনুসারে রঙ্গমণ্ডপের উচ্চতা নির্ধারিত হবে। (উৎসেধেন তয়োস্তুল্যং কর্তব্যং রঙ্গমণ্ডপম্)।

(৮) মত্তবারণী দেবপ্রসাদাট্টালিকা প্রদক্ষিণসদৃশী দ্বিতীয় ভূমি (?)

উল্লিখিত তথ্য থেকে মত্তবারণীর কোন স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, পরস্পর বিরোধী উক্তিও পাওয়া যায়। কেউ বলছেন—রঙ্গপীঠের দুইপাশে মত্তবারণীর সংস্থান, কোন পুঁথিতে পাওয়া যায়—রঙ্গপীঠের পশ্চাতে মত্তবারণীর সংস্থান। কেউ বলছেন—রঙ্গপীঠের ও মত্তবারণীর উচ্চতার পরিমাণ একই; কেউ বলছেন—রঙ্গপীঠ থেকে মত্তবারণী সার্ধহস্ত (আধ হাত বা অর্ধ সহ এক হস্ত? অর্থাৎ দেড় হাত) উচ্চ। কেউ বলতে চান—মত্তবারণী রঙ্গপীঠের উপরিতন অর্থাৎ দ্বিতীয় ভূমি। এই সব উক্তির মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব কি না বা কোন্‌টি বেশী যুক্তিসঙ্গত, রঙ্গপীঠ ও রঙ্গশীর্ষের সম্যক পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত ঐ প্রশ্নের আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখা যাক। এখন রঙ্গপীঠ ও রঙ্গশীর্ষের বিবরণ।

প্রথমতঃ **রঙ্গপীঠের বিবরণ**। যেখানে প্রথম বিভাগ পরিকল্পনা করা হয়েছে সেখানে 'রঙ্গপীঠের কোন উল্লেখ নেই, বলা হয়েছে—"সমমর্ধবিভাগেন রঙ্গশীর্ষং প্রকল্পয়েৎ।" এবং পশ্চিমে চ বিভাগেহথ নেপথ্যগৃহমাদিশেৎ।"—অর্থাৎ শুধু রঙ্গশীর্ষ

এবং নেপথ্যগৃহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 'রঙ্গপীঠ' কথাটি প্রথম পাওয়া যায়— মত্তবারণীর সংস্থান নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে—"রঙ্গপীঠস্য পার্শ্বে তু কর্তব্যা মত্তবারণী।"......... রঙ্গপীঠ প্রমাণতঃ ......॥ তবে কি রঙ্গপীঠ ও রঙ্গশীর্ষ সমার্থক ? না, তা বলা চলবে না। কারণ—মত্তবারণী নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়েই ভরত লিখেছেন—

রঙ্গপীঠং ততঃ কার্যং বিধিদৃষ্টেণ কর্মণা
রঙ্গশীর্ষং তু কর্তব্যং ষট্‌দারুকসমন্বিতম্।

অবশ্য রঙ্গপীঠ এবং রঙ্গশীর্ষ শব্দ দুটি সব পুঁথিতেই যে একই স্থানে বসেছে তা নয়, রঙ্গপীঠের জায়গায় রঙ্গশীর্ষ বসেছে এমনও দেখা যায়। যেমন রঙ্গশীর্ষের বর্ণনা করার প্রসঙ্গেই লেখা হচ্ছে—

কূর্মপৃষ্ঠং ন কর্তব্যং মৎস্যপৃষ্ঠং তথৈব চ
শুদ্ধাদর্শতলাকারং **রঙ্গশীর্ষং** প্রশস্যতে।

রঙ্গশীর্ষের স্থানে কোন কোন পুঁথিতে 'রঙ্গপীঠ' কথাটি পাওয়া গেছে। সে যাই পাওয়া যাক, রঙ্গশীর্ষ এবং রঙ্গপীঠ যে দুটি ভিন্ন ক্ষেত্র এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রঙ্গশীর্ষ ও রঙ্গপীঠের সংস্থান সম্পর্কে আচার্য অভিনবগুপ্তের নিম্নলিখিত উক্তিটি বিশেষভাবে দিকদর্শক। ভরত যেখানে পুনরায় চতুরস্র নাট্যগৃহের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন, সেই অংশের টীকা করতে যেয়ে আচার্য অভিনবগুপ্ত লিখেছেন—অষ্টভির্ভাগৈ সর্বতঃ ক্ষেত্রং বিভজেৎ, যেন চতুরঙ্গফলকবচ্চতুষষ্ঠিকোষ্ঠং ভবতি। তত্র মধ্যমকোষ্ঠকচতুষ্কে রঙ্গপীঠং সর্বতোঽষ্টহস্তং, তস্য পশ্চিমে ভাগে প্রাক্‌পশ্চিমে দ্বাদশহস্তং দক্ষিণোত্তরতো দ্বাত্রিংশৎকরং তৎক্ষেত্রমবশিষ্যতে। অত্র যদ্রঙ্গপীঠেন স্বীকৃতং তদ্ধি হস্তাষ্টকমেব। যদবশিষ্টং ক্ষেত্রং তন্মধ্যাদ্‌রঙ্গপীঠ নিকটগতং প্রাক্‌পশ্চিমশ্চতুর্হস্ত বিস্তারেণ দ্বাত্রিংশদ্ধস্তং ক্ষেত্রাংশাদ্বিভজ্য তাবৎপ্রমাণমেব পশ্চিমভাগেঽপি, ষড়্‌দারুকসংস্থানং রঙ্গশীরঃ কুর্যাৎ। ততোঽপি পশ্চিমে তাবদেব নেপথ্যগ্রহণং (গৃহং)। অর্থঃ—সমস্ত ক্ষেত্রটিকে আট ভাগে ভাগ করবে, যাতে দাবার ছকের মতো ৬৪ কোষ্ঠ হয়। সেখানে মাঝের চারিটি কোষ্ঠে রঙ্গপীঠ— দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৮ হাত তার পূর্ব-পশ্চিমে অর্থাৎ ডাইনে-বামে ১২ হাত করে—ক্ষেত্র অবশিষ্ট থাকবে। রঙ্গপীঠ অধিকার করবে মাত্র আট হাত। যা অবশিষ্ট থাকবে তার ভিতর থেকে রঙ্গপীঠের সংলগ্ন ক্ষেত্রাংশ থেকে (প্রাকপশ্চিমতশ্চতুর্হস্ত বিস্তারেণ দ্বাত্রিংশদ্ধস্তং) তাবৎপ্রমাণ অর্থাৎ একই মাপের ষট্‌দারুকযুক্ত রঙ্গশীর নির্মাণ করবে। তারপর তার পশ্চিমে নেপথ্যগৃহ॥" এখানে লক্ষ্য করবার বিষয়—রঙ্গশীর্ষ প্রাক্‌-পশ্চিমতঃ অর্থাৎ পূর্ব-পশ্চিমে ৪ হাত বিস্তৃত এবং ৩২ হাত দীর্ঘ—এমন একটি ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি—আচার্য লিখেছেন—"পৃষ্ঠগতং ভাগমর্ধেন

বিভজ্যাষ্টহস্তং রঙ্গশিরঃ ....রঙ্গপীঠমুখ্যং তদষ্টহস্তং শিরঃ। ...রঙ্গপীঠ সম্বন্ধে ভরতের স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়—

অষ্টহস্তং তু কর্তব্যং রঙ্গপীঠং প্রমাণতঃ
চতুরস্রে সমতলং বেদিকা সমলংকৃতম্॥

অর্থাৎ রঙ্গপীঠ হবে প্রমাণে ৮ হাত, সমতল এবং বেদিকাশোভিত।

রঙ্গপীঠ দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে কত হাত হবে—এই প্রশ্নের নানা উত্তর পাওয়া যাচ্ছে। উত্তরগুলি সাজিয়ে রাখা যাক্।

(১) কেউ কেউ বলেন—"রঙ্গপীঠং বিস্তারতঃ ষোড়শঃ দৈর্ঘ্যতস্ত্বষ্টহস্তা"—অর্থাৎ বিস্তারে ১৬ হাত, দৈর্ঘ্যে ৮ হাত।

(২) অন্যে এতদেব বিপর্যাসয়স্তি—কেউ কেউ ঐ প্রমাণ মানেন না, উলটো কথা বলেন—(বলেন কি বিস্তারে ৮, দৈর্ঘ্যে ১৬ ?)

(৩) তত্র মধ্যমকোষ্ঠক চতুষ্কে রঙ্গপীঠং **সর্বতোঽষ্টহস্তং** অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে·প্রস্থে ৮ হাত × ৮ হাত।

রঙ্গপীঠ সম্পর্কে একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য হচ্ছে - "দ্বে ভূমী রঙ্গপীঠস্যাধস্তনোপরিতন-রূপেণেতি কেচিৎ। মত্তবারণী বহির্নিগমন প্রমাণেন সর্বতো দ্বিতীয় ভিত্তিনিবেশেন দেবপ্রসাদাট্টালিকা প্রদক্ষিণ সদৃশী দ্বিতীয়া ভূমিরিত্যন্যে॥ অর্থাৎ রঙ্গপীঠ দ্বিভূমিক। কেউ বলেন 'রঙ্গপীঠের' অধস্তন ভূমি এবং রঙ্গপীঠের উপরিতন ভূমি। কেউ বলেন মত্তবারণী অথবা মত্তবারণী থেকে বাইরে যাওয়ার যে দরজা সেই দরজার উচ্চতা অনুযায়ী চতুর্দিকে দ্বিতীয় ভিত্তিনিবেশন করে দ্বিতীয় ভূমি তৈরী করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ রঙ্গশীর্ষের পরিচয়। বিভাগ-পরিকল্পা-প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে—'সমমর্ধবিভাগেন রঙ্গশীর্ষং প্রকল্পয়েৎ॥ এর টীকা করতে আচার্য অভিনবগুপ্ত লিখেছেন—

রঙ্গশীর্ষ

"পৃষ্ঠগতংভাগমর্ধেন বিভজ্যষ্টহস্তং রঙ্গশিরঃ প্রবিশতাং পাত্রাণাং চান্তস্স্থানং নাট্যমণ্ডপস্য হ্যুত্তানসুপ্তবদবস্থিতস্য রঙ্গপীঠমুখ্যং তদষ্টহস্তং শিরঃ॥ অর্থাৎ রঙ্গপীঠের পশ্চিমে বা পৃষ্ঠে অষ্টহস্ত রঙ্গশীর্ষ—অন্তঃস্থান (inner বা up-stage ?)—রঙ্গপীঠাভিমুখী অষ্টহস্ত শির। এই সামান্য নির্দেশ থেকে রঙ্গশীর্ষের সংস্থানেরও প্রমাণের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় না—জানা যায় না, রঙ্গশীর্ষের দৈর্ঘ্য ও বিস্তারের নির্দিষ্ট মান। প্রশ্ন জাগে—রঙ্গশীর্ষ কি রঙ্গপীঠের মতই ৮″ × ৩২″ বা ৮″ × ১৬″ বা ১৬″ × ৮″ অথবা ৮″ × ৮″ ? আচার্য অভিনবগুপ্তের টীকা এই প্রশ্নের উত্তরে যতটুকু সাহায্য করে, তাতে আমরা সমস্যার সমাধানে কৃতকার্য হই বলে মনে করিনে। বরং ধারণাটা যেন গুলিয়েই যায়। স্পষ্ট করতে যেয়ে অভিনবগুপ্তপাদ যা লিখেছেন তা'তে অস্পষ্টতা বেড়েছে ছাড়া

কমেনি। তিনি এ বিষয়ে আগে লিখেছেন—৮ হাত রঙ্গপীঠের পৃষ্ঠে ৮ × ১৬ হাত রঙ্গশীর্ষ এবং তার আগে ১৬ × ৩২ নেপথ্যগৃহ। কিন্তু এখানে লিখেছেন—"অষ্টবিভাগৈঃ সর্বতঃ ক্ষেত্রং বিভজেৎ, যেন চতুরঙ্গ ফলকবৎ চতুষ্‌ষষ্ঠিকোষ্ঠং ভবতি। তত্র মধ্যম কোষ্ঠ চতুষ্কে রঙ্গপীঠং সর্বতোঽষ্টহস্তং, তস্য পশ্চিমে ভাগে প্রাক্‌পশ্চিমে দ্বাদশহস্তং দক্ষিণোত্তরতো দ্বাত্রিংশৎকরং ক্ষেত্রমবশিষ্যতে। অত্র যদ্রঙ্গপীঠেন স্বীকৃতং তদ্ধি হস্তাষ্টকমেব। * যদবশিষ্টং ক্ষেত্রং তন্মধ্যাদ্রঙ্গপীঠনিকটগতংপ্রাক্ পশ্চিমতশ্চতুর্হস্তং বিস্তারেণ দ্বাত্রিংশদ্ধস্তং ক্ষেত্রাংশাদবিভজ্য, তাবৎ প্রমাণমেব পশ্চিমভাগেঽপি ষট্‌-দারুক সংস্থানং রঙ্গশিরঃ কুর্যাৎ॥ ততোঽপি পশ্চিমে তাবদেব নেপথ্যগ্রহণম্ (গৃহম্)।" এখানকার নির্দেশ হল এই যে—৩২" × ৩২" ক্ষেত্রটিকে সব দিকে অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থকে সমান আট ভাগে ভাগ করে দাবার ছকের মতো ৬৪ কোষ্ঠে পরিণত করবে। এই ৬৪ কোষ্ঠের মধ্যম কোষ্ঠচতুষ্কে হবে রঙ্গপীঠ। এখন মধ্যম বলতে যদি মাঝখানটি ধরা হয় তা'হলে রঙ্গপীঠের সংস্থান বদলে যায়। এ কথা ঠিক মাঝখানের ৪টি কোষ্ঠকে রঙ্গপীঠ ধরলে, তার পশ্চিমে –১২ হাত × ৩২ হাত একটি ক্ষেত্র অবশিষ্ট থাকে। ঐ ক্ষেত্র থেকে—রঙ্গপীঠের সংলগ্ন ক্ষেত্র থেকে—পূব-পশ্চিমে ৪ হাত এবং উত্তর-দক্ষিণে ৩২ হাত ক্ষেত্র নিয়ে—রঙ্গশীর্ষ এবং তারও পশ্চিমে ঐ একই প্রমাণের নেপথ্যগৃহ নির্মাণ করবে। বলা বাহুল্য আগের নির্দেশের থেকে এই নির্দেশ পৃথক। ৩২" × ৩২" হাত প্রেক্ষামণ্ডল বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ৩২" × ৩২" ক্ষেত্রের প্রথম ৮ হাত ক্ষেত্রে রঙ্গপীঠ, দ্বিতীয় ৮ হাত ক্ষেত্রে রঙ্গশীর্ষ এবং অবশিষ্ট ১৬ হাত ক্ষেত্রে নেপথ্যগৃহ—এই নির্দেশ এখানে পাওয়া গেল না। এখানে রঙ্গপীঠের সামনে ও পিছনে ১২" × ৩২" হাত ক্ষেত্র থাকছে। পিছনের ক্ষেত্রে ৪ × ৩২ রঙ্গশীর্ষ এবং ৪ × ৩২ নেপথ্য গৃহ করলে আরো ৪" × ৩২ একটি ক্ষেত্র অবশিষ্ট থাকবে এবং সামনে ১২ × ৩২ একটি ক্ষেত্র শূন্য পড়ে থাকবে। যদি—"যদবশিষ্টং ক্ষেত্রং·········কুর্যাৎ" এই বাক্যটির অর্থ এইভাবে করা হয় যে রঙ্গপীঠের সংলগ্ন ক্ষেত্র থেকে ৪ × ৩২ একটি ক্ষেত্র কেটে নিয়ে তার পশ্চিমে ঐরূপ ৪ × ৩২ আর একটি ক্ষেত্র জুড়ে রঙ্গশীর্ষ নির্মাণ করবে, তা'হলে রঙ্গশীর্ষ ৮ × ৩২ হয় বটে, কিন্তু নেপথ্যগৃহ হবে—৪" × ৩২"। সুতরাং 'তাবদেব'—বলতে যা বুঝায় সে অর্থ খাটবে না। সব চেয়ে বড় সমস্যা হবে—সামনের ১২" × ৩২" ক্ষেত্রটিকে নিয়ে। দর্শকাসন ও রঙ্গপীঠের মধ্যে ১২ হাত ব্যবধান রাখা হ'ত—এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য হয়ে পড়বে। যাই হোক—এই পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে রঙ্গশীর্ষ রঙ্গপীঠের পৃষ্ঠে এবং নেপথ্যগৃহের সম্মুখে অবস্থিত। কারণ রঙ্গশীর্ষের ষট্‌দারুকেই নেপথ্যগৃহের দুটি দুয়ার থাকে—"কার্যং দ্বারদ্বয়ং চাত্র নেপথ্যগৃহকস্তু তু"। রঙ্গশীর্ষের সংস্থান ও প্রমাণ সম্বন্ধে আর একটি জ্ঞাতব্য বিষয়

এই—"সমুন্নতং সমং চৈব রঙ্গশীর্ষং তু কারয়েৎ বিকৃষ্টে তূন্নতং কার্যং চতুরস্রে সমং তথা" অর্থাৎ রঙ্গপীঠ থেকে রঙ্গশীর্ষ উন্নত হবে অথবা সমান হবে। বিকৃষ্ট নাট্যগৃহে উন্নত এবং চতুরস্রে সমতল হবে।

রঙ্গশীর্ষের স্থান ও প্রমাণ সম্বন্ধে অধিক আলোচনায় কালক্ষেপ না করে এবার রঙ্গশীর্ষের গঠনগত বৈচিত্র্য ও জটিলতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। রঙ্গশীর্ষ সম্বন্ধে প্রথম নির্দেশ এই যে রঙ্গশীর্ষ হবে "ষট্‌দারুকসমন্বিতম্"। ষট্‌দারুক কথাটির অর্থ নিয়েও যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। আচার্য অভিনবগুপ্ত লিখছেন—"নেপথ্যগৃহভিত্তিলগ্নৌ স্তম্ভাবষ্টহস্তান্তরাবন্যোন্যং নিবেশ্য তয়োর্যন্মুখাদেরপেক্ষয়া চতুর্হস্তান্তরং স্তম্ভদ্বয়ং তেষা-মধস্তনং কাষ্ঠমুপরিতনং চেতি ষট্‌দারুণি যত্রষট্‌দারুনি তত্র ষট্‌দারুকম্ সংজ্ঞায়াং কন্ ॥ ·· অত্র নেপথ্যগৃহস্য দ্বারদ্বয়ং কার্যং একং দক্ষিণতঃ। অপরমুত্তরতঃ। নেপথ্যগৃহের ভিত্তিতে আট হাত অন্তর সন্নিবেশিত ২টি স্তম্ভ এবং তাদের মুখ বরাবর (?) (মুখাদেরপেক্ষয়া) চার হাত-অন্তর ২টি স্তম্ভ, তাদের নীচের কাঠ এবং উপরের কাঠ—মোট ৬ খানি কাঠ। তারই নাম ষট্‌দারুক। এই ষট্‌দারুকেই নেপথ্যগৃহের দরজা দুটি থাকে; একটি দক্ষিণ পার্শ্বে অন্যটি উত্তর পার্শ্বে॥ কিন্তু অন্যান্য মতও আছে এবং আচার্য তা' উল্লেখ করেছেন। কারো কারো মতে—

পার্শ্বদ্বয়োর্ধ্বাধরদারুমণ্ডিতং
স্তম্ভদ্বয়োপেতমিহাচ্ছপাতম্ ?

—ইতি ষট্‌দারুকামাহুঃ। অন্যে তূহঃ স্তম্ভ শিরসো দূরং নির্গতকাষ্ঠং প্রত্যুহস্ততো বিনির্গতা তুলা সঞ্জবনফলকাঃ স্থতা আকাশে ভিত্তিব্যাখ্যাঃ স্তম্ভাশ্রিতাঃ সিংহাদয়ো ব্যালানুবন্ধাশ্চ নির্ব্যূহা—স্তুলান্তান্নিস্‌স্থতাঃ ফলকভিত্তিময়াঃ কুহরানি পর্বতপুরনিকুঞ্জগহ্বররূপানীতি।

তাহলে ষট্‌দারুক সম্বন্ধে তিনটি মত পাওয়া যাচ্ছে—

(১) নেপথ্যভিত্তিলগ্ন—৪টি স্তম্ভ এবং ঐ স্তম্ভের উপরের ও নীচের বাতা বা কাঠ।

(২) দুই পাশের উপর নীচের ৪ খানি কাঠ এবং ২টি স্তম্ভ।

(৩) **উহ** অর্থাৎ স্তম্ভের মাথা থেকে দূরে নির্গত যে কাঠ, **প্রত্যুহ**—উহ থেকে বিনির্গত তুলা, **সঞ্জবনফলক**—আকাশে স্থাপিত ভিত্তিব্যাখ্যা। **স্তম্ভা**শ্রিত সিংহাদি, ব্যালানুবন্ধ, **নির্ব্যূহ**—তুলান্ত থেকে নিঃসৃত ফলকভিত্তিময় দারুকর্ম, **কুহর**—পর্বত পুর-নিকুঞ্জগহ্বর প্রভৃতি দারুকর্ম।

ষট্‌দারুক শব্দটি ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যায়—শুধু যে "তৎপাত্রাণাং বিশ্রান্ত্যৈ

আগচ্ছতাং চ গুপ্ত্যৈ রঙ্গস্য শোভায়ৈ রঙ্গশিরঃ কার্য্যম্"—তা' নয়, রঙ্গশির ছিল নানারকম দৃশ্যসজ্জার ও যন্ত্র প্রভৃতির বিন্যাসক্ষেত্র। রঙ্গশীর্ষ—কূর্মপৃষ্ঠের মতো বা মৎস্যপৃষ্ঠের মতো হবে না, রঙ্গশীর্ষ হবে—"শুদ্ধাদর্শতলাকারং"—এই নির্দেশ দেওয়ার পরে ভরত দারুকর্ম সম্বন্ধে লিখছেন—

এবং রঙ্গশিরঃ কৃত্বা দারুকর্ম প্রযোজয়েৎ
উহ প্রত্যহসংযুক্তং নানাশিল্প প্রযোজিতম্॥
নানাসঞ্জবনোপেতং বহুব্যালোপশোভিতম্
ভবেযুশ্চাত্র বিন্যস্তা বিবিধা সালভঞ্জিকাঃ
নির্ব্যূহকুহরোপেতং নানাগ্রথিত বেদিকম্
নানাবিন্যাসসংযুক্তং যন্ত্রজাল গবাক্ষকম্
সুপীঠ ধারণীযুক্তং কপোতালীসমাকুলম্
নানাকুট্টিম বিন্যস্তৈঃ স্তম্ভৈশ্চাপ্যুপশোভিতম্॥

উহ, প্রত্যূহ, সঞ্জবন প্রভৃতি শব্দের অর্থ আগেই দেওয়া হয়েছে। এখানে অন্যগুলির অর্থ টীকাকার এইভাবে দিয়েছেন—"অনেকসালভঞ্জিকা কাষ্ঠমধ্যঃ কাস্তাপ্রকৃতয়ঃ, নানাকৃতিভির্গ্রথিতা বেদিকাশ্চতুরস্রিকাঃ, যন্ত্রচিত্রানি, জালানি চতুরস্রাষ্টাস্রচ্ছিদ্ররূপাণি, গবাক্ষাণি চ বর্তুলছিদ্রাত্মকানি যত্র পীঠানি স্তম্ভোপরি তেষু ধারিণ্যস্তুলাঃ কপোতালী বিটঙ্কপালী, কুট্টিমস্যনালাত্বং রঙ্গশিরোরঙ্গপীঠমত্তবারনীদ্বয়ভেদাৎ সর্বত্র তথাবিধদারুকং রক্তসিতনীলপীতানি ভেদাদ্বা ………"। এই বিচিত্র দারুকর্মের নির্দেশ যদিও রঙ্গশীর্ষের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় তবু এ কথা সহজঅনুমেয় যে রঙ্গশীর্ষেই বেশী পরিমাণে দৃশ্য স্থাপনা করা হ'ত—সঞ্জবনফলক ভিত্তিব্যাখ্যাত্মক ফলক বেদিকা প্রভৃতি বিন্যস্ত করা হ'ত।

তৃতীয়তঃ নেপথ্য গৃহের পরিচয়।

নেপথ্যগৃহের সংস্থান রঙ্গশীর্ষের পৃষ্ঠে। রঙ্গশীর্ষের—"পশ্চিমে চ বিভাগেহথ নেপথ্য-গৃহমাদিশেৎ।" অভিনবগুপ্ত টীকায় লিখেছেন—"তৎপৃষ্ঠেতু দৈর্ঘ্যাদ্ধি ষোড়শহস্তং নেপথ্যগৃহং ভবতি বিস্তারাত্তু দ্বাত্রিংশৎকরমেব" অর্থাৎ নেপথ্যগৃহের মান হচ্ছে—১৬" × ৩২"। কিন্তু রঙ্গশীর্ষের পরিচয় প্রসঙ্গে দেখানো হয়েছে—রঙ্গপীঠ, রঙ্গশীর্ষ এবং নেপথ্যগৃহের অবস্থান সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পথে আচার্য অভিনবের টীকা বাধা সৃষ্টি করেছে। তবে একটি বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে নেপথ্যগৃহ রঙ্গশীর্ষের পশ্চিমে অর্থাৎ পৃষ্ঠে অবস্থিত এবং ঐ নেপথ্যগৃহের দুটি দরজা সম্মুখে এবং একটি দরজা পাশে। রঙ্গশীর্ষের ষটদারুকে—কার্যং দ্বারদ্বয়ং চাত্র নেপথ্যগৃহকস্য

তু—নেপথ্যগৃহের দু'টি দরজা, একটি দক্ষিণে, একটি উত্তরে। এই দু'টি দরজাই রঙ্গাভিমুখী—নিশ্চয়ই রঙ্গশীর্ষাভিমুখী। কিন্তু অন্যত্র ভরত লিখেছেন—

নেপথ্যগৃহকং চৈব ততঃ কার্যং প্রযত্নতঃ।
দ্বারং চৈকং ভবেত্তত্র রঙ্গপীঠপ্রবেশনম্॥
জনপ্রবেশনং চান্যদাভিমুখ্যেন কারয়েৎ
রঙ্গস্যাভিমুখং কার্যং দ্বিতীয়ং দ্বারমেবতু॥

এই অংশের টীকায় অভিনবগুপ্ত লিখছেন—কক্ষ্যাবিভাগেন তাবৎ দ্বে দ্বারে, তেন দ্বারমিতি জাতবেকবচনম্। একশব্দশ্চ রাশ্যভিপ্রায়েণ রাশিকরণে চ নিমিত্তং পাত্রপ্রবেশোপায়নং, তথা চ কক্ষ্যাধায়ে বক্ষ্যতি—"যে নেপথ্যগৃহদ্বারে ময়া পূর্বং প্রকীর্তিতে। তয়োর্ভাগুস্য বিন্যাসঃ...' ইতি (জন) প্রবেশনং তৃতীয়দ্বারং নেপথ্যগৃহস্য যেন ভার্যামাদায় নটপরিবারঃ প্রবিশতি। অন্যত্তু দ্বারমাভিমুখ্যেন পূর্বস্যাং দিশি কুর্যাৎ দ্বারবৃত্ত্যা সামাজিকজনপ্রবেশার্থং। ....
এবং চতুর্দ্বারং নাট্যগৃহং, অন্যে ত্বাভ্যদ্বার...... বাহ্যেন হেতুনা অন্যদ্বাবদ্বয়ং পার্শ্বস্থিতং কুর্যাদালোকসিদ্ধ্যর্থমিতি ষড়দ্বারং নাট্যগৃহমাচক্ষতে॥" কক্ষ্যা বিভাগে দুই দ্বারের কথা বলা হয়েছে—সুতরাং এখানে জাতি বুঝাতে একবচন প্রয়োগ করা হয়েছে। 'এক' শব্দ এখানে রাশি অভিপ্রায়ে (সমষ্টিবাচক?) পাত্রপ্রবেশোপায়ন (পাত্রপ্রবেশের উপায় হিসাবে) হিসাবে ব্যবহৃত।......সুতরাং জনপ্রবেশন-দ্বারটি তৃতীয় দ্বার এবং ঐ দ্বার দিয়ে নট-নটীরা নেপথ্যগৃহে প্রবেশ করেন এবং আর একটি দ্বার সামাজিকজনপ্রবেশার্থ পূর্বদিকে—এই হ'ল মোট ৪টি দ্বার। কারো কারো মতে—দু'পাশের ২ দ্বার নিয়ে দ্বারের সংখ্যা মোট ৬॥

চতুর্থতঃ নাট্যমণ্ডপঃ দর্শকাসনের পরিচয়।

প্রেক্ষাগৃহের বিভাগ পরিকল্পনার সঙ্গে আমাদের আগেই পরিচয় হয়েছে এবং বিকৃষ্ট, চতুরস্র ও ত্র্যস্র নাট্যগৃহের মান-বৈশিষ্ট্য আমরা জেনেছি। এখানে নাট্যমণ্ডপ ও দর্শকাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভরত যা বলেছেন সেই কথা জানাচ্ছি। নাট্যমণ্ডপ সম্পর্কে ভরতের সাধারণ নির্দেশ এই—

কার্য শৈলগুহাকারো দ্বিভূমির্নাট্যমণ্ডপঃ
মন্দবাতায়নোপেতো নির্বাতো ধীরশব্দবান্।
তস্মান্নিবাতঃ কর্তব্যঃ কর্তৃভির্নাট্যমণ্ডপঃ
গম্ভীরস্বরতা যেন কুতপস্য ভবিষ্যতি।

অর্থাৎ নাট্যমণ্ডপ হবে—শৈলগুহাকার, দ্বিভূমি, অল্পবাতায়নযুক্ত, নির্বাত এবং ধীরশব্দবান।

নাট্যমণ্ডপ নির্বাত হ'লে কুতপের (সংফেটক—গায়ন-বাদক সমূহ) স্বর গম্ভীর হবে। নাট্যমণ্ডপ শৈলগুহাকার হবে এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই কিন্তু দ্বিভূমি কথাটির ব্যাখ্যা নিয়ে বেশ মতভেদ আছে। আচার্য অভিনবগুপ্ত এই অংশের টীকায় নাট্যমণ্ডপ স্থলে নাট্যপীঠ শব্দটি ব্যবহার ক'রে, বলতে হবে, একটু বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করেছেন। নাট্যমণ্ডপকে আমরা শুধু নাট্যপীঠের (মঞ্চের) আচ্ছাদন অর্থে ব্যবহার করব অথবা সমগ্র নাট্যগৃহের মণ্ডপ অর্থে ব্যবহার করব তা স্থির করে নেওয়া দরকার। টীকাকার লিখেছেন—"দ্বে ভূমী রঙ্গপীঠস্যাধস্তনোপরিতনরূপেনোতি কেচিৎ। মত্তবারণী বহির্নিগমনপ্রমাণেন সর্বতো দ্বিতীয় ভিত্তিনিবেশেন দেবপ্রাসাদাট্টালিকা প্রদক্ষিণ-সদৃশী দ্বিতীয়া ভূমিরিত্যন্যে। উপরিমণ্ডাপান্তরনিবেশনাদিত্যপরে। অদ্বিভূমিরিত্যেকে। উপাধ্যায়াস্তু বীপ্সাগর্ভং ব্যাচক্ষতে। দ্বে দ্বে ভূমী যত্র নিম্নাতে (নিম্নোন্নতে) ততোঽপ্যুন্নতা ইতি নিক্রমেণ (নিম্নোন্নতক্রমেণ) রঙ্গপীঠ নিকটাৎ প্রভৃতি দ্বারপর্যন্তং যাবদ্রঙ্গপীঠোৎসেধতুল্যোৎসেধা ভবতি। এবং হি পরস্পরানাচ্ছাদনং সামাজিকানাং।" এই টীকাংশ থেকে নিম্নলিখিত মত পাওয়া যাচ্ছে :—

১। রঙ্গপীঠের অধস্তন এবং উপরিতন এই দ্বিভূমি।

২। মণ্ডবারণীর বহির্গমন প্রমাণ অনুসারে দ্বিতীয় ভিত্তিনিবেশ করে দেবপ্রাসাদাট্টালি-কার প্রদক্ষিণভূমির মতো রঙ্গগৃহের সর্বত্র দ্বিতীয় ভূমি-নির্মাণ।

৩। এক মণ্ডপের উপরে অন্য একটি মণ্ডপ নিবেশিত করা।

৪। দ্বি ভূমি হবে না।

৫। রঙ্গপীঠের নিকট থেকে দ্বার (কোন্ দ্বার ?) পর্যন্ত রঙ্গপীঠের উচ্চতার সমান নিম্নোন্নতক্রমে ভূমি-বিন্যাস। প্রথম ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে দ্বিভূমির অর্থ দাঁড়াবে—রঙ্গপীঠের অধস্তন (প্রেক্ষকাসন যে তলে বিন্যস্ত সেইতল ?) এবং উপরিতন (রঙ্গপীঠ, রঙ্গশীর্ষ, নেপথ্যগৃহ প্রভৃতি যে তলে থাকে সেই তল ?)

দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করলে অর্থ দাঁড়াবে রঙ্গগৃহের চতুর্দিকে দেবপ্রাসাদাট্টালিকার প্রদক্ষিণসদৃশ অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে ব্যলকনি বলে ঐ ধরনের কোন দ্বিতীয়তল নির্মাণ॥ তৃতীয় অর্থ গ্রহণ করলে অর্থ দাঁড়াবে—রঙ্গপীঠের মণ্ডপ থেকে প্রেক্ষা-মণ্ডপ উন্নত বা অবনত হবে। পঞ্চম অর্থ গ্রহণ করলে—দ্বিভূমির অর্থ হবে রঙ্গপীঠের নিকট থেকে দ্বার পর্যন্ত ক্রমোন্নত সোপানাকৃতি-আসনশ্রেণীর ব্যবস্থা॥ এই পাঁচটি ব্যাখ্যার একটি ছাড়া (৪র্থ) অন্য চারিটির যে কোনটি গ্রহণ করলেই স্বীকার করতে হবে ভারতীয় নাট্যমণ্ডপের গঠনে বাস্তুবিদ্যার জ্ঞান যথেষ্ট মাত্রায় প্রযুক্ত হয়েছিল; নাট্য-গৃহকে সুগঠিত, সুদৃঢ় এবং সুদৃশ্য করবার সব উপায়ই অবলম্বিত হয়েছিল। ভূমিভাগকর্ম

ভিত্তিকর্ম, দারুকর্ম, ভিত্তিলেপকর্ম, সুধাকর্ম, চিত্রকর্ম, প্রভৃতি যাবতীয় কর্মই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হত। ইস্টকাদৃঢ় ভিত্তিকর্ম সম্পন্ন করার পরে কি কি কর্ম করতে হবে তার নির্দেশ দিতে ভরত লিখেছেন—

ভিত্তিকর্মবিধিং কৃত্বা ভিত্তিলেপং প্রদাপয়েৎ
সুধাকর্ম বহিস্তস্য বিধাতব্যং প্রযত্নতঃ
ভিত্তিষ্বথ বিলিপ্তাসু পরিমৃষ্টাসু সর্বতঃ
সমাসু জাতশোভাসু চিত্রকর্ম প্রযোজয়েৎ॥
চিত্রকর্মাণি চালেখ্যাঃ পুরুষাঃ স্ত্রীজনস্তথা
লতাবন্ধাশ্চ কর্তব্যাশ্চরিতং চাত্মভোগজম্॥

[ভিত্তিলেপ—ভঙ্গ (শঙ্খ) বালুকাশুক্তিকালেপঃ অর্থাৎ আজকে আমরা যাকে বলি প্লাস্টারিং। সুধাকর্ম—ভিত্তির বিলেপন ও পরিমার্জন। চিত্রকর্ম—বিলিপ্ত ও পরিসৃষ্ট সমতল ভিত্তির উপরে পুরুষ, নারী প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি অঙ্কন।]

এবার আসন ব্যবস্থা —"প্রেক্ষকানাং নিবেশনম্" সম্পর্কে ভরতের বক্তব্য ঃ

তত্রাভ্যন্তরতঃ কার্যারঙ্গপীঠোপরি স্থিতাঃ
দশপ্রযোক্তৃভিঃ স্তম্ভাঃ শস্তা মণ্ডপধারণে॥
স্তম্ভানাং বাহ্যতশ্চাপি সোপানাকৃতি পীঠকম্
ইষ্টকাদারুভিঃ কার্যং প্রেক্ষকানাং নিবেশনম্।
হস্ত প্রমাণৈরুৎসেধৈর্ভূমিভাগসমুত্থিতৈঃ
রঙ্গপীঠাবলোক্যং তু কুর্যাদাসনজং বিধিম্॥

'শ্লিষ্টেষ্টকাদৃঢ়' বাহ্য ভিত্তির অভ্যন্তরে, রঙ্গপীঠের উপরে দশটি শক্ত স্তম্ভ স্থাপন করবে। এই স্তম্ভগুলির বাইরে অর্থাৎ দৃষ্টিবিঘাত না ঘটে—'রঙ্গপীঠাবলোকনে সাধুভূত' এমন ব্যবধানে—সোপানাকৃতি দর্শকাসন তৈরি করবে—করবে 'ইষ্টকাদারুভি'—ইট ও কাঠদিয়ে ভূমিভাগ থেকে প্রথম আসন শ্রেণী হবে—একহাত উঁচু—যাতে রঙ্গপীঠ সহজে অবলোক্য হয় অর্থাৎ দেখা যায়। এই অংশের টীকায় বিষেশতঃ স্তম্ভস্থাপন প্রসঙ্গে আচার্য অভিনব শ্রীশঙ্কুক প্রভৃতির মতের উল্লেখ করেছেন, জনৈক 'বার্তিককৃৎ' এর বচন উদ্ধৃত করেছেন।

উপসংহারে, মত্তবারণী সম্পর্কে একটু বিশেষ আলোচনা করতে চাই। মত্তবারণী সম্পর্কে ভরত এবং অভিনবগুপ্ত প্রমুখ টীকাকারগণ যা বলেছেন তা আগেই তালিকাকারে সাজিয়ে দিয়েছি এবং এ কথাও বলেছি যে মত্তবারণীর সংস্থান, গঠন উপযোগিতা বিষয়ে টীকাকার অভিনবগুপ্ত মহাশয় সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি।

ভরত মত্তবারণী সম্পর্কে মোট এই কয়টি কথাই বলেছেনঃ—"রঙ্গপীঠের পাশে বা বেদিকার পাশে মত্তবারণী নির্মাণ করবে। মত্তবারণী হবে চতুস্তম্ভযুক্ত। রঙ্গপীঠের প্রমাণ থেকে—অধ্যর্ধহস্ত অর্থাৎ সার্ধহস্তপরিমাণ উঁচু॥ মত্তবারণী দু'টির উচ্চতার সমান উচ্চতা হবে রঙ্গমণ্ডপের।" ভরতের 'রঙ্গপীঠ প্রমাণতঃ' শব্দটির দুটি অর্থ করা হয়েছে। এক অর্থ—রঙ্গপীঠের প্রমাণ থেকে, অন্য অর্থ রঙ্গপীঠের প্রমাণ অনুযায়ী এবং সেই অর্থে মত্তবারণী হয়েছে—"অষ্টহস্তবিস্তারা সমচতুরস্রা।" 'অধ্যর্ধহস্তোৎসেধেন' কথাটির অর্থ করা হয়েছে—"সার্ধহস্তপরিমাণ উচ্ছ্রায়ঃ।" যাঁরা 'রঙ্গপীঠ প্রমাণতঃ' বলতে—'রঙ্গপীঠের প্রমাণানুসারে' বুঝেছেন তারা 'অধ্যর্ধহস্তোৎসেধেন' কথাটির অর্থ করেছেন—ব্রহ্মভূভাগাপেক্ষয়া সার্ধহস্তপ্রমাণোন্নত এবং সেই অর্থ ক'রে "উৎসেধেন তয়োস্তুল্যং কর্তব্যং রঙ্গমণ্ডপম্" এই বাক্যটির অর্থ করেছেন- মত্তবারণীর উচ্চতা রঙ্গপীঠের (রঙ্গমণ্ডপ ও রঙ্গপীঠ একই অর্থে প্রয়োগ করেছেন) উচ্চতার সমান—তস্যা এব যাবানুৎসেধ স্তাবান্রঙ্গপীঠস্য ··। কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে—রঙ্গপীঠ ও রঙ্গমণ্ডপ কি একই কথা? পীঠ ও মণ্ডপ নিশ্চয়ই সমার্থক নয় এবং তা' যদি না হয় তা'হলে মত্তবারণীর উৎসেধ হবে রঙ্গমণ্ডপের উৎসেধের তুল্য—এই কথাটির তাৎপর্য ঠিক করা দরকার। রঙ্গমণ্ডপ শব্দটি যদি রঙ্গপীঠ অর্থেই এখানে প্রযুক্ত হয়ে থাকে, তবে যাঁরা 'রঙ্গপীঠপ্রমাণতঃ' কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন—'রঙ্গপীঠাপেক্ষয়া সার্ধহস্তপরিমাণ উচ্ছ্রায়' তাঁরা মুসকিলে পড়বেন, কারণ উৎসেধেন তথোস্তুল্যং······ঐ বাক্যটীর অর্থ নিজেদের ব্যাখ্যার সঙ্গে মিলাতে পারবেন না। আবার যাঁরা রঙ্গমণ্ডপ বলতে উপরের শৈলগুহাকার আচ্ছাদন বুঝবেন তাঁরাও উক্ত পংক্তিটীর ব্যাখ্যায় মুসকিলে পড়বেন—মত্তবারণীর উৎসেধ বা উচ্চতা অনুসারে রঙ্গমণ্ডপ নির্মাণ করবে—এই কথাটীর সুব্যাখ্যা দিতে পারবেন না। হয়তো ব্যাখ্যা দিতে এমনি কিছু একটা বলতে হবে যে মত্তবারণীর চারিটী স্তম্ভ রঙ্গমণ্ডপ পর্যন্ত উঁচু করে দিতে হবে, বা মত্তবারণীর উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রঙ্গমণ্ডপের উচ্চতা নির্ধারণ করতে হবে। অবশ্য এ ব্যাখ্যা কেউই করেননি। মত্তবারণী এক মহাসমস্যা স্থল হয়ে আছে। সমস্যার সমাধান করতে অন্য পথে চেষ্টা করা যাক।

নাটকের আভ্যন্তরিক প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারলে কোন্ কাজে মত্তবারণী ব্যবহৃত হত তার একটা হদিশ পাওয়া যেতে পারে। তেমন একটী প্রমাণ পাওয়া যায়—রাজশেখর কৃত 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা' নাটকে। দ্বিতীয় অঙ্কে রাজা—বিদূষকের সংলাপে মত্তবারণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বিদূষক রাজাকে বল্ছেন—কতক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকব, আসুন মত্তবারণীতে গিয়ে বসি—"তা এহি মত্তবারণী এ উঅবিসম্ধ।" অষ্টাদশ শতাব্দীর "প্রাণ-প্রতিষ্ঠা" নামক টীকার কর্তা ঘনশ্যামের দুই স্ত্রী—সুন্দরী ও

কমলা, তাঁদের চমৎকার তরঙ্গিণী—টীকায় মত্তবারণীর অর্থ করেছেন—"মত্তবারণানি শিলাভিঃ সুধেষ্টকাভির্ম্মৃদ্বির্বানির্মিতা দীর্ঘবর্তুলকারাঃ স্থূলবেদিকা-কোণচতুষ্টয় ক্রিয়মাণাত্মা উপাধানবিশেষাঃ॥" —"উপাধান বিশেষে স্যান্নিবদ্ধে মত্তবারণম্"।

আমাদের জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় মত্তবারণীর টীকা করেছেন "মত্তবারণ্যাং কপোতপালিকায়াম্"॥

সুন্দরী ও কমলার টীকা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে মত্তবারণী বসার একটি স্থান—বেশ একটু উঁচু স্থান বা বেদিকা, যাতে দীর্ঘবর্তুলাকার শিলাময় বা ইষ্টকময় উপাধান সন্নিবদ্ধ থাকে। স্থানটি যে রঙ্গপীঠ থেকে বেশ উঁচু তা নাট্যকারের নির্দেশ থেকেই বুঝা যায়—"ইতি উভাবতরণং নাটয়তঃ"—'দু'জনে অবতরণ করলেন'। অবতরণ কথাটির টীকায় লেখা হয়েছে—'অবতরণং চতুষ্কিকা-সোপান পরম্পরায়াঃ ইতি ভাবঃ॥ টীকা থেকে মত্তবারণীর যে চেহারা ফুটে উঠেছে তা এই—রঙ্গপীঠ থেকে-চতুষ্কিকা সোপান পরম্পরা ক্রমোচ্চভাবে (অধ্যর্ধহস্তোৎসেধেন ?) চতুস্তম্ভযুক্ত উচ্চ বেদিকা পর্যন্ত উঠে গেছে; সেই বেদিকার তিন কোণের দীর্ঘ ও গোলাকার প্রস্তরময় বা সুধেষ্টকাময় উপাধান রয়েছে। (ঐ উপাধানগুলি খুব সম্ভব ঠেস দিয়ে বসার জন্য তৈরী)। বলাবাহুল্য অভিনবগুপ্তের টীকার সঙ্গে এর মিল নেই এবং ভরতের 'অধ্যর্ধহস্তোৎসেধেন' এর সঙ্গে মেলানো গেলেও, "উৎসেধেন তয়োস্তুল্যং কর্তব্যং রঙ্গমণ্ডপম্"—এর সঙ্গে মেলানো যাবে না। তা' না গেলেও, মনে হয়—সুন্দরী ও কমলার বর্ণনাই প্রয়োগের দিক থেকে বেশী গ্রাহ্য হওয়ার দাবী করতে পারে। মত্তবারণীকে আমরা রঙ্গপীঠের দুই পাশের চতুস্তম্ভযুক্ত সোপান পরম্পরা-বিশিষ্ট, গোলাকার উপাধানবেষ্টিত উচ্চ বেদিকা বা দ্বিতীয় ভূমি বলেই স্বীকার করব। খুব সম্ভব এই স্থানটি অভিনয়ের সময় বিশ্রাম, প্রাসাদারোহণ, রাজোপবেশন, নৃত্যগীতাদি দেখার সময় রাজার আসন প্রভৃতি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত।

এ পর্যন্ত যে আলোচনা করা হয়েছে তা' থেকে এ সিদ্ধান্ত অবশ্যই করা যেতে পারে যে ভরত-বর্ণিত নাট্যগৃহের—বিশেষতঃ রঙ্গপীঠ, রঙ্গশীর্ষ, নেপথ্যগৃহ এবং মত্তবারণীর সংস্থানের একাধিক সম্ভাব্য রূপ গঠন করা যেতে পারে। যাঁরা প্রাচীন ভারতের নাট্য-কলা সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান লাভ করতে আগ্রহী তাঁদের ঐ সব সম্ভাব্য রূপের "মডেল" তৈরী করবার চেষ্টা করতেই হবে। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগের 'প্রফেসর' এবং চারুকলা বিভাগের ডীন নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সম্ভাব্য রূপের একটি মডেল তৈরি করা হয়েছে বটে, কিন্তু সব রকম সম্ভাব্য রূপের মডেল তৈরী করার কাজে এখনও হাত দেওয়া সম্ভব হয়নি। বলাবাহুল্য হাত দেওয়ার সময় এসেছে। আশা করি, অনতিবিলম্বেই আমরা এ বিষয়ে যা করণীয় তা করতে পারব।

মঞ্চকলা ও রবীন্দ্রনাথ

ধীরেন দেবনাথ

মঞ্চকলার এই ক্রমোন্নতির যুগে মঞ্চকলা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবটি নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে। মঞ্চকলা (Stage-craft) শব্দটি ব্যাপক অর্থেই প্রযোজ্য। শুধু দৃশ্যপটই নয়, আনুষঙ্গিক মঞ্চসজ্জাব্যবস্থাও এর অন্তর্ভুক্ত, যদিও থিয়েটারের প্রথম যুগে দৃশ্যপটের সমারোহটাই মঞ্চসজ্জার প্রধানতম উপকরণ ছিল বলা যেতে পারে। কল্‌কাতার সাধারণ ও সৌখীন রঙ্গালয়গুলিতেও প্রথম দিকে একমাত্র দৃশ্যপটের সাহায্যেই নাটকোল্লিখিত বিভিন্ন দৃশ্যের সংস্থান বোঝানো হোত। কল্‌কাতার অনুকরণে মফঃস্বলের রঙ্গালয়েও দৃশ্যপটের প্রাধান্য অব্যাহত ছিল এই সেদিনও। যেহেতু অধিকাংশ নাটকের দৃশ্যসংস্থান ছিল প্রায় একজাতীয়, কয়েকটি দৃশ্যপটের সাহায্যেই—যথা, রাজপথের দৃশ্য, ধনীর প্রাসাদ, দরিদ্রের কুটির, সমুদ্রতীর, বনপথ ইত্যাদি—নাট্যাভিনয় সুসম্পন্ন হোত। কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক দৃশ্যপটটি পাওয়া না গেলে অনুরূপ দৃশ্যপটের সাহায্যে কাজ চালিয়ে নেওয়া হোত।

দৃশ্যপটের ব্যবহারে কতকগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। ঘূর্ণ্যমান রঙ্গমঞ্চের অভাবে একটি দৃশ্যের অভিনয়শেষে পরবর্তী দৃশ্যের অভিনয় আরম্ভ করতে কিছু সময় লাগবেই। ড্রপসিন ফেলতে হবে; আগের দৃশ্যে ব্যবহৃত দৃশ্যপটটি তুলে ফেলতে হবে প্রয়োজনবোধে এবং নতুন দৃশ্যপট নামাতে হবে। এছাড়া দৃশ্যানুযায়ী অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন টেবিল, চেয়ার, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি সাজাবার জন্য অথবা সরিয়ে ফেলবার জন্যও কিছু সময় লাগে। পূর্বপ্রস্তুতি যতই থাক, যে-সব দৃশ্যে প্রচুর মঞ্চোপকরণের প্রয়োজন, সেখানে দুই দৃশ্যের মধ্যবর্তী বিরতি দীর্ঘ হতে বাধ্য—যা প্রায়শঃই দর্শকের পক্ষে বিরক্তিকর। (ঘূর্ণ্যমান রঙ্গমঞ্চে অবশ্য এক দৃশ্যের অভিনয় চলাকালীন পরবর্তী দৃশ্যের জন্য তৈরি থাকার সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু সংখ্যাল্পতার দরুণ হিসাব থেকে এদের বাদ দেওয়া চলে।)

নাটকোল্লিখিত পরিবেশটি যথাযথ সৃষ্টি করার জন্যই মঞ্চকলার প্রয়োগ। আনুষঙ্গিক উপকরণের প্রশ্নটি পরে বিবেচনা করা যাবে। প্রথমে আলোচনা করা যাক্‌—দৃশ্যপটের ব্যবহারে পরিবেশ কতটা বাস্তবানুগ হয় এবং যে-সব নাট্যাভিনয়ে দৃশ্যপট বর্জন করা হয়, সেখানে নাট্যপরিবেশ সৃষ্টি কি পরিমাণে বাধাগ্রস্ত হয়।

প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে অভিনয়ের উদ্দেশ্যই হোল illusion বা দৃষ্টিবিভ্রম সৃষ্টি করা। অভিনেতা-অভিনেত্রী তাঁদের সাজসজ্জায়, চালচলনে, সংলাপোচ্চারণে অভিনীত চরিত্রকেই প্রত্যক্ষ করে তুলতে চান। অর্থাৎ যিনি রামচন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করছেন, তাঁকে ব্যক্তি হিসাবে আমি চিনতেও পারি, না-ও পারি। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি রামচন্দ্রের ভূমিকায় মঞ্চোপরি অবতীর্ণ হলেন, তখন পোষাকে, ব্যবহারে, কথোপকথনে তিনি দর্শকদের মনে কল্পলোকের রামচন্দ্রকেই প্রতিষ্ঠিত করে তুলবেন। এই উদ্দেশ্যপূরণে কিছু কৃত্রিমতার আশ্রয় তাঁকে গ্রহণ করতেই হবে। বিশেষ ধরনের পোষাকপরিচ্ছদ তাঁকে ব্যবহার করতে হচ্ছে। সাধারণতঃ তিনি যে ভাবে কথা বলেন, অভিনয়ের সময়ে তিনি সে ভাবে কথা বলবেন না; চরিত্রানুযায়ী সংলাপ, আবার প্রতিটি সংলাপানুযায়ী তাঁর উচ্চারণ ও চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যুদ্ধের দৃশ্যে তাঁকে তরবারি ব্যবহার করতেও দেখা যাচ্ছে,—সেখানে তাঁর শুধু হাত ঘোরানোকে তরবারি চালনা বলে মেনে নিই না। দর্শকদের দৃষ্টিবিভ্রম সৃষ্টির জন্য তাঁকে এই সব উপকরণের সাহায্য নিতে হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হোল—দৃশ্যপটও কি এই বিভ্রমসৃষ্টির অন্যতম উপকরণ হিসাবে গণ্য হবে? নাট্যোল্লিখিত পরিবেশরচনায় তার কি কোনো স্থান আছে? না, মঞ্চকলার অন্যান্য উপকরণের সাথে তুলনায় সে প্রক্ষিপ্ত?

এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য শোনা যাক্ প্রথমে ঃ—

"আধুনিক নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষি। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত। ···নাট্যকাব্য দর্শকের কল্পনার উপর দাবি রাখে, চিত্র সেই দাবিকে খাটো করে, তাতে ক্ষতি হয় দর্শকেরই। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল; দৃশ্যপটটা তার বিপরীত; অনধিকার প্রবেশ করে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক, মূঢ়, স্থাণু; দর্শকের চিত্তদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ করে রাখে। মন যে-জায়গায় আপন আসন নেবে সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে, কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না। এই জন্যই যে নাট্যাভিনয়ে আমার কোনো হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো-নামানোর ছেলেমানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিই নে। কারণ বাস্তব সত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাবসত্যকেও বাধা দেয়।"

('তপতী' নাটকের ভূমিকা)

আজ থেকে ৩৪ বৎসর আগে লিখিত এ মন্তব্যে রবীন্দ্রনাথের মতটি স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ। দৃশ্যপটের সাহায্যে বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টাকে তিনি বলেছেন ছেলেমানুষি। এ কৃত্রিমতায় দর্শকের কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটে না, ফলে দর্শক থাকে নিষ্ক্রিয়। যে দৃষ্টিবিভ্রম সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দর্শক ও অভিনেতার একাত্মীকরণ ঘটে, এই দৃশ্যপটের কৃত্রিমতাই সে পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই দৃশ্যপট বরং না থাকলে (যেমন যাত্রাভিনয়ে) দর্শক নিজেই অভিনয় থেকে দৃশ্যসংস্থানটি কল্পনা করে নিতে পারতো এবং এর ফলে পূর্বোল্লিখিত একাত্মীকরণের কাজটিও সহজ হয়ে যেত। দর্শক যেখানে অভিনয় দেখে ভাবছে, অর্থাৎ অভিনয় যেখানে তাকে ভাবিয়ে তুলছে, সেখানেই তো অভিনয়ের উদ্দেশ্য সার্থক, বিভ্রমসৃষ্টির আয়োজন সফল।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ বল্‌ছেন :—"(ছবিটা) অভিনেতার পশ্চাতে ঝুলিতে থাকে, অভিনেতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তোলে না ; তাহা আঁকা মাত্র ; আমার মতে তাহাতে অভিনেতার অক্ষমতা কাপুরুষতা প্রকাশ পায়। এইরূপে যে উপায়ে দর্শকদের মনে বিভ্রম উৎপাদন করিয়া সে নিজের কাজকে সহজ করিয়া তোলে, তাহা চিত্রকরের কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া আনা। তাছাড়া, যে দর্শক তোমার অভিনয় দেখিতে আসিয়াছে তাহার কি নিজের সম্বল কানা কড়াও নাই। সে কি শিশু। বিশ্বাস করিয়া তাহার উপরে কি কোনো বিষয়ে নির্ভর করিবার জো নাই!" (রঙ্গমঞ্চ—১৩০৯ সাল)

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও নাট্যাভিনয়ে দৃশ্যপটের ব্যবহার রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর বহু অভিনয়ে দৃশ্যপট বর্জন করেন নি। 'রবীন্দ্রনাথ প্রথম যখন নাট্যজগতে প্রবেশ করেন, তখন দৃশ্যপটকে অবহেলা করেন নি। হয় তো ও-সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মতামত তখনও দৃঢ়ীভূত হয়ে ওঠেনি, কিংবা ওদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া তিনি দরকার মনে করেন নি। তারপর অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সেও 'বিসর্জন" প্রভৃতি নাটকেও তিনি দৃশ্যপটের সামনে দাঁড়িয়েই অভিনয় করেছিলেন। ১৩০৯ সালে পূর্বোক্ত মত প্রকাশের পরেও অনেককাল পর্যন্ত তিনি দৃশ্যপট বর্জন করেন নি। ১৩২২ সালে "ফাল্গুনী" নাট্যাভিনয়ে এবং তারপরে "ডাকঘরে"র সময়েও তাঁর অনুষ্ঠানে দৃশ্যপট ব্যবহৃত হয়েছিল .... যদিও সেই সব দৃশ্য-সংস্থানের সঙ্গে থিয়েটারের তথাকথিত "সিনসিনারি"র পার্থক্য ছিল আসমান-জমিন। সুদীর্ঘকাল পরে ১৩৩৬ সালে "তপতী" নাট্যাভিনয়ে........ মঞ্চসজ্জা ছিল, কিন্তু পট পরিবর্তন হয়নি।' [১]

দৃশ্যপটের এই ব্যবহার থেকে মনে করে নিতে বাধা নেই যে, এর কিছু উপযোগিতা আছে। দু'টি দৃশ্য সংস্থানের মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে এর চেয়ে সহজ

১ হেমেন্দ্রকুমার রায়—সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ: পৃষ্ঠা ১৪৪।

উপায় আর কিছু নেই। অবশ্য সচেতন নাট্যকার সংলাপের মধ্য দিয়ে দৃশ্যান্তরের ইঙ্গিত দিতে পারেন, বিশেষ একটি দৃশ্যনির্দেশ দিতে পারেন। যেখানে দৃশ্যপট বর্জন করা হবে, সেখানে নাট্যকারকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই এ কাজ করতে হবে। সেটা কি সর্বত্র স্বাভাবিক হবে? আর দৃশ্যপটের ব্যবহারমাত্রেই তুলনায় কৃত্রিম বলে বিবেচিত হবে? অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দৃশ্যপট-সংকেতিত পরিবেশকে কি জীবন্ত করে তোলা যায় না? পিছনে-ঝোলানো আঁকা-ছবিটাকে কি সৃষ্টি করে তোলার জাদুমন্ত্র নেই অভিনেতার আয়ত্তে? আর সেই জাদুমন্ত্র যদি জানা না থাকে, তবে কেবলমাত্র দৃশ্যপটের বর্জনেই কি দর্শকের কল্পনা সক্রিয় হয়ে উঠবে? আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ দৃশ্যপট ব্যবহারের বাড়াবাড়িকেই বর্জন করতে চেয়েছেন। ইয়োরোপীয় থিয়েটারের অনুকরণে একদিন আমাদের দেশের রঙ্গালয়গুলিতেও দৃশ্যপটের বৈচিত্র্যের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছিল। সত্যিকারের ভালো নাটকের উপস্থাপনা ও ভালো অভিনয় এগুলি গৌণ হয়ে উঠছিল। এমন দর্শকেরও অভাব ছিল না, "যারা কেবল 'সিন-সিনারির' চমৎকারিত্ব দেখবার লোভে রঙ্গালয়ের দিকে ধাবমান।"[২] কর্তৃপক্ষও দর্শকের এই মনোভাবের সুযোগ নিয়ে দৃশ্যপটের ব্যাপারে বিস্তর আড়ম্বর করতেন। রবীন্দ্রনাথের শিল্পিমানস কখনই এ অবস্থাকে সমর্থন জানাতে পারে না। দৃশ্যপটের আত্যন্তিক ব্যবহারের জন্য অনেক সময়েই দর্শককে বিরক্তিকর ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হোত দৃশ্যপট ওঠানো-নামানোর ব্যাপারে। রসসৃষ্টিতে এ ব্যাঘাত ঘটায় নিঃসন্দেহে। তাই দৃশ্যপটকে সহজ সরল করে স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অন্ধ বিলিতি অনুকরণের মোহ তিনি ত্যাগ করতে চেয়েছেন। তাঁর নিজের মঞ্চাভিনয়ের বহু নজির টেনে এর সমর্থন করা যায়।

বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার। আলোচনার পরবর্তী অধ্যায়ে প্রবেশের পূর্বে ঠাকুরপরিবার-আয়োজিত বিভিন্ন মঞ্চসজ্জার উল্লেখ করা যেতে পারে: "সেবার মেজো জ্যেঠামশায় বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' অভিনয় হবে। ...হ. চ. হ. এলেন। সেবারে তাঁর উপরে ভার পড়ল ষ্টেজ সাজাবার। কোত্থেকে দুটো তুলোর বক কিনে এনে গাছে বসিয়ে দিলেন, বললেন ক্রৌঞ্চ-মিথুন হল। খড়ভরা একটা মরা হরিণ বনের এক কোণে দাঁড় করিয়ে দিলেন, সিন আঁকলেন কচুবনে বন্য বরাহ লুকিয়ে আছে, মুখটা একটু দেখা যাচ্ছে। সেটা বরাহ কি ছাগল ঠিক বোঝা যায় না। আর বাগান থেকে বটের ডালপালা এনে লাগিয়ে দিলেন।" (অবনীন্দ্রনাথ—ঘরোয়া)

২ হেমেন্দ্রকুমার রায়—সৌখিন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ: পৃষ্ঠা ১৩১।

"………সেবারে ('কালমৃগয়া' অভিনয়ে) জ্যোতিকাকামশায়ের সত্যিকারের একটা পোষা হরিণ বের করে দেওয়া হল স্টেজে।" (ঐ)

"আগেই বলেছি আমাদের রূপসজ্জা মঞ্চসজ্জা অনেকটা বিলিতী অনুকরণে হ'ত।… বাস্তবের যথাসাধ্য অনুকরণ করাই ছিল তখনকার আদর্শ। 'বাল্মীকি প্রতিভা'র অভিনয়ে দিনুর ঘোড়া নিয়ে স্টেজে ঢোকা, আর 'রিমঝিম্' গানের সঙ্গে অরুদাদার টিনের নল ফুটো করে বৃষ্টি নামানোর কথা অবনদাদা তো বলেছেনই।"

(ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী—রবীন্দ্রস্মৃতি)

"এমন সুন্দর মঞ্চসজ্জা ('ডাকঘর' অভিনয়ে) অন্তত আমাদের চোখে তার আগে কখনও পড়েনি। তখনকার 'বিচিত্রা' ঘরের শেষে মঞ্চটি বাঁধা হয়, ঠিক একটি পল্লী-গ্রামের মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘর অনুকরণ করে। সেই চালের খড় পর্যন্ত স্টেজের সামনে থেকে বার করে দেওয়া হয়েছিল। ঐ ঘরেই ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষ্যে কাছাকাছি ছয়বার এই নাটকটি অভিনীত হয়। আমার চোখে ঘরটি এত সুন্দর লেগেছিল যে মনে হয়েছিল কখনও ঘরটি না ভাঙলেই ভালো হয়।" (ঐ)

রবীন্দ্রনাথ নিজেও মঞ্চকলার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন নি। মঞ্চসজ্জার মধ্যে যে বাস্তবতাসৃষ্টির অতিরিক্ত মাত্রায় হুজুগ দেখা যায়, তাকেই তিনি নিন্দা করেছেন। কারণ, এ সত্য তো অস্বীকার করবার উপায় নেই, কেবলমাত্র পর্দার গায়ে ছবি এঁকেই দৃশ্য তৈরী করা যায় না; কেবলমাত্র মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত বা আবহ-সঙ্গীতের দ্বারাই পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। অভিনয় যদি দর্শকের মনের মধ্যে সেই বিশেষ দৃশ্য বা বিশেষ পরিবেশটি গড়ে তুলতে না পারে, তাহলে এ সব আয়োজন ব্যর্থ হবে—নাটকের অঙ্গীভূত হতে না পেরে এরা চিরকাল কৃত্রিম ও জড় হয়েই থাকবে। এই সম্ভাবনার দিকেই রবীন্দ্রনাথ অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন। বাস্তবধর্মী পরিবেশসৃষ্টির অসঙ্গত প্রবণতা সম্পর্কে আজ থেকে ষাট বছর আগে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :—

"দুষ্মন্ত গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া সখীদের সহিত শকুন্তলার কথাবার্তা শুনিতেছেন। অতি উত্তম। কথাবার্তা বেশ রসে জমাইয়া বলিয়া যাও। আস্ত গাছের গুঁড়িটা আমার সম্মুখে উপস্থিত না থাকিলেও সেটা আমি ধরিয়া লইতে পারি, এতটুকু সৃজনশক্তি আমার আছে।……………… মালিনী যখন তাহার পুষ্পবিরল বাগানে ফুল খুঁজিয়া বেলা করিয়া দিতেছে, তখন সেটাকে সপ্রমাণ করিবার জন্য আসরের মধ্যে আস্ত আস্ত গাছ আনিয়া ফেলিবার কী দরকার আছে। একা মালিনীর মধ্যে সমস্ত বাগান আপনি জাগিয়া ওঠে। তাই যদি না হইবে, তবে মালিনীরই বা কি গুণ, আর দর্শকগুলোই বা কাঠের মূর্তির মতো কী করিতে বসিয়া আছে।" (রঙ্গমঞ্চ)

কিন্তু আজকের দিনে এই 'আস্ত গাছের গুঁড়িটা' দেখাবার প্রলোভন সামলাতে পারছেন না অনেক প্রযোজক-পরিচালক। যান্ত্রিক কলাকৌশলের উন্নতির সাথে সাথে এখন আর মঞ্চে কোনো কিছু প্রত্যক্ষভাবে দেখানো অসম্ভব, এটা আর নেপথ্য-শিল্পীরা স্বীকার করতে চান না। আলোকশিল্পীর তাই আজ প্রচুর প্রতিপত্তি।

মঞ্চাভিনয়ের প্রথম যুগে মঞ্চের সঙ্গে খুব বেশি যান্ত্রিক কলাকুশলী সংযুক্ত থাকতেন না। তখন মুখ্য অংশ ছিল পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, সুরকার ও নৃত্যপরিচালকদের। চলচ্চিত্রের প্রসারের প্রথম দিকেও আমরা একথা মনে করে আশ্বস্ত থেকেছি যে, চলচ্চিত্রে যে-জাতীয় দৃশ্য দেখানো সম্ভব, মঞ্চে তা' সম্ভব নয়। মঞ্চাভিনয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীকে কেবলমাত্র কণ্ঠস্বর ও ভাবভঙ্গীর উপরেই নির্ভর করতে হোত এবং অভিনয়ের সাময়িক সাফল্যও নির্ভর করত এঁদের সাফল্যের পরে। কিন্তু ক্রমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। নাট্যসংলাপের মধ্যে সূক্ষ্ম ইঙ্গিতধর্মিতা আরোপিত হোল; মঞ্চসজ্জার মধ্যে এল জটিলতা। অভিনেতাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল আলোর মায়া ও দর্শকের দৃষ্টিবিভ্রমকারী মঞ্চপরিবেশ। রঙ্গালয়ের অস্তিত্বের পক্ষে এ-সব পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হয়েই দেখা দিচ্ছিল। মঞ্চ-মালিক দেখলেন ক্রমবর্ধমান চলচ্চিত্রের সাথে প্রতিযোগিতা করে টিঁকে থাকতে গেলে নানাদিকে পরিবর্তন প্রয়োজন। অভিনয়ের সময় সংক্ষেপ (২½ ঘণ্টার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ নাটকের অভিনয়), সুলভ দর্শনীর হার, যান্ত্রিক কলাকৌশলের উন্নততর প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়ের কথা এ প্রসংগে স্মর্তব্য। যে সব দৃশ্য এতদিন কেবলমাত্র চলচ্চিত্রের পর্দাতেই দেখানো সম্ভব বলে মনে করা হোত, আজ মঞ্চেও সে দৃশ্যের আবির্ভাব ঘটছে। চলচ্চিত্রে যে সব বা যে ধরনের নেপথ্যশিল্পী যুক্ত থাকেন, রঙ্গালয়েও আজ তাঁদের দেখা যাচ্ছে। সুতরাং মৌলিক প্রভেদের প্রশ্ন বাদ দিলে সাধারণভাবে চলচ্চিত্র ও মঞ্চের মধ্যকার পার্থক্য ক্রমশঃ অবলুপ্ত হয়ে চলেছে। এছাড়া, অর্থবিনিয়োগের প্রশ্নটিও রয়েছে। আগেকার দিনের তুলনায় এখনকার মালিকরা অনেক বেশি টাকা খরচ করছেন একটি বইয়ের প্রযোজনায়। অবশ্য এখন একটি বই চলেও দীর্ঘকাল। (সাধারণ রঙ্গালয় সম্পর্কেই এ মন্তব্য।) বর্তমানকালের রঙ্গালয়গুলির স্বত্বাধিকারীদের ব্যবসায়ী বুদ্ধিও যথেষ্ট বেশি—তাঁরা অত্যন্ত সচেতন ও সজাগ। ব্যবসায়িক সাফল্যের আশায় তাঁরা নাট্য-প্রযোজনায় অর্থ ব্যয়ে অক্ষমও নন্, কুণ্ঠিতও নন্। সুতরাং মঞ্চকলার ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা আধুনিককালে সহজ হয়ে এসেছে।

এককালে অভিনেতা শুধু তাঁর অভিনয়ের সাহায্যেই দর্শককে পরিতৃপ্ত করতেন। কিন্তু আজ মঞ্চকলা তাঁর সহায়তা করছে। উদ্দেশ্য সেই একই—দর্শকের দৃষ্টিবিভ্রম

ঘটানো। প্রশ্ন উঠবে—আগে তো মঞ্চকলার সাহায্য না নিয়েই বা স্বল্প সাহায্যেই নাট্যাভিনয় সার্থক হোত ; তবে ইদানীং মঞ্চকলার দিকে এত দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে কেন? ইতিপূর্বেই আমরা সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এছাড়া আরও বলা চলে যে, মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির সাথে সাথে তার রুচিরও পরিবর্তন ঘটে। আগের দিনের দর্শককে যা' দিয়ে ভোলানো যেত, এখন আর তা' সম্ভব নয়। দর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদগ্ধ সমালোচকের সংখ্যাও বাড়ছে। তাঁদের খুশী করবার জন্য নাট্যসাহিত্যেরও যেমন পরিবর্তন ঘটছে, নাট্য-উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও তেমনি পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। চলচ্চিত্রের সাথে প্রতিযোগিতার প্রশ্ন তো রয়েছেই। এছাড়া রয়েছে সমসাময়িককালের অন্যান্য রঙ্গালয়ের প্রভাব। আগের দিনে ক্ষুদ্র এক গণ্ডীর অভিজ্ঞতাই ছিল আমাদের পুঁজি। তুলনামূলক বিচারের তাগিদ বা সুযোগ ছিল না তেমন। কিন্তু আজ নিঃসন্দেহে অভিজ্ঞতার পরিধি বেড়েছে। মঞ্চকেও তাই নতুনতর সজ্জা গ্রহণ করতে হয়েছে। আর্থিক ঝুঁকি নিতেও সে গররাজী নয়।

কিন্তু এ হোল প্রশ্নের একদিক। অপর দিকটি হোল—মঞ্চকলার ব্যাপক প্রয়োগের প্রয়োজন স্বীকার করে নিলেও একথা কি বলা চলে যে, মঞ্চকলার প্রয়োগ সর্বত্রই যথাযথ ও রীতিসম্মত? রবীন্দ্রনাথ যে আশংকা প্রকাশ করেছেন তা কি নিতান্তই অমূলক?

অভিনয় দেখে তার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটুক, দর্শক এটাই চায়। নাটকের সাথে সে একাত্ম হতে চায়, সে বিশ্বাস করতে চায় যে তার সামনে অভিনীত অতীতের ঘটনা বা কল্পনার সৃষ্টি জীবন্ত সত্যের মূর্তিতে দেখা দিয়েছে। এজন্য অভিনেতা-অভিনেত্রী, মঞ্চশিল্পী, সুরকার, পরিচালক সকলেই স্ব স্ব ভূমিকায় দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। পরিবেশের বাস্তবতা সৃষ্টি নিশ্চয়ই প্রয়োজন; কিন্তু সেটা সেই পরিমাণে প্রয়োজন যতটা নাট্যরসকে ক্ষুণ্ণ না করে; অর্থাৎ নাটককে ছাপিয়ে মঞ্চকলা যেন কখনই বড় হয়ে না ওঠে। অভিনয়ান্তে যান্ত্রিক কলাকৌশলের প্রয়োগসাফল্যই যদি দর্শকের মন দখল করে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে নাটককে ছাপিয়ে উঠেছে মঞ্চকলা। আর নাট্যাভিনয়ের আসল উদ্দেশ্যই সেখানে ব্যর্থ হয়েছে। অবশ্য এ প্রসংগে একটি সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না—মঞ্চাভিনয় সম্পর্কে আমাদের বহুদিনের অভ্যস্ত ধারণায় আধুনিক কলাকৌশল প্রথমেই একটি প্রবল ধাক্কা দেয়। যেখানে দর্শক আগে থাকতেই ধারণা করে বসে আছে যে অমুক ধরনের দৃশ্য মঞ্চে দেখানো সম্ভব নয়, সেখানে হঠাৎ সেই ধরনের দৃশ্য দেখলে অনভ্যস্ত চোখে ও মনে কলাকৌশলের প্রয়োগটাই প্রধান হয়ে দেখা দেয়। এ সম্ভাবনা অবশ্য ক্রমে ক্রমে দূর হয়ে যাবে।

আর তখনই নাটকের প্রকৃত বিচার সম্ভব। আজকের দিনে তাই কোন দর্শক যদি অভিনয় দেখে বলেন—'বাঃ! কি অদ্ভুত সব দৃশ্য দেখিয়েছে।'—তা থেকে সাথে সাথেই এ সিদ্ধান্তে আসা সঙ্গত হবে না যে অভিনয় সেখানে অসার্থক বা নাটক ব্যর্থ। কারণ উক্ত দর্শকের অনভ্যস্ত চোখে এ জাতীয় কলাকৌশল বিস্ময়ের প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে ; তিনি এখনও নিরপেক্ষ নিরাবেগ সমালোচক হয়ে উঠতে পারেননি।

নাট্যাভিনয়ের আদিতে নাটকবিচারের যে মানদণ্ড ছিল, সেই মানদণ্ডই সর্বকালীন। নাটক ও তার অভিনয়—এদের সুসমঞ্জস মিলনেই সার্থক নাট্যাভিনয়। অর্থাৎ নাটকের মধ্যে নাটকত্ব থাকা চাই, অভিনয়ের মধ্যে অভিনয় থাকা চাই—যে নাটকীয়ত্ব ও যে অভিনয়ের স্মৃতি দর্শকমানসে অমর হয়ে থাকবে এবং স্মৃতিচারণার প্রতিটি অবসরক্ষণই এর উল্লেখমাত্রে আনন্দময় হয়ে উঠবে। নাটক যে প্রধানতঃ দৃশ্যকাব্য, সার্থক অভিনয়ের উপরেই যে এর সার্থকতা নির্ভরশীল, এ সত্যকে স্বীকার করেই নিতে হয়। Gordon Craig-এর উক্তি স্মরণযোগ্য—"A drama is not to be read, but to be seen upon the stage." (*On the Art of the Theatre : p.* 140) অভিনয়সার্থকতার জন্যই মঞ্চকলার আবির্ভাব। নাটকের প্রয়োজনেই বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে মঞ্চকলার আরও ব্যাপক ও উন্নততর প্রয়োজন ঘটবে। কিন্তু নাটক ও অভিনয়ের সঙ্গে মিলে তাকে সহাবস্থান করতে হবে, কোথাও তাকে প্রধান হয়ে উঠলে চলবে না। মঞ্চকলার অতিরিক্ত ও অসংগত প্রয়োগে নাটকের গতি শ্লথ হয়ে যায়, কখনও বা নাটককে জটিল করে তোলে—বর্তমান কালের বহু দর্শকেরই এ অভিজ্ঞতা আছে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম ইঙ্গিতধর্মিতা অসহায় দর্শকের চিত্তবৃত্তিকে বিকেন্দ্রিক করে তোলে, নাট্যাভিনয়ের স্বাভাবিক রসগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতাকে লোপ করে দেয়। তখন সে নাটকের অভিনয় দেখবে, না যান্ত্রিক কলাকৌশল বুঝবার চেষ্টা করবে? দর্শকদের একটি বৃহৎ সংখ্যাই যে চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে সাধারণ স্তরের, একথাটি সব সময়ে মনে রাখতে হবে। মঞ্চশিল্পী যেন এঁদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে মন ভোলাবার চেষ্টা না করেন। রবীন্দ্রনাথের সতর্কবাণী স্মরণ করা যাক্ :—

"মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, জটিলতা অক্ষমতারই পরিচয়; বাস্তবিকতা কাঁচপোকার মতো আর্টের মধ্যে প্রবেশ করিলে তেলাপোকার মতো তাহার অন্তরের সমস্ত রস নিঃশেষ করিয়া ফেলে এবং যেখানে অজীর্ণবশতঃ যথার্থ রসের ক্ষুধার অভাব সেখানে বহুমূল্য বাহ্য প্রাচুর্য ক্রমশই ভীষণ বাড়িয়া চলে—অবশেষে অন্নকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া চাটনিই স্তূপাকার হইয়া উঠে।"

এখন একটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যাক্। বহুমূল্য বাহ্য প্রাচুর্য অর্থাৎ প্রচুর অর্থব্যয়ে মঞ্চকলার আড়ম্বরের এ আয়োজন কেন? একদল বলবেন—নাটকের প্রয়োজনেই এর সৃষ্টি। এ আড়ম্বর নয়, এ অভিনয়ের অপরিহার্য অঙ্গ। দর্শকের চিন্তা, বুদ্ধি ও রুচির পরিবর্তনের সাথে সাথে মঞ্চসজ্জাব্যবস্থাতেও এ পরিবর্তন স্বাভাবিক, অনিবার্য। আগের দিনের মঞ্চোপকরণ দিয়ে আজকের দর্শকের মনোরঞ্জন অসম্ভব। তাছাড়া, দৃশ্যপট ও মঞ্চকলার অন্যান্য উপকরণ বর্জনে দর্শকের কল্পনা-শক্তির প্রসার ঘটবে ও সে নাটকের সাথে একাত্ম হয়ে উঠবে—একথাও এঁরা বিশ্বাস করেন না। দর্শকের কল্পনা আজ এই সব উপকরণকে স্বীকার করে নিয়ে নতুন পথে সক্রিয় হয়ে উঠবে এই এঁদের বিশ্বাস। প্রতিপক্ষ বলেন—আগের দিনে যখন এসব বাদ দিয়েও ভালো নাট্যাভিনয় হোত, তখন এখনই বা এর প্রয়োজন কি? আমাদের মত দরিদ্র দেশে মঞ্চের আর্থিক সঙ্গতির দিকটিও কি দেখা দরকার নয়? মঞ্চকলার অবিশ্বাস্য অগ্রগতির সাথে সাথে সার্থক নাটকরচনা ও সার্থক অভিনয় কি ক্রমশঃ দুর্লভ হয়ে উঠছে না? নিকৃষ্ট নাটকও অত্যন্ত সাধারণ স্তরের অভিনয়ও কি ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করছে না আজকের এই মঞ্চমায়ার যুগে? এর জন্য দায়ী হচ্ছে যান্ত্রিক কলাকৌশলের অভিনব প্রয়োগ—এঁদের অভিযোগ হোল এই।

এ সম্পর্কে বলা চলে বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির যুগে মঞ্চশিল্পীদেরও পিছিয়ে থাকবার উপায় নেই। চলচ্চিত্রের প্রতিযোগিতার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

অবশ্য এ বিষয়ে সতর্ক হবার প্রয়োজন রয়েছে নিশ্চয়ই। রবীন্দ্রনাথের সতর্কবাণী স্বল্প পরিসরে তার চরমতম অভিব্যক্তি। তবে আশার কথা হোল এই যে, সব ব্যাপারেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন দর্শকসম্প্রদায়। প্রকৃত নাটকীয় রসে দীন যে নাটক অথবা অভিনয় যেখানে দর্শকের চিত্ত উন্মথিত, আলোড়িত করে তোলে না, সেখানে কোনো যন্ত্রের কলাকৌশলই তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। কখনো কখনো ব্যবসায়িক সাফল্য-অর্জন হয়ত অসম্ভব নয়, কিন্তু সে নিতান্তই সাময়িক, দীর্ঘস্থায়ী কখনই নয়। এ অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে যে, অভিনয় যেখানে সার্থক, সেখানে কলাকৌশলের কথা মনেই আসে না, দৃশ্যপটের চমৎকারিত্বও মন জুড়ে থাকে না। আবার নাট্যাভিনয় যেখানে অসফল, সেখানে চটকদার মঞ্চকৌশলও দর্শকের মন ভরিয়ে তুলতে পারে না। সুতরাং মঞ্চকলাকে বাঁচতেও হবে নাট্যাভিনয়কে কেন্দ্র করে—তাকে ছাপিয়ে নয়,—আবার মঞ্চকলাকে এগিয়ে যেতে হলেও যেতে হবে নাটকেরই প্রয়োজনে।

রবীন্দ্র ভারতীতে

নতুন পাঠক্রমের উদ্বোধন

গ্রন্থনায়—**সবিতা মুখোপাধ্যায়**

রবীন্দ্র ভারতীর শিক্ষণ-প্রকল্পের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা হোল ত্রিবার্ষিক স্নাতক পাঠক্রমের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। গত তেরোই আগষ্ট সকাল এগারোটায় মঞ্চগৃহে শিক্ষা বিভাগ ও প্রশাসনিক বিভাগের সকল কর্মী এবং বর্তমান ও নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতিতে এই উদ্বোধন-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হোল। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রদ্ধেয় উপাচার্য মহাশয়। প্রথমেই তিনি সমবেত সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানিয়ে ভাষণ সুরু করে বললেন ঃ

আজ থেকে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হোল। এটা খুবই আনন্দের কথা যে এক বছরের শিশু প্রতিষ্ঠানে আজ আমরা নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা, নতুন পাঠক্রমের প্রবর্তন করতে পেরেছি। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্ফুট করার প্রচেষ্টা, কিন্তু পুরোনোকে সম্পূর্ণ বর্জন করে নয়। নতুন ও পুরাতনের যথাযথ পরিচয় দরকার। দরকার ওরিয়েন্টেশনের।

তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিশ্লেষণ করে বলেন—ইংরেজরা শেকস্‌পীয়রকে যে চোখে দেখেন রবীন্দ্রনাথকেও আমরা তেমনিভাবে দেখি। কথায় আছে কোন ইংরেজকে যদি বলা হয় সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য একদিকে আর শেকস্‌পীয়রকে অন্যদিকে—এ দুয়ের কোনটি ছাড়তে রাজী আছো? তার জবাব হোল শেকস্‌পীয়র থাক, সাম্রাজ্য চুলোয় যাক। রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবনে আমাদের ভাবধারার সঙ্গে তেমনি একাত্ম হয়ে মিশে গেছেন। তাঁকে ছাড়া আমাদের শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির রূপ পঙ্গু হয়ে পড়বে। সে দুর্দিনের কথা আমরা ভাবতেও ভীত হয়ে পড়ি। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি ও সৃষ্টি উপযুক্ত সংরক্ষণ-ব্যবস্থার অভাবে যদি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায় তাহলে সত্যিই আমাদের জাতীয় জীবনে দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে। এ আশঙ্কার প্রকাশ দেখতে পাই শ্রীমতী সরলাদেবীর "জীবনের ঝরাপাতা" বইটিতে। ঠাকুরবাড়ী শুধু একটি বিশেষ পরিবারের স্মৃতিবিজড়িত নয়। এ বাড়ী আমাদের নবজাগরণের প্রাণকেন্দ্র। উনিশ শতকের সামাজিক-সাংস্কৃতিক এমন কী রাজনৈতিক ভাবধারার উৎস ছিল এই

ঠাকুরবাড়ীর বিদগ্ধ পরিমণ্ডল। যে যুগে বলা হোত—বাঙালী আজ যা ভাবে সমগ্র ভারত সে কথা ভাবতে পারে আগামীকাল—ঠাকুরবাড়ী সে দিনেরই স্মৃতি-সমৃদ্ধ। সে দিনের ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সে দিনের সম্পদ অসতর্ক-অবহেলার মুহূর্তে যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে তা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের দায়িত্ব তো আমাদেরই। আমাদের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় ডাক্তার রায়ের দৃষ্টি প্রথম থেকেই এদিকে পড়েছিলো। ঠাকুরবাড়ীর প্রায় সমস্ত অংশই অন্যের হাতে চলে গিয়েছিলো। ডাক্তার রায় আইন কানুনের হাঙ্গামা পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথের পৈত্রিক বাসভূমি এবং তৎ সংলগ্ন কয়েকটি গৃহ দখলে আনেন। আজ থেকে সাত বছর আগে এই এলাকাতেই সংগীত, নাটক ও নৃত্যে শিক্ষাদানের জন্য 'সংগীভবনে'র প্রতিষ্ঠা হয়।

এমন সময় দেশজুড়ে সাড়া পড়লো রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী পালন করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের। তাঁর স্মৃতিরক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হিসেবে ডাঃ রায় সংকল্প ও পরিকল্পনা করেন রবীন্দ্রনাথের পৈত্রিক বাসভবনে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার—যা বিশ্বজনীন কল্যাণসাধনে প্রেরণা দিতে পারবে এবং দিতে পারবে আনন্দলোকের সন্ধান। উনিশশো বাষট্টি সালের আটুই মে রবীন্দ্র ভারতী নামে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হোল এ পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ।

প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে, প্রশ্ন উঠেছিলো একজন সাহিত্যিকের নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কেন? এ দৃষ্টান্ত বিশ্বের কোথাও নেই। শেকস্পীয়র, টলষ্টয়ের নামে তো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এ কথার উত্তরে আমি বলবো অন্য কোথাও না হলেও এমন একটা কাজের প্রথম সূচনা আমরা অনায়াসেই করতে পারি।

দ্বিতীয় প্রশ্নের গুরুত্ব আরও বেশি। কবির নিজের হাতে গড়া একটি বিশ্ববিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও তাঁর নামে আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা প্রথম'টর স্বার্থহানি ঘটাতে পারে এ আশঙ্কা অনেকের মধ্যেই দেখা দেয়। রবীন্দ্র ভারতীর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে। বিশ্বভারতীর কর্তব্য রবীন্দ্রনাথ নিজেই নির্দিষ্ট ক'রে দিয়ে গেছেন। তিনি চেয়েছিলেন প্রকৃতির বুকে, গ্রামীণ পরিবেশে পাশ্চাত্য-সংস্কৃতি ও প্রাচ্য-সংস্কৃতি একত্র অবস্থান করুক, অবস্থান করে পরস্পর ভাবের আদানপ্রদান করুক। তাই তো তার নাম দিয়েছিলেন বিশ্বভারতী। সেখানে বিশ্ব একনীড় হোক, এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। রবীন্দ্রভারতী সে পথে যাবে না। তার পথ ভিন্ন। তার প্রধান লক্ষ্য হ'বে রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার বাহক ও প্রচারক হওয়া। তাদের সম্বন্ধ প্রতিদ্বন্দ্বিতার নয়, প্রীতির। তাদের কর্তব্য বিভিন্ন পথে রবীন্দ্রনাথের প্রচার।

রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের ভাবপ্রকাশের অবলম্বন শুধু মুখের কথা নয়। মানুষের আছে বুদ্ধিবৃত্তির ভাষা এবং হৃদয়বৃত্তির ভাষা। বুদ্ধিবৃত্তির ভাষা দিয়ে আমরা জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারি। লেখা পড়া এ সবই বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে সম্ভব, সম্ভব সত্যের প্রকৃত পরিচয় জানা। কিন্তু মানুষের কাছে এটাই তো সব নয়। মানুষের বড় পরিচয়—মানুষ হোল হৃদয়বৃত্তির অধিকারী। তার আছে সংবেদনশীল, অনুভূতিপ্রবণ মন। সে মনের কাছে জানাটাই শেষ কথা নয়। সে সুন্দর জিনিস উপলব্ধি করে আনন্দ পায়, সুন্দর জিনিস সৃষ্টি করে আনন্দ বিতরণ করে। প্রসঙ্গতঃ উপাচার্য একটি ছোট্ট গল্পের অবতারণা ক'রে বলেন—এক যে ছিল বাঘ, তার গায়ে ডোরা ডোরা দাগ। একদিন সে ভাবলো বাজার থেকে সাবান কিনে এনে দাগগুলো ধুয়ে ফেলবে। এ গল্পে সত্য প্রতিষ্ঠিত না হলেও এর অন্তর্নিহিত কৌতুকরস মানুষ উপলব্ধি করে আনন্দ পাবে।

রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন নি সাহিত্যই মানুষের ভাবপ্রকাশের একচ্ছত্র বাহন। তিনি বলতেন ভাবের অভিব্যক্তি দেবার উপায় বহু ও বিচিত্র। ভাষায় যা বলা যায় তা চিত্রে, ভাস্কর্যে, নৃত্যে, সংগীতে এবং অভিনয়েও প্রকাশ করা যায়। এই শক্তিগুলির বিকাশের প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্র ভারতী সেই আদর্শই গ্রহণ করেছে।

এখানকার প্রবর্তিত স্নাতক পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য হোল এটি মানবতা ও চারুকলা বিষয়ের সমন্বয়ে রচিত। এই প্রথা ভারতবর্ষের আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে কি না আমার জানা নেই, তা'হোল নাট্যকলাকে আমরা স্নাতক পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছি। তাছাড়া আছে নৃত্য এবং সংগীত। এগুলি যদিও ঐচ্ছিক বিভাগের অন্তর্গত, তবু এগুলির একটি বিষয় পাঠ্য হিসেবে নেওয়া বিধেয়। মানবতা-বিভাগের অন্তর্গত ঐচ্ছিক বিষয়গুলি হোল ইংরেজি সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃত সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্র।

আমাদের পাঠক্রমের অপর বৈশিষ্ট্য হোল সংস্কৃত এবং প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসকে আবশ্যিক করা হয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতির পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে আমাদের ইতিহাস পড়া দরকার। বাংলা ভাষাকে ভালভাবে জানতে হলে সংস্কৃতের জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। সংস্কৃত সাহিত্য আমাদের সংস্কৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার-স্বরূপ। অনেকের এ ভাষা সম্বন্ধে মনে মনে আতঙ্ক আছে। পণ্ডিত মশাইরা এ আতঙ্কের বেড়াজাল সৃষ্টি করেছিলেন বলা চলে। আমরা নতুন পদ্ধতিতে পড়িয়ে সে আতঙ্ক দূর করার আশা রাখি। বাংলা ভাষা যদি হয় মায়ের সমান, সংস্কৃত তা হলে দিদিমার মতো। মা এবং দিদিমার সম্বন্ধ নিবিড়। দুয়ের মধ্যে পার্থক্য যেটুকু তা' হোল যুগধারার প্রভাবজনিত। দিদিমার কালের প্রথা অনুযায়ী তাঁরা অনেক অলঙ্কার ও ভূষণে সজ্জিত হতে ভাল-

বাস্তেন—সংস্কৃতের তেমনি অনেক অলঙ্কার আছে। দিদিমার তুলনায় আধুনিক মা বাহুল্যবোধে অনেক ভূষণ ত্যাগ করেছেন। সুতরাং দিদিমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। তাকে বুদ্ধি দিয়ে জানতে হবে, হৃদয়বৃত্তি দিয়ে অনুভব করতে হবে। তা' হ'লেই আমরা একটি সুন্দর পুষ্পিত বাগানের সন্ধান পাবো।

এখানে শিক্ষার মাধ্যম বাংলা—পরীক্ষাও বাংলাতে দেওয়া চলবে।

নতুন পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমরা করতে চলেছি। বড় দায়িত্ব আমাদের সামনে রয়েছে। এখন আমাদের প্রয়োজন দৃঢ় সংকল্পের, দরকার নিষ্ঠার। হৃদয়বৃত্তির আবেদন থেকে আমরা মনের জোর পাবো কাজে এগিয়ে যাওয়ার। এ কাজের জন্য তিন পায়ের সহযোগিতা দরকার। জ্ঞান, কর্ম এবং হৃদয়বৃত্তি অর্থাৎ এ তিন পা' সমন্বিত না হলে কোন কাজ যেমন সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়, তেমনি আমাদের কাজের সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য দরকার প্রশাসনিক ও অধ্যাপনাবিভাগ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার। আশা রাখি, আমাদের এ শিশু প্রতিষ্ঠানকে সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সকলের পূর্ণ সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতা পাবো।

ভাষণ শেষ করে উপাচার্য মহাশয় অধ্যাপকমণ্ডলী, প্রশাসনিক বিভাগের কর্মচারী এবং নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় দান করেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য কয়েকজন অধ্যাপক আসতে পারেন নি। এ জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।

এরপর বক্তৃতা দেন মানবতা-বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য। তিনি বলেন ঃ

"আজকের এ শুভদিনে আমরা নবাগত ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকবৃন্দের সাথে একত্র মিলিত হয়েছি রবীন্দ্র-তীর্থে। এ আমাদের সত্যিই আনন্দের দিন। আজ আমরা হৃদয়কুম্ভ ভরে নেবার জন্য এই তীর্থে এসেছি। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ছিল মানুষের মুক্তিসাধন এবং মানবতার প্রতিষ্ঠা। তিনি মানুষের ওপর যে মহান দায়িত্ব দিয়ে গেছেন তা' হোল মুক্তির আদর্শ। জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের মুক্তির ভিত্তিতে মানবমুক্তি পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে। পৃথিবীর কোনও একটি কোণে যদি দুঃখ দারিদ্র্য অপমান একটি মাত্র মানুষকেও পীড়িত, অবহেলিত রাখে—তাহলেই মানবতা অপ্রতিষ্ঠিত থেকে যাবে, মানুষের মুক্তি সম্পূর্ণ হবে না। আজকের সামাজিক জীবনের সংকীর্ণতা, বিশেষ করে ইয়োরোপীয় সমাজ-জীবনের বিকৃতি তাঁকে ব্যথিত করেছিলো। এ বদ্ধ জীবনের রূপ দেখে তাঁর লেখনী থেকে বারবার নিঃসৃত হয়েছে মানবতার উদার বাণী। ভজন-পূজন সাধন-আরাধনা এ সমস্তই তুচ্ছ হয়ে

গেছে তাঁর কাছে। তিনি জ্ঞান-কর্ম-প্রেমের সমন্বয়ে মুক্ত সমাজ-জীবনের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। সংস্কারের অচলায়তন বেড়া ভেঙে পরিপূর্ণ জীবনের ছবি তিনি বারবার তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। রবীন্দ্রনাথ মানুষের ওপর যে মুক্তির দায়িত্ব দিয়ে গেছেন, রবীন্দ্র ভারতীকে সে দায়িত্ব পালন করতে হবে। কেবলমাত্র হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন এবং রসচর্চা নয়, আজ আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ হোল তাঁর কর্মের আদর্শ সক্রিয়ভাবে গ্রহণ ও পালন করা। তবেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন সার্থক হবে। আজ এ সংকল্প গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য।"

এরপর নাটক বিভাগের অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুকুমার সান্যাল বলেন :

"রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'যোগাযোগ' উপন্যাসের ভূমিকায় গল্পের আগের গল্পের অবতারণা করেছেন। সেটা হোল এই যে প্রদীপ জ্বালানোর আগে যেমন সলতে পাকানোর দরকার হয় সেই রকম। রবীন্দ্র ভারতী প্রতিষ্ঠার আগের কাহিনী হোল সঙ্গীত-নাটক-নৃত্য-একাডেমির কথা। উনিশশ' পঞ্চান্ন সালে একাডেমি প্রতিষ্ঠার সুরু থেকে আমি এখানে আছি। তখন কিন্তু এর চেহারা আজকের মতো ছিলনা—ছিলনা এই হালফ্যাসানের চার মহলা বাড়ী। পোড়ো ঘর আর গাছগাছালি। একটা ঘরে পার্টিশন দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ক্লাস হোত। মুষ্টিমেয় ছাত্র-অধ্যাপক—আজ সে জায়গায় এতোগুলি হাসিমুখ দেখে বড় আনন্দ হচ্ছে। সেদিন পাঁচজনে বলতো—বেশ আখড়া খাড়া করেছে, খেয়ে দেয়ে মহড়া দিতে যায়, মাসকাবারে মাইনে নিয়ে আসে। কারণ অভিনয় করতে হলে যে শিক্ষা ও অনুশীলনের প্রয়োজন, সেটা তখন কেউ ভাবতে পারতেন না। কিন্তু সংস্কৃতি মানে তো শুধু নাচ-গান-অভিনয় নয়। তার মানে সংযত জীবন এবং সুরুচি। তাতেই জীবনে আনন্দ দেওয়া সম্ভব।"

এরপর অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, সাহিত্যশাস্ত্রী সংস্কৃতে তাঁর ভাষণ দেন। উপাচার্য মহাশয়ের অনুরোধে তিনি সেটির বাংলা তর্জমা করেন। তার মর্মার্থ হোল :

"সমবেত সকলকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজ এখানে এক সুন্দর মিলনের ভাব দেখা দিয়েছে। উনিশ শতকে যাঁর আবির্ভাবে এস্থান পুণ্যভূমিতে পরিণত হ'য়েছিলো—সেইস্থান আজ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার দূতরূপে বিদ্বেষ-সংকীর্ণতা ভুলে মৈত্রীভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা মিলনের আনন্দ অনুভব করবো। কল্যাণ হোক সকলের—মঙ্গল হোক।"

বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অজিতকুমার ঘোষ বলেন :

"যে তীর্থে কবির জীবনের সুরু এবং সমাপ্তি, যেস্থান তাঁর বাল্য, কৈশোর, যৌবন

এবং পরিণত বয়েসের বহু স্মৃতিসমৃদ্ধ আজ তা পরিবারের গণ্ডী অতিক্রান্ত। আজ তা' সমগ্র জাতির তীর্থক্ষেত্র। আমরা আজ সংকল্প নেবো শিক্ষা, আলোচনা ও গবেষণার মধ্য দিয়ে তাঁর আদর্শকে বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার। নাগরিক জীবনের বদ্ধতা ও যান্ত্রিক শিক্ষণপদ্ধতির পরিবর্তন করে আমরা আনন্দময় উদার পরিবেশ সৃষ্টি করবো—যেখানে শিক্ষকগণ মাষ্টারমশাই না হ'য়ে মানুষরূপে হৃদয় ও জ্ঞানের সহজ আদানপ্রদান করে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবেন।"

নাটকবিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতী নিবেদিতা দাস বলেন: "আমি আজ প্রাক্তন ছাত্রী রূপে ব'ল্ছি—আজ আমি এখানে উপস্থিত থাকতে পেরে যে অনাবিল আনন্দ উপলব্ধি করছি তার তুলনা নেই। অভিনয় করতে হলে যে পড়াশুনো করতে হয় এ ধারণা পূর্বে ছিলনা। কিন্তু এখানে ভর্তি হয়ে সে জ্ঞানরাজ্যের হদিস পেয়ে যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ হ'য়েছিলাম। পড়ার ভেতর দিয়ে আনন্দ এবং হৃদয়বৃত্তির বিকাশের পূর্ণ সুযোগ পেয়ে পরম তৃপ্তি পেয়েছিলাম। আজ রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং নাটককে পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত দেখে আমি গর্ববোধ করেছি।"

নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের তরফ হতে শ্রীধনঞ্জয় নন্দী বলেন: "নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন পাঠক্রমের প্রথম বছরের ছাত্র হিসেবে আমি খুব আনন্দবোধ করছি। রবীন্দ্র ভারতীর উদ্দেশ্য ও আদর্শ আমার প্রাণে সাড়া জাগিয়েছে। আমি সংকল্প করছি এবং শপথ করছি এই প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ সহযোগিতা করার।"

ভাষণপর্ব শেষ হতে উপাচার্য মহাশয় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করে ব'ললেন—"আজ তা' হ'লে তিন পা' এখানে অংশ গ্রহণ করলেন। সুতরাং আমরা আশা করছি, শিক্ষক, কর্মী ও ছাত্র এই তিন অংশের পারস্পরিক সহযোগিতায় আমাদের কাজের ধারা সুষ্ঠুভাবেই চলবে।"

●

আমাদের আঙ্গিনায়

গ্রন্থনায়—**শিবানী চট্টোপাধ্যায়**

বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় অনুষ্ঠিত সংবাদগুলি সরবরাহ করার আগে আমরা শোক-সন্তপ্ত চিত্তে স্মরণ করছি প্রখ্যাত সঙ্গীত-নায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোকগমন এবং সঙ্গীত বিভাগের কৃতী অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন রায়ের অকালমৃত্যু। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় পরিণত বয়সে পরলোকগমন করলেও সঙ্গীতজগতে এ ক্ষতি অপূরণীয়। শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়ের অকালমৃত্যু বাংলার লোক-সঙ্গীত ও নজরুল-গীতির ক্ষেত্রে চরম আঘাত বহন করে এনেছে এবং রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীতবিভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হল সর্বাপেক্ষা বেশি। স্বর্গীয় রায়ের গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে উপাচার্য শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এবং স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানিয়ে এক শোকবার্তা প্রেরণ করেছেন।

*   *   *   *

আদিপ্রাণ বৃক্ষদেবতার বন্দনায় রবীন্দ্রনাথ একদিন বিশ্বভারতীর আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলেছিলেন তাঁর কাব্য, সঙ্গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে। তাই, তারই চিন্তাধারার মূর্ত প্রতীক রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৯শে জুলাই বনমহোৎসব অনুষ্ঠিত হল সঙ্গীত ও বৃক্ষরোপণের মধ্য দিয়ে।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গায়কী সংরক্ষণের যে পরিকল্পনা এখানে গ্রহণ করা হয়েছে, সেই অনুযায়ী ৭ই আগষ্ট শ্রীযুক্তা অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায় প্রথম তাঁর কণ্ঠসঙ্গীতের টেপ্ রেকর্ড করান। শ্রীযুক্তা চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের পাঠ গ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং কবিগুরুর কাছেই।

এবার ৮ই আগষ্ট ছিল স্মরণীয় বাইশে শ্রাবণ। এমনই এক বেদনা-বিধুর দিনে মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ মর্তের মায়া কাটিয়ে অমরার পথে যাত্রা করেছিলেন। সেই দিনটির স্মরণে শ্রদ্ধেয় উপাচার্য মহোদয় নিমতলা মহাশ্মশানে কবির স্মৃতিমন্দিরে এবং মহর্ষি ভবনে কবির শেষ স্মৃতিপূত কক্ষে মাল্যদান করেন।

সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়-প্রেক্ষাগৃহে মৃত্যুবিষয়ক কবিতা-আবৃত্তি এবং সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

*   *   *   *

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ষব্যাপী কর্মধারায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—১৩ই আগষ্ট ত্রিবার্ষিক স্নাতক পর্যায় পাঠক্রম প্রবর্তিত হল। এই উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রেক্ষাগৃহে উপাচার্য শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উদ্বোধনী-ভাষণ দিয়ে নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাগত জানান।

৫ই সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রপতি স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের জন্মদিনে শিক্ষকদিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনাসভায় শিক্ষায় ললিতকলার স্থান—বক্তা শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষায় উপযুক্ত পরিবেশ—ডঃ শীতাংশু মৈত্র, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ—ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, সাধারণ শিক্ষা—ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুধাংশু সান্যাল, শ্রীননীলাল সেন, শ্রীশিবপদ চক্রবর্তী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। আলোচনাসভার আহ্বায়ক ছিলেন ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য এবং সভাপতি ছিলেন উপাচার্য স্বয়ং।

এই দিনই ছিল উপাচার্যের জন্মদিবস। অনাড়ম্বরভাবে উপাচার্য মহাদয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

*   *

২৫শে সেপ্টেম্বর ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্মদিবস প্রতিপালিত হয়। তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণটি উল্লেখযোগ্য।

*   *   *   *

২৮শে ও ২৯শে সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে শারদোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নাটক, নৃত্য, সঙ্গীত, আবৃত্তি ও যন্ত্র-সঙ্গীতের মাধ্যমে উৎসবমুখর দু'টি দিন অতিবাহিত হয়।

*   *   *   *

এবার বাইরে থেকে যে সব দর্শনার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে জাপান, দক্ষিণ রোডেসিয়া ও পশ্চিম ভারত থেকে আগত উনিশজন ছাত্রের একটি দল (২।৮।৬৩), চারজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ারীং ছাত্র (২৩.৮), নৃত্য সম্বন্ধে উৎসাহী একজন বলিভিয়ান ছাত্র (৩।৯), লেবাননের দু'জন প্রখ্যাত সাহিত্যিক (১৩।৯), পশ্চিম জার্মানীর

চারজন সংসদ-সদস্য (১৭।৯), এবং দু'জন সোভিয়েট আভিধানিকের (২৭।৯) কথা উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই মহর্ষিভবনে মাল্যদান ও সংগ্রহশালা পরিদর্শন করেন।

একপক্ষ অন্তর যে বক্তৃতামালার আয়োজন ছিল, এবার তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ২৭।৭।৬৩ তারিখে নরওয়ের বিখ্যাত শিল্পী শ্রীমতী ইনগ্রিড আলের চিত্রসহযোগে 'অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিকাশ' সম্পর্কে বক্তৃতা, ১৪।৮ তারিখে শ্রীসুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে কালিদাস', ১৭।৮ তারিখে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডঃ জে. সি. দাশগুপ্তের 'Love, aggression and human happiness' সম্পর্কে আলোচনা, ২৪।৮ তারিখে সঙ্গীতশিল্পী রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের 'অন্যান্য বাংলা গান ও ধ্রুপদ সঙ্গীতের সঙ্গে কীর্তনের সম্পর্ক',—৭।৯ তারিখে শ্রী ীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের নাটক সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা এবং ৫।১০ তারিখে শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উপনিষদের দর্শন বিষয়ক বক্তৃতা।—শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীহরিদাস নায়ারের 'কথাকলি নৃত্য'······সম্পর্কে উদাহরণসহ আলোচনাটিও অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছিল।

* * * *

১৪ই অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে আর একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম লক্ষ্য সংগ্রহশালায় 'ঠাকুরগ্যালারী'র উদ্বোধনের দ্বারা। ঠাকুর-পরিবারের স্মৃতিজড়িত মূল্যবান চিত্র ও নানা সংগ্রহে পূর্ণ এই গ্যালারী সেদিন উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক ও সংস্কৃতি-দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবির। এই গ্যালারীটি সর্বদেশের ও সর্বশ্রেণীর দর্শকদের নিকট অবশ্যদর্শনীয় বস্তু হিসাবে গণ্য হবে সন্দেহ নেই।

* * * *

২২শে অক্টোবর প্রশাসনিক বিভাগের কর্মিবৃন্দ পূজাবকাশের প্রাক্কালে একটি প্রীতিসম্মেলনে মিলিত হন।

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে
উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নব জাগরণের ইতিহাসকে বিষয় করে একটি প্রদর্শ-
ভবন স্থাপন করা। তাতে তিনটি বিভাগ থাকবেঃ ১। রবীন্দ্রনাথ,
২। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার এবং ৩। উনবিংশ শতাব্দীর
বাঙালি মনীষিগণের কীর্তি। রবীন্দ্র ভারতীর কর্তৃপক্ষ এঁদের
সম্পর্কিত প্রদর্শনের উপযুক্ত দ্রব্যসংগ্রহে আগ্রহশীল। এই
মহৎকার্যে সাফল্যের জন্য সকলের সহযোগিতা এবং
সক্রিয় সাহায্য কামনীয়। যিনি এই আবেদনে
সাড়া দিতে ইচ্ছা করেন, তিনি অনুগ্রহ
করে রবীন্দ্র ভারতী প্রদর্শভবনের
অধ্যক্ষ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের
উপচার্যের সহিত যেন
সংযোগ স্থাপন
করেন।

ENGLISH SECTION

EDITORIAL NOTES

This year is specially memorable for its association with the birth centenary of two great personalities of Bengal—Swami Vivekananda and Dwijendralal Roy. Only two years back we had the proud privilege of celebrating the first centenary of Rabindranath. The birth centenary of Ramendra Sundar Trivedi is also awaiting a fitting observance only next year. In a few years we shall also be celebrating the birth centenary of Saratchandra.

All these go to show that Bengal of the 19th century was fortunate enough to produce men of distinction who led India in different fields and in a very crucial stage of the Indian history. By their sincerest devotion to ideals, by their self-less dedication to the cause of the country, they set an example worthy of emulation for all times to come. They established the truth that men become what their faith is.

Today through these celebrations we not only pay our respects to these great souls, but also give to ourselves a rare and enviable opportunity of drawing inspiration from them.

THE PROMETHEUS UNBOUND

ABDUL HAKIM

Over air, land and sea, rings forth
The gloomy message,
An assassin's foul hand defiles
India's holy sage !
Mahatma Gandhi ! On the very precincts
Of holy ground,
Behold ! the High-Priest of Freedom fell
From a bullet wound !
Both the Hemispheres feel
The mighty pang,
The ancient Heavens condemn
The filthy wrong,
The hoary Himalayas in mourning stand
beside the martyred son,
Eternal oceans in profound anguish
from shore to shore run.
We know not if at his Baptism stood
Titan angel Gabriel,
The whole hierarchy attended
his tragic Farewell.

Now, go back agonizing tears,
we weep no more !
A charter of immortality is vouchsafed
To our human door—
An ambassador of Peace, with blessings
to one and all !
Whose mission blossomed forth
ere his re-call !

On Life's crowded stage, he acted
a unique role,
His armament of moral values
defined the Political goal !
"God is Truth and Truth is God", rings forth
his holy gospel,

The writer of this poem, Mr. Abdul Hakim, is the former speaker of the Provincial Assembly, East Pakistan,

The touch-stone of "Non-violence" works
a mighty spell.
A luminous rebel against iniquities
in Man and Nation,
To eradicate them, root and branch
his bold mission—
At home and abroad, his "Atom bomb"
struck home,
Down to pieces fell superstition's
multi-coloured dome !
The untouchables were placed on a pedestal
of social dignity,
The age-long shame of India was banished
By Temple Entry !
Such was the Soul of India, such was
Her spiritual interpreter,
A representative man
in scorn of all barrier !

One God, one World, one Mankind, sums up
his life's philosophy,
Ancient landmarks of caste are effaced
from his vocabulary.
The Alchemy of this "half-naked Faquir"
metamorphosed the face of the globe,
In lone splendour, the loin cloth shone
amid princely robe !

The Pilgrim's progress from South Africa
all the world knows,
Recent record of Noakhali and Calcutta
the Redeemer shows.
The Silent Eremite, cynosure of all,
great or small !
"A kingdom of Heaven on Earth"
his life's end all !
Call him an Indian Rishi or a Muslim Sufee,
or a Missionary you may call,
The oracle of Delphi stands for
the benighted all !
The service of humanity, his life's
summum bonum,
He practised what he preached
in his sanctum sanctorum—

The Champion of the weak and the oppressed,
their guide, philosopher and friend,
Who put his precious life to stake
to see their miseries end !
Upon himself the sin of his countrymen
he did take,
The Indian Messiah for their redemption
Self-purification undertake !
Such a thing of recent memory happened
to New Delhi's shame,
Mahatma began his fast to put out
the communal flame !
Frenzy yielded to sanity before the saint
of Sabarmati,
Fifty million Muslims were assured
of complete safety.

Horror of horrors ! The fell hand perpetrated
a Sin !
The blackest that the world has ever seen !
Ye Mourners, from far and near !
Ye men, women and children,
follow the bier !
Who shall now cry 'halt', when the pillars of state
blunder?
O follow the bier !
India stands orphaned. When comes
Such another?
Follow the bier !

The seer you see on Jamuna's
Sacred bank,
Out of ashes he takes his
celestial rank !
Hence to commune with Moon and Star !
Gandhiji ! Beloved of his Task-Master !
He leaves behind his Testament, for all India
an enduring Heritage,
Bathed in a martyr's blood
a Deathless message !
Alone of the world figures he ranks
With Sir Galahad,
The legendary Knight trod our soil
in flesh and blood,

Type of the wise, who soared, but did
never roam,
True to the kindred points of Heaven
and Home !
Amid the pageantry of fear who forgot not
a humble weapon,
"The Charka", his symbol of freedom
for the common man—
For whose sovereignty he did toil,
The "Bhangy Colony" a mighty Empire foil.
He represents renaissance of India's
hoary civilization,
When a sage's cottage was more kingly than
King's dominion !
Ye, Indians, follow the Light, the Gleam he followed
In life :
"See no evil, hear no evil, speak no evil,"
whatever the strife !
Fanaticism disgraces the face
of this faery land,
Root out the evil with
an iron hand.

Lo ! the Architect of Bharat's destiny
by his death pays price,
And bequeaths his Deathless love
to restore human ties !
His ashes 'pregnant with celestial fire'
Quicken a New Birth
Of a New World Order and a New Hearth !
The "Prometheus Unbound" leads mankind
into fresh field,
To strive, to seek, to find but
not to yield !

SARAT CHANDRA CHATTERJEE : A RETROSPECT

DR. SITANSU MAITRA

There was a time when young folk, especially freshmen at college, literate matrons and school students at higher grades preferred Saratchandra to thrillers and shockers. The question was even debated : Who was the better story-writer—Rabindranath or Saratchandra? To day, in spite of official enthusiasm, Rabindranath is a writer for the elite and Saratchandra, after a short vogue in films, goes unread. Of course he has text-book prestige and Rabindranath's songs, standing midway between the classical and what is popularly known as modern, are indispensable for a cross-section of people ranging from the lower middle class to the aristocracy. hese truths are better left unsaid. It is painful to face them and still more painful to connive at them. One's only consolation is that Shakespeare and Milton too suffer the same fate.

It is not that life in post-war independent India demands a hard and practical attitude to the realities of life and Saratchandra has gone quite out of court because of his incurable romanticism. For romantic he was, though Rabindranath has characterised the appeal of Saratchandra's novels as one pre-eminent for its closeness to life (সুপরিচয়ের রস). Saratchandra was certainly close to life but his was not the sort of closeness cultivated by our presentday fictionists who are a heterogeneous lot with only one thing common among them--Freudian pan-sexualism. Actually Sarat Chandra knew much more about Freud and of that pathological aspect of life Freud investigated than these wise moderns who would write nothing but epic novels that can be easily done into films by directors, the acknowledged "institutors of laws, and the founders of civil society, and the inventors of the arts of life, and the teachers" of all those who will never learn anything yet, would teach everybody. Indeed Shelley could never imagine that his definition of a poet would so well fit a film-director of today.

Yes, Saratchandra was a romantic and so too was Rabindranath ; but the two differ widely, both in point of grasp and depth. Rabindranath is great while Saratchandra is good. Yet one must be cautious. The word 'good' has now-a-days taken on euphemistic overtones, especially in the sphere of literary criticism. Let us, therefore, be more explicit and say that Saratchandra is homely, eminently skilful in the art of communication and sincere but limited in scope and variety and depth. And Rabindranath apart, there was none in his time in the whole of India (even if we consider Prem Chand) who could be called his equal as a novelist. We can best describe the sort of romanticism that permeated the artist in Saratchandra

in the language of Bertrand Russell : "Cultivated people in eighteenth century France greatly admired what they called *la sensibilite*, which meant a proneness to emotion, and more particularly to the emotion of sympathy." It is this emotion of sympathy that is the key motive of Saratchandra's creative urge. Any significant excerpt from the corpus of his novels will illustrate the point. Let us take the opening of his 'Devadasa', the novel over which every adolescent sheds tears even to-day though he won't own it up when cross-examined.

The scene is a typical village school run by the owner-teacher whose cane was his forte and the occupation in which he really took delight was an undisturbed siesta with the usher standing guard over the heap of lime the teacher purchased in the hope of using it for whitewashing a pucca building he hoped to erect at some distant future. The episode of the usher and Devadas follows and it is clean rounded off with the sudden dismissal of the class, the teacher hurrying to Devadasa's father in impotent rage. This is followed by the scene of Devadasa's smoking the hubble-bubble and using the fist on Parvati's back. The small scene at the Pathsala is a rare specimen of realistic portrayal lighted up by the sympathetic emotion of the novelist. Those who have set the fashion of dubbing Saratchandra a sentimental novelist, always trying to squeeze out tears from his readers' eyes like the writers of sentimental comedies and domestic tragedies of eighteenth century England, should think twice before disowning their own literary heritage in a fit of snobbery. The sympathy that Saratchandra evinces here is a virtue that characterises every writer worth the name and this sympathy, which Russell thinks is a prone-ness to emotion and, therefore, possibly a sign of weak nerves and middle class revolutionism, is more probably an outcome of the humanism that was certainly the basis of the philosophy of enlightenment and Tom Payne's "The Rights of Man". Russell is unsympathetic to romanticism. For him romanticism nurses the anti-social element in man and he is categorical in his opinion that the individual who shuns all social responsibilities and seeks only self-realisation cannot be said to act on "the supreme principle of ethics". (History of Western Philosophy).

For us Indians this point of self-realisation is a vital issue in as much as we do not regard the man who has realised himself as one who is an apotheosis of selfishness and egotism but as one who has so shaken off his self-regarding instincts that he is at one with the whole creation and an unbounded love even for sub-humans fills his soul. Such was the Buddha or Chaitanya. Whether Russell admits the reality of the experience of a Buddha or Chaitanya is another question. And whether Buddha or Chaitanya was a romantic is at least an open question.

But it is certainly going against facts to say that Baudelaire's or Chateaubriand's is the only kind of romanticism and that Shelley and Pushkin and victor Hugo do not matter. The former obviously answer to Russell's description but the latter do not. Indeed we ought to speak of *romanticisms* and not *romanticism*. It is to illustrate this difference that Gorky distinguished between constructive and destructive romanticism. Saratchandra had no definite plans for social reform. He characteri-

sed himself as a plain artist and no propagandist or reformer. His sympathy born out of his humanism led him to see that "A man is a man for a' that." Man as man interested him and instead of sitting in judgement over his follies, weaknesses, falls and vices he seemed to say, "It's a pity that man who shows such promise should be so incapacitated by circumstances, internal and external." His is almost a Lamb-like humour with only this difference that Lamb was a writer of occasional essays while Saratchandra was a novelist. He depicted Devadasa and Parvati and Devdasa's pranks from the children's own standpoint, not from the standpoint of the teacher while "Govinda-master's" reactions to these pranks are described from the latter's point of view. Yet the ridiculousness of the teacher's attitude is brought out while the healthy and normal mischievousness of Devadasa is held up to our view with tender solicitude. There were the other boys who tried to act as the teacher's agents and thus played false to their own nature. Nevertheless they too were generous in their appreciation of Devadasa's temerity and great love of fun. Saratchandra points to the truth that children are children and that their rights too must be recognised. Intimidation only generates inhibitions. Normal mischievousness is good. It wears off in time. But complexes born of inhibitions deshape the very character. Such a humanistic approach to the child is absent from Bankimchandra. It is only in Rabindranath that we see the child in all his manifold-ness—in short stories, in novels and even in poems. Saratchandra has no such sweep and depth but what he gives us is genuine and sincere, realistically and not naturalistically.

In the matter of representation of the man and woman relationship his attitude is altogether humanistic and his mode of portrayal is realistic. These two points need to be made at the present moment when humanism has made room for morbidity and realism for naturalism though the naturalistic racket has been played out in Europe long since. Naturalism as an artistic method is a debased coin. For it a man is what he appears to be. Hence Flaubert and Zola thought that photographic reproduction of external details would give us the thing as it really was. They denied the soul, the core of things. They would not admit that appearances might be deceptive. As a result, Flaubert, in spite of his meticulous care for details, failed where Balzac succeeded. This explains why Dickens is a far greater novelist than Zola or Andre' Gide.

Rabindranath is a great realist as an artist. This may sound self-contradictory. How can romanticism and realism stand cheek by jowl or get mixed up together? If we consider romanticism as an opening up of as yet unknown reaches of the human soul and accept the claims of intuition as against rationalistic empiricism we should see that a realistic art goes well with the romantic vision. Rabindranath's romanticism discovered for us the inhibited personality of Binodini and the conflagration that it could cause and the realist in him suggested the exact objective correlative that could make Binodini real for us.

Saratchandra found himself as an artist after the publication of Rabindranath's "Chokher Bali" (চোখের বালি) which, on his own admission he read thirty-six times. The humanist in him found out the truth about the situation of our widows after

Rabindranath had anatomized for him the whole pitiable situation. The great Vidyasagar, as a social reformer, tried to eradicate the evil but as an artist Rabindranath felt that the idea of free love if injected into our social milieu would create problems for individuals like Binodini that defied any practical solution. For Rabindranath Binodini ought not to seek for the same kind of fulfilment in life as Asha. She ought to be able to find a substitute—something higher than what Asha might conceive of. Otherwise society and thein dividual could not pull on well together. Saratchandra's great contribution to the study of the problem is 'Kiranmayee' in Charitraheen (চরিত্রহীন). In Kiranmayee Saratchandra goes one step further than Rabindranath and reveals to us the great waste that society has to look on helplessly as this character, so full of promise and spirit, treads the path of the total disintegration of personality. The solution of Binodini is not for her. Binodini and Savitri are of the same stock but Kiranmayee is different metal.

The tradition of Saratchandra lived on in Tarashankar after whom the realistic novel has degenerated to filmy epics.

●

SANGEET-NAYAK
DR. GOPESWAR BANERJEE
SVARA-SARASWATI, DESHIKOTTAMA

DR. GOURI NATH SASTRI

In the domain of classical Indian music Bengal occupies an important place and the *gharwana* of Vishnupur in the district of Bankura in West Bengal is well-known in the musical world for its pure and unostentatious character. For about a couple of centuries Vishnupur has been recognised as a seat of classical music. Ostad Bahadursen (Khan), one of the descendants of Tansen was invited by Sri Raghunath Singha (II) of Vishnupur to adorn the post of his court-musician. It was from this time that Vishnupur could contribute to the cultivation of classical Indian music. The *gharwana* was well-maintained by the line of disciples of Bahadursen, who enriched classical Indian music in its different forms and succeeded in establishing a tradition of music in Bengal. With the fall of the Moghul Empire and the consequent disruption of the cultural life in Northern India, Indian music fell into a desuetude but the cultivation of music continued in Eastern part of India. Though the style of 'Dhrupad' was suited to the character and temperament of the Bengalees in general who concentrated more on its cultivation, yet the musicians of Bengal went out of the boundaries of their homeland and established direct contact with the different *gharwanas* prevalent in different parts of India and this is how they were attracted to the different forms of Indian music—Khayal, Tappa and Thumri and specialised in them. This explains the reputation of Vishnupur in subsequent years as a very important centre of Indian classical music in all its various branches enjoying a recognised status of its own among the different cultural centres of the country.

In later years when Raja Rammohan Roy was introducing various cultural and social reforms in the country, he thought of restoring Indian music to its pristine glory by composing songs which would be sung in the style of such higher forms of Indian music as Dhrupad and Khayal. For this purpose he collected quite a good number of original Dhrupads and Khayals from the then distinguished musicians of Vishnupur like Gadadhar Chakravarty and others. These songs helped him much in fixing the tune of his own songs. Thus a very intimate contact was established between the cultural life of Vishnupur and Calcutta through the medium of music.

Sangit-Nayak Gopeswar Banerjee Svara-Saraswati was born in 1878, when the cultural life of Vishnupur was at its zenith and it fell on him not only to maintain the tradition which he inherited but to glorify the same by his attainments. Gopeswar's

was a creative genius which found its expression in various ways. He could not only sing the different forms of classical music with inimitable excellence but could play also upon various musical instruments, such as Surbahar and Sitar, with great ease and mastery. But he was not merely an artist who could delight his audience with his melody and artistic exhibition of tunes and their intricacies but he was deeply versed in the science of music and was recognised as an authority and scholar on the subject. . He prepared notations of a large number of important classical songs which have proved to be a boon to all students of Indian music.

Gopeswar took his first lessons in music from Ananta Lal Banerjee, his father, in his native land which he left after the demise of Anantalal. In Calcutta he also learnt Dhrupad under the guidance of Pandit Sivnarayan Misra, and learnt Khayal from Pandit Guruprasad Misra. Later on he had the privilege of coming into contact with Pandit Gopal Chakravarti, popularly known as 'Nulo Gopal', and took lessons in Dhrupad, Khayal, Tappa and Thumri. In 1893 when Gopeswar was a boy of fifteen, Maharaja Jatindramohan Tagore and Maharsi Devendranath Tagore came to know about his talents and the young artiste made an impression upon the minds of these two well-known connoisseurs of Indian art by an exhibition of his skill in classical music. Poet Tagore and his brothers and cousins also were pleased with the performance of the budding artiste. It was in 1895 that the late Maharaja Bijoy Chand Mahatab of Burdwan offered him the post of his court-musician. In 1903-4 Gopeswar toured extensively over the different parts of India and wherever he went he was warmly received. The Maharajas, the Rajas and the Nawabs, at whose courts Gopeswar sang, were highly delighted and bestowed their praise and recognition on him. Thus it was in the first decade of this century that his fame had spread throughout India. As the fruits of his long and sustained research in this field of music he brought out quite a number of treatises on music of which the following may be mentioned :

1. Sangeeta-Chandrika (1st and 2nd volumes).
2. Tala-mala.
3. Geeta-mala.
4. Sangeeta-Lahari.
5. Geeta-Pravesika.
6. History of Indian music (1st and 2nd volumes).
7. Bahu-bhasa-geet.
8. Geeta-Darpan
9. An edition of Sangeeta-Manjari.

In 1916 he adorned the post of lecturer and later of Principal of the Sangeet-Samgha established by Sir Asutosh and Lady Prativa Chaudhuri. In 1916 he was invited as Bengal's representative to the third All-India Music Conference held at Benaras. This furthered his popularity, for from this time onward he was invited to almost all the musical conferences that were held in different parts of India. In 1946 he was honoured at a civic reception held at the Calcutta University Institute.

In 1956 the West Bengal Provincial Congress Committee at their annual function bestowed a distinct honour on him. The same year the Bankura District Congress gave him a signal reception. In 1956 he was appointed a Visiting Professor of Visva-Bharati University but long before poet Tagore offered him the title "Svara-Saraswati." In 1961 the title of Deshikottama was conferred on him by the Visva-Bharati University. In the same year he was appointed a Fellow of the Sangeeta-Nataka Academy Delhi. And in 1962 the Kanpur Music College conferred on him the title of "Sangeeta-Martanda."

During the last few years of his life since 1943 when he retired from active life he settled in Vishnupur and led a secluded life, but even then his interest in music did not abandon him. There he founded 'Ramsarana-Sangeet Mahavidyalaya' which will remain as a living embodiment of his deep love and interest in Indian music.

In conclusion it must be said that Gopeswar Banerjee was not only a great musician but also a man of enviable character which could inspire confidence in his countless students and his admirers. It is a matter of common knowledge that in the beginning of this century, serious study of music was not undertaken by the upper strata of the society due to a sort of social stigma that it carried with it. It was only Gopeswar Banerjee who by his individual efforts and personality could win the confidence of all sections of the society and popularize the cause of the Indian classical music in this part of India.

May his soul rest in peace!

●

TO EVENING

(From Tagore's "Evening Songs")

O Evening,
Under the illimitable sky sitting alone,
with thy tresses dishevelled,
O what whispers softly, softly
utterest thou to thyself
in crooning tones,
with thy look fixed on the universe.
Day after day have I heard,
but even to-day thy words
escape my understanding.
Day after day have I heard,
but even to-day thy song
I cannot master.
Over my eyes creeps in drowsiness,
and my heart with thoughts only is overwhelmed.
Deep, deep, deep within my heart,
joining voice with thy voice,
the spirit of a homeless sojourning recluse
Seems in unison with thee to sing thy song.

O Evening,
'tis as if some neighbour hailing from thy native land,
almost a brother to thee,
losing his way in the foreign strand of my soul
wanders up and down forevermore.
He seems to catch the song of his homeland,
from afar what a mystic hint comes to him from somebody!
—and he pours out his heart.
O, what old memories
wake up with this song.
In the midst of the far-off stars it seems he had his home,
he would laugh and weep there.
He yearns to go back there,
but the way he cannot find out.
How many old topics,

how many old songs,
how many deep sighs of the heart,
the half-smile of bashfulness,
the lispings of affection,
the soft, half-uttered words of love
O Evening in that darkness of thine
are lost for ever and ever.
Filling thy darkness,
they float up and down
in Eternity's tranquil breast,
like fragments of a shattered world.
When on this river's brink
I take my seat at thy feet,
they flock around me encircling me ;
Perhaps just a smile,
the fragment of a smile
before me floats on and on,
Sometimes gleaming, sometimes vanishing.

To-day have I come, O Evening;
and taking my seat amidst thy darkness,
do I yearn to sing with closed eyes
and in soft tones to sing to thee
only a few songs.
Where the old songs,
where the lost smiles,
where the forgotten dreams lie—
there tenderly place these songs
and arrange their burial there.
I know, O evening, yes, I do know thy affection,
Secretly wilt thou enwrap their bodies—
lest sitting on their graves,
out of cruel curiosity
someone smiles.
Softly let only dewdrops fall,
Softly breathe the breeze,
and hushed silence resting her palm on her cheek
alone there remain seated,
and off and on a star or two
there drop sown.
(Concluded)

Translated by Kamal Krishna Ghosh

[By courtesy of Visva-Bharati]

KATHAK DANCE THROUGH THE AGES

BRAJA KUMAR BANERJEE

Kathak dance occupies a dignified position among the classical dances in India. All over the country this dance receives overwhelming appreciation. Many people think that this dance owes its origin to the professional "Baijee" dance but actually it is not so.

It is admitted that for some time this type of dance had its field limited within the "Baijee" community but history provides ample evidence to indicate that Kathak dance really comes from ancient times. It is, therefore, necessary to treat historically the evolution of the Kathak dance.

In this age of progress all branches of Arts are developing fast and research work is carried on in this field also by many scholars. It is a matter of regret that history records very little about dances and few mentions are available about theory but the theoretic explanation has no real link with practical demonstration.

Some authors ascribe to the Kathak dance a form which gives the characteristics of a particular community or school of dance—thus giving only a narrow account of this dance. Appeal of art is universal and an artist should recognise no distinctions of caste and creed. Any parochial approach to the field is, therefore, unjustified.

In ancient times Kathak dance was used to depict the glory of gods and goddesses or to explain the 'Sastras' to the people. The word Kathak in Bengali and Hindi means the art of telling—an artistic and attractive way. This art of telling is accompanied by gestures and 'Mudras'. "Mudra" means what gives delight, (মুদম্-আনন্দম্, রাতি-দদাতি). This Mudra helps to express 'Rasa' (sentiment) and Bhava (mood). It was admitted by Jean Presjluski that those "samag" Brahmins used this Mudra to express 'Chhandas', 'Talas' and 'Bhavas' of the songs. Mudras are also used in Kathak dance for the same purpose.

The words Kathak and Tatkar (Stepping) are as old as the ancient Hindu culture and mention of these two words can be found in old books on Hindu religion and culture. In 'Brahma Purana' actors, singers and dancers were called 'Kathakas',

Sarangadev in the dance chapter of his "Sangeet Ratnakar" gave the following definition of the word 'Kathaka' :—

কথকা বন্দিনশ্চান বিত্যাবন্তঃ প্রিয়ংবদাঃ।
প্রশংসা কুশলাশ্চান্যে চতুরাঃ সর্ব্বমাতুষু॥

From the above, one can easily conclude that Kathak dance has its origin deep-rooted in the ancient Hindu culture and religion. Domination of India by different foreign nations one after another influenced our culture greatly and passing through the different cultural stages Kathak dance reached its present form. It is, therefore, true that Kathak dance, as we have it now, has some affinity with Muslim culture. This applies also to all other branches of art especially classical songs.

History reveals that during the Muslim period Indian classical music had undergone great changes in style and mode of practice and demonstration. Only the names of the Ragas and Raginis remained unaltered. This is also true of all types of Indian dances especially Kathak dance, which owes its origin to Northern India. Northern India was greatly affected by foreign invasion.

The word 'Tatkar' (Stepping) in Kathak dance is very old and ancient books give testimony to this fact. It is found in 'Namabali' (a book) by 'Kohal', a son of 'Bharatmuni' :—

"ভবেদাদি তালেন তৎকার পূর্ব্বক্রময়ং সদা দেব নামাবলীনাং"।
"থেই থেই তত্ তত্ থেই জগ জগ তথ্ তথ্ জগ জগ তথত
ইতি—নামাবলী তৎকার"।

It is, therefore, proved that 'Tatkar' or Stepping is an important part of Kathak dance. It was there long before the Muslim rulers or the "Baijees" started re-shaping this dance according to their taste and culture. This 'Tatkar' is really the life of Kathak dance. Incidentally it may be said that 'Ananda Tandava' is one of the twelve 'Tandava' dances of lord 'Siva'. This 'Ananda Tandava' is formed in accordance with the procedure of 'Sammoy-joti' Natya and this 'Sammoy-joti' may be compared with 'Tatkar' of Kathak dance.

Now coming to the point of 'Thata' (ঠাট্) it may be said that the style of 'Thata' (*Standing position* of the dancer) is also very old. The style of this 'Thata' observable in the statue of women dancers from Mahenjodoro is similar to the Thata of the present day Kathak dance only. In no other type of dance this style of 'Thata' can be found. This standing position may be found in Bharata's 'Natya-Sastra' also.

Now let us describe in detail the different operations involved in Kathak dance in the past and in the present:

Thata (ঠাট্) or Andaj :—

This means standing in a graceful and charming form and posture before the starting of the dance and with the rhythm of Tabla the moving of the eyes, eye-

brows and neck. It is according to the description by 'Bharatmuni' in his 'Natya-Sastra.' The tabla-player can play his tabla in his own way but the dancer changes her or his postures two or four Matras before 'Som' (সম). Some dancers change their posture just after 'Som' and continue in a posture from Som to Som.

Amad or Ahmad :—

This is a Persian word which means 'Advent' or coming. Amad is demonstrated after 'Thata' (ঠাট). Dance starts with Amad. During Muslim rule court-dancers used to start the dance after giving Salam [Salute (কুর্নিশ)] to the Badsas and at this period the word Salam was used in place of Amad. Influence of Muslim culture on this 'Salami' or Amad is noteworthy. At present Kathak artists use the word 'Amad' in place of 'Salami'. In ancient time Hindu artists used 'Namaskara' before starting the dance and now 'Amad' and 'Namaskar' are two distinctive operations in the dance. It is a practice to worship the god 'Ganesha' before starting the worship of other gods and goddesses. Similarly in Kathak dance the Hindu artists (dancers) started their dance with a 'bole' in praise of 'Ganesha' and not with the 'Salami' of Muslim period.

Tora (তোড়া)

Tora is a product of Muslim culture. Tora is composed of boles in different 'Layas' and at the end there must be 'Tehai'. In these boles gestures of the hand and body are necessary. Boles are composed mainly of Tat (তাৎ) Thai (থৈ) Digi (দিগি) Digi (দিগি) etc., and in dance round movements (Bhramari, চক্র) are in abundance. As in Setar Tora-Dara-Dida, Dran, Dadida indicate a particular speed. Similarly in Kathak dance Tora indicates a particular speed. The boles of 'Tora' are made in single, double, treble and quadruple speed.

Chakradar (চক্রদার)

It is a combination of some syllables (boles) which are done in such 'Matras' that after repeating the combined boles thrice one arrives at the 'Som' (Main rhythm). This Chakradar owes its origin to the Hindu school of dance.

Paran or Parhan

Boles of Pakhwaj are called Paran. According to some scholars the word means Namaskar and according to some other exponents the word means that which comes afterwards. This is purely Nritta.

Bhao, Bhava or Gat (গৎ)

In Kathak dance there is an union of Natya, Nritya and Nritta. There are two forms of Natya as, 'Natya-dharmi' (of a devotional or spiritual nature) and 'Loka-dharmi' (secular or concerned with the world and its affairs). Similarly Kathak dance depicts two forms of dance at the time of expressing Bhao or Bhava or Gat (গৎ). Gat (গৎ) depicts one character of the dance—Say, Radha is going to Jamuna (a river) with a jug to bring water and Krishna coming to her sight.

Gat-Bhao is other than Gat. Gat-Bhao depicts a story with different characters. In Gat or Gat-Bhao (গৎ-ভাও) different styles of attractive Chhandas and Mudras are used in abundance. These Bhao or Gat and Gat-Bhao are purely of Hindu culture.

Finishing Tatkar

This is the last phase of the Kathak dance when Tatkar or stepping is done at speeds ascending gradually to the extreme point possible and the dance ends with different rythmic Tehais.

From the above discussion it can be seen that Kathak dance was purely Indian dance but after the invasion by the Muslims Kathak dance came under the influence of the conquerors as much as other forms of art.